সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

সম্পাদক	:	বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক	:	সঞ্জয় চক্রবর্তী
প্রচার	:	মানস বসু
বিজ্ঞাপন	:	অসীম রক্ষিত
প্রচ্ছদ	:	কৃষ্ণেন্দু চাকী
যোগাযোগ	:	টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন	:	৫৯ ৪০৪৮
		৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

মিহির চক্রবর্তী / ক্যান্টর-এর স্বর্গ: গণিতের মুক্তি ৫ □ অজিত চৌধুরী / ডিকনস্ট্রাকশন বা নারী সম্পর্কে তিনটি বা দুটি কথা যা আমি জানি ১৩ □ সুকুমারী ভট্টাচার্য / ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা ২৫ □ উদয়ন ঘোষ / আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ৩১ □ অশোক মিত্র / রূপকল্পের ভেলায় শকরুদ্দিন-দীনদয়ালরা ৬৭ □ সুনীতিকুমার ঘোষ / মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ৭২ □ জয়া মিত্র / ভাঙা না-গড়া ৭৫ □ প্রদীপ ধর / বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মূর্তি ভাঙা ৭৮ □ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় / নিজেদের মাথা-কাটা ৭৯ □ সবুজ সেন / মূর্তি গড়া-ভাঙার আলো-আঁধারে বিদ্যাসাগর ৮১

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য / বিদ্যাসাগর এবং বেসরকারি সমাজ ১—৪০

পত্রিকার নিজের কথা বলার শুধু হক আছে তাই নয়, এটি রেওয়াজও বটে। সমস্যা হয় যখন নেহাতই রীতিরক্ষার্থে দু-এক লাইন লিখতে হয়। জায়গাটি সাদা রেখে দিলে প্রতীক ভেবে ব্যাখ্যা খুঁজতে পারেন কেউ। কেউ-বা ভাবতে পারেন গিমিক। সেসব বিপদ এড়াতেই প্রসঙ্গটির উত্থাপন। আর বর্তমান সংখ্যায় এটুকুই পত্রিকার কথা।

২১. ৭. ৯৩

ক্যাণ্টর-এর স্বর্গ : গণিতের মুক্তি

মিহির চক্রবর্তী

(প্রথম পর্ব)

গণিত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন; সে দায়বদ্ধ শুধুমাত্র দুটি বিষয়ে—তার অন্তর্গত ধারণাগুলি (Concepts) যেন স্ববিরোধী না হয় এবং ইতিপূর্বে তৈরি ও পরীক্ষিত ধারণাগুলির সঙ্গে নতুন ধারণাগুলি যেন সংজ্ঞার সাহায্যে একটি পরম্পরায় সুবিন্যস্ত থাকে। যেমন ধরে নেওয়া যাক ১, ২, ৩, ৪,…এই পূর্ণসংখ্যাগুলি। মনে করে নেওয়া যাক এদের ধারণা ইতিপূর্বেই তৈরি হয়ে আছে আমাদের মনে এবং এদের ব্যবহারের রীতিও আমাদের জানা রয়েছে। এইবার একটি নতুন ধারণা, ধরা যাক মূলদ (rational) সংখ্যার ধারণা, সৃষ্টি করতে গেলে পূর্ণসংখ্যা এবং তাদের রীতিনীতির সঙ্গে সংগতি রেখেই তা করতে হবে। এ খানিকটা ছবি সৃষ্টির মতো। প্রথমে কিছুটা রঙ, কিছুটা রেখা নিয়ে শুরু। তারপরে, তার সঙ্গে মানিয়ে আর কিছু রঙ-রেখা, তারপরে আরো কিছু। এই সংযোজনে দায় শুধু সংগতি রক্ষার।

এভাবেই গণিতকে দেখতে চেয়েছিলেন জর্জ ক্যান্টর (১৮৪৫—১৯১৮)। এ এক আশ্চর্য মুক্তির স্বাদ। অভূতপূর্ব স্বাধীনতার ঘোষণা। শুরুতে ব্যবহারিক প্রয়োজনে, পশুদের হিসেব অথবা জমির পরিমাপ বা যজ্ঞের বেদী নির্মাণ হয়ত ছিল গণিতের উদ্ভাবনে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই বন্ধন ছাড়িয়ে এসেছিল গণিত। বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের সোপান হিসেবে গণ্য হতে এর খুব বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু তবু একটা টান থেকে গিয়েছিল মাটির দিকে। অসংখ্য সংখ্যার সৃষ্টি বাস্তব কারণেই প্রয়োজনীয় ছিল। সংখ্যার ঝুড়ি অনিঃশেষণীয় বলে ধরে নিতে তাই কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এমনকি অমূলদ সংখ্যা √২ ইত্যাদি নিয়ে অনেক রহস্যময়তা সত্ত্বেও প্রায় চোখের সামনে অনুভব করা যাচ্ছিল এর অস্তিত্বকে। পর পৃষ্ঠার ছবিটি লক্ষ করুন।

ক এবং খ-বিন্দু দুটি যদি ০ থেকে প্রত্যেকে ১ একক দূরে থাকে তাহলে গ বিন্দু ০ থেকে যতটা দূরে তার পরিমাণ √২ একক। ক-বিন্দুকে যদি ১ সংখ্যাটির সাথে অভিন্ন ভাবা হয় তাহলে গ-বিন্দুকে √২ মনে করা ছাড়া উপায় কী? এভাবে যে কোনো গাণিতিক ধারণা কোনো ধরনের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট হলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হত। এই মাটিমুখীনতা যেন একটু টেনে ধরতে চাইছিল গণিতের চলার গতি। একটা স্তরে এসে, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে, এই দায়কে বাঁধন বলেই মনে হয়েছে অনেকের।

আর এক ধরনের বন্ধনমোচনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। অসীম বা অন্তহীন সংখ্যারাশি এবং বিন্দুরাশি নিয়ে গণিত খেলা করে আসছে বহুকাল থেকে। কিন্তু একটা সাবধান-

বাণীও ভিতরে-ভিতরে কাজ করে গেছে সব সময়। দেকার্ত যেভাবে তা ব্যক্ত করেছেন তা হল—'We shall not weary ourselves with disputes about infinite, since, finite as we are, it would be perverse to attempt to make any determination of it, turning it, as it were, into something finite that we can conceive...'। এ তো মনের গতিকে, বা কল্পনাকে রাশ টেনে ধরার অথবা আশঙ্কার ধ্বনি। চন্দ্র এক, পক্ষ দুই, নেত্র তিন, বেদ চার,···দিক দশ ; কিন্তু সংখ্যা ? সংখ্যা কতগুলি ? নিশ্চয়ই অসীম। কিন্তু শুধু অসীম বলাই কি যথেষ্ট ? গণিতজ্ঞরা তো পূর্ণ, মূলদ, অমূলদ, বাস্তব—কত রকমের সংখ্যা নিয়েই কাজ করেছেন, এ সব ধরনের সংখ্যার সমষ্টিই তো অসীম। কিন্তু সকলেই কি একই ধরনের অসীম ? অনন্তেরও কি প্রকারভেদ আছে ? এই ধরনের ভাবনা কি আদৌ সংগত ? প্রাচীনেরা (যেমন গ্যালিলেও, লাইবনিৎজ, কসি, গাউস) বললেন 'না'। সীমাবদ্ধ মানুষ কখনও অসীমকে 'বুঝতে' পারবে না। সংখ্যার ঝুড়ি থেকে যত খুশি সংখ্যা তুলে নিয়ে তোমার গণিত

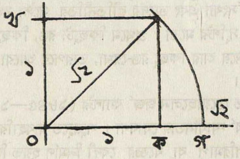

তৈরি কর আপত্তি নেই, কিন্তু মোট কতগুলি সংখ্যা আছে সে ঝুড়িতে এ প্রশ্ন অবান্তর, মোট সংখ্যার কোনো সংখ্যা দিতে চেষ্টা কোরো না। তাছাড়া ১ অথবা ২ এর মতো কোনো কিছু, মনে করা যাক ω, যদি ব্যবহার করা হয়ও সমস্ত পূর্ণসংখ্যার ঝুড়িটির দিকে আঙুল দেখিয়ে, তাহলে কী মানে হবে এই চিহ্নটির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ? কী এর বাস্তবতা ?

ক্যান্টর যেহেতু চাইছিলেন অসীমের ধারণা নিয়েও পাটীগণিত রচনা করতে অর্থাৎ অনন্ত দ্যোতক সংখ্যাদের যোগ গুণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসতে, তাঁকে পূর্বোক্ত দু-ধরনের আপত্তিরই উত্তর দিতে হয়েছে। আমার মনে হয় যে খোলা হাওয়া তাঁর মনের পালে লেগেছিল তার শক্তি ছিল অমোঘ এবং ছিল সাহস। প্রথম আপত্তি প্রসঙ্গে তিনি বললেন অনন্তকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করতে হবে—Potential এবং Actual. এই বিভাজন অবশ্য অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই প্রচলিত। অসীমের প্রথম ধারণার মধ্যে রয়েছে এই দাবি যে এমন একটি ঝুড়ি থেকে অর্থাৎ যে ঝুড়িকে Potential infinite এর উদাহরণ বলে ধরা যাবে, সেই ঝুড়ি থেকে যতগুলি খুশি সামগ্রী তুলে আনা সম্ভব। এর ভাণ্ডার অফুরন্ত। এই ঝুড়িটি সামগ্রিকভাবে গণিতের বিষয়ীভূত হতে পারবে না কিন্তু তার অফুরান সামগ্রী গণিতের অঙ্গ। গণিতেই প্রয়োজন এমন যে সে সামগ্রীর উৎস

যেন শেষ না হয়ে যায়। অসীমের দ্বিতীয় ধারণায় একটি অখণ্ডতা, সমগ্রতা এবং পূর্ণতা। অখণ্ড-অনন্ত, সমগ্র-অনন্ত বা পূর্ণ-অনন্ত। অথচ এই সমগ্রতা সকল সীমায়িত সমগ্রতাকে ছাড়িয়ে। [By an actual infinite is understood a quantum which on the one hand is not variable, but rather is fixed and determined in all its parts as a genuine constant—but which at the same time surpasses in magnitude every finite quantity of the same kind.—ক্যান্টর।] প্রথম ধারণাটি নিয়ে গণিতের জগতে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। দ্বন্দ্ব ছিল দ্বিতীয়টি নিয়ে। ভাবা হতো এই সীমাহীন সমগ্রতাই তো ঈশ্বর—পরম অনন্ত (absolute infinite)। সীমায় বদ্ধ মানুষ একে শুধুই 'স্বীকার' করে নিতে পারে, 'বুঝতে' পারে না কখনো। একে নিয়ে আঁক কষবে কী করে সে ?

ক্যান্টর আপত্তি করলেন ঠিক এখানটিতেই। তিনি বললেন actual infinity-ও দু-ধরনের—যাদের ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা সম্ভব এবং যাকে আর বাড়ানো অসম্ভব। প্রথম ধরনের অনন্তকে গণিতের পর্যালোচনার মধ্যে আনা যায়। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায়। ব্যবহার করা যায়। এরা নিজেরা এক-একটি অখণ্ড সমগ্র সত্ত্বা, সসীম সমগ্রতা থেকে অবশ্যই বড় কিন্তু যাকে আরো বাড়ানো সম্ভব। আর দ্বিতীয় ধরনের অনন্ত—সেই পরম অনন্ত—হচ্ছে ঈশ্বর। উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যাক একটু।

পূর্ণ সংখ্যার মোট সংখ্যা যদি একটি ধারণা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং ওই সংখ্যাকে যদি ω দিয়ে সূচিত করা হয় তাহলে ω একটি বর্ধনযোগ্য actual infinity। কারণ যে কোনো অসীম সংখ্যা থেকে তা বড় কিন্তু একই সঙ্গে $\omega+১$, $\omega+২$ ইত্যাদি সংখ্যার ধারণাও তৈরি করা সম্ভব, অর্থাৎ এক, দুই করে ω-কে আরো বাড়িয়ে চলা সম্ভব ঠিক যেভাবে যে কোনো আমাদের পরিচিত সসীম সংখ্যাকে বাড়ানো যায়। দেখা যাক আরো একটু স্পষ্ট করে।

সেট (বা ঝুড়ি)	তার সামগ্রী সংখ্যা
[১] (যে সেট-এ শুধু ১ সংখ্যাটি আছে)	১
[১, ২]	২
[১, ২, ৩]	৩
....	....
....	....

এইভাবে,

[১, ২, ৩......]	ω
[১, ২, ৩...... ; ক]	$\omega+১$
[১, ২, ৩...... ; ক, খ]	$\omega+২$
....	....

ω, $\omega+$১, $\omega+$২,……ইত্যাদি দিয়ে যা চিহ্নিত হল তাকে তো সংখ্যার মতোই কিছু বলতে হবে—বাঁদিকের ঝুড়িটিতে ক'টি সামগ্রী রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর তারা। এই চিহ্নগুলির কল্পনা, তাকে সংখ্যার মর্যাদা দান এবং শুধু তা-ই নয়, তাদের নিয়ে গাণিতিক ক্রিয়াকর্ম যোগ গুণ ইত্যাদি চালানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন গণিত ও দর্শনে ক্যান্টরের এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ, প্রায় অ্যাডভেঞ্চার। তাঁর নিজের কথায়—'It is my conviction that the domain of definable quantities is not closed off with the finite quantities and that the limits of our knowledge may be extended accordingly without this necessarily doing violence to our nature.' কল্পনাকে এভাবে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে—সাধারণ সংখ্যার পরে অসীম সংখ্যায়, তাদের ব্যবহারযোগ্য (গাণিতিক অর্থে) করে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটা সতর্কতা। আমাদের মানসপ্রকৃতি যেন আহত না হয় এই নতুন কল্পনায়। মন যেন চায় তাকে।

এবারে দ্বিতীয় আপত্তির প্রসঙ্গ। অর্থাৎ কী অর্থময়তা বহন করবে এই নতুন চিহ্নগুলি ? কী যোগাযোগ এর 'মাটির' সঙ্গে, নিদেনপক্ষে স্বজ্ঞার (intuition) সঙ্গে ? এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেবার দায় কাটিয়ে এসেছিলেন গণিতজ্ঞরা বহুকাল পূর্বেই—প্লেটোর সময় থেকে অথবা হয়ত তারও আগে। কিন্তু তবু এই প্রশ্ন ওঠেও বার বার—কারণ চারদিকের একটা পৃথিবী থাকে, তার সঙ্গে গণিত জড়িয়ে থাকে, গণিতজ্ঞ জড়িত থাকেন। গণিতের স্রষ্টাদের সঙ্গে উন্মাদের কোনো একটা সীমারেখা টানতে চায় সমাজ। তাই কোনো একটি নতুন গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব মর্যাদা অর্জন করতে বেশ সময় নেয়, বিশেষ করে তা যদি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যায়। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভাগ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ক্যান্টরের মতে প্রকৃতির পাঠশালা থেকে ইন্দ্রিয় বা বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা মারফৎ আমরা তার (প্রকৃতির) সূক্ষ্মতর সাংগঠনিক আকার সম্পর্কে সামান্যই জানতে পারি। বরং প্রকৃতিকে বুঝতে হলে তার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হয় কতগুলি ধারণা-কাঠামো (Conceptual framework) সঙ্গে নিয়ে—অর্থাৎ একধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। দেশ ও কাল (Space এবং Time) কে বুঝতে হলে Continuum এই গাণিতিক ধারণার সাহায্যেই তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ যুক্তিপরম্পরালব্ধ ধারণা-কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে আগেই, খানিকটা প্রিজমের মতো। যার মধ্যে প্রকৃতিকে ধরতে হবে এবং তবেই তার আলোর সূক্ষ্মতর গঠনটি সাত রঙে প্রতিভাত হবে। এই ধারণা-কাঠামোগুলি তৈরি করাই গণিতের কাজ, একাজে বহির্বিশ্বের ভূমিকা নগণ্য। বরং বহির্বিশ্বকে বোঝার কাজে আগে থেকেই এই ধারণা-কাঠামো তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন। কাজেই দায় নেই গণিতের কোনো ω—এই ধারণাটিকে প্রকৃতিতে অনূদিত করবার। তথাকথিত 'মাটি'র সঙ্গে কোনো সংযোগ আছে কি নেই কোনো গাণিতিক ধারণার এ প্রশ্ন মূল্যহীন হয়ে পড়ে তাহলে। আজ গণিতের চর্চা যেভাবে হয়ে থাকে তাতে প্রশ্নটা ওঠেই না। কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার ভিতের উপরে একটি

নতুন ধারণা যুক্ত হয়ে যায়। এই ধারণা সৃষ্টিতে প্রকৃতি হয়ত গণিতস্রষ্টাকে উস্কে দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দায়বদ্ধ নয় সে প্রকৃতির কাছে। এই হল দ্বিতীয় মুক্তি, এক পরম মুক্তি। চিত্রশিল্পীকে তার রেখা ও রঙের বা কবিকে তার কবিতার শব্দগুলির মানে বলে দেবার হাত থেকে রেহাই।

এইভাবে গণিত ক্যান্টরের তরীতে ভেসে এক স্বর্গের দিকে যাত্রা করল যে যাত্রায় তার প্রধান দুটি বন্ধনই আলগা হয়ে গেছে। এখন আমরা দেখব এই মুক্তির সীমা কোথায়। ধারণাগুলি জুড়ে-জুড়ে একটি কাঠামো বা গণিতের অবয়ব সৃষ্টির কাজে গণিতশিল্পীর দায়বদ্ধতা ঠিক কোনখানে। আমরা দেখেছি সসীমের গণ্ডি সে ভেঙেছে। এমন অনন্তের সৃষ্টি করেছে যা নিয়ে সে অল্প আয়াসেই খেলা করতে পারে। এ অনন্ত যেহেতু পরম নয়, তাই ঈশ্বরের আসনে কোনো আঘাত আসবে না এই নতুন খেলায়। এই অর্থে অসীম নিয়ে আলোচনা করলেও গণিতকে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃতির কাছেও সে জবাবদিহি করতে রাজি নয় অর্থাৎ তার সৃষ্ট ধারণাগুলি বা ধারণাগুলি দিয়ে তৈরি করা কাঠামো কোন বাস্তব প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে বা আদৌ করে কি না এই প্রশ্ন এখন তার কাছে অবান্তর। তাহলে সে কোথায় বাঁধবে নিজেকে? কোন স্ব-আরোপিত দায়বদ্ধতায় সে নিজেকে আবদ্ধ করবে?

এর উত্তর 'স্ববিরোধিতা' (Contradiction)। গণিতস্রষ্টার একমাত্র ভাবনা এবং দুর্ভাবনা তার সৃষ্ট ধারণাগুলি যেন স্ববিরোধমুক্ত হয়, ইতিপূর্বে তৈরি ধারণাগুলির সঙ্গে যেন এক সুন্দর পরম্পরায় বিন্যস্ত থাকে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারণাগুলি থেকে যেন কোনো স্ববিরোধের জন্ম না হয়।

ফলত গণিত বহির্জগতের কাছে দায়হীন, স্ববিরোধমুক্ত একটি সুচারু খেলায় এসে পরিণতি পায়। এর মধ্যে কোনোরকম 'সত্যে'র অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ ক্যান্টর তা চাননি। ছবির তুলনায় ফিরে আসা যাক আবার। শিল্পী তো খেলতেই শুরু করেন প্রথমে। খানিকটা রঙ-রেখার পরে আরো কিছুটা রঙ বা রেখা চাপিয়ে-চাপিয়ে, tension সৃষ্টি করে, balance রক্ষা করে। ছবিটি কি পূর্ণতা পায় এভাবে, একসময়ে? যদি তা-ই হয় তাহলে কি কোনো সত্যের সন্ধান আছে এই পূর্ণ হয়ে ওঠার ভিতরে? একটি উদ্ভিদ যেমন পূর্ণ হয়ে ওঠে ফুলে এবং ফলে একটির পরে একটি কোষ সংযোজন করে করে, যার পরে এই বিশেষ উদ্ভিদজীবনের আর কোনো অতিরিক্ত পূর্ণতা নেই। যেমন তার মধ্যে একটি সত্য পাই, যার গভীরে প্রকৃত অর্থে খামখেয়ালিপনা (arbitrariness) নেই। যেন এভাবেই হয়ে ওঠবার কথা ছিল। যেন একটা পর্যায়ের পরে মনে হয় বেশ, এখানেই পূর্ণতা, এখানেই ইতি টানা হোক।

ক্যান্টরের গাণিতিক ধারণা সৃষ্টির কাজে, আমার মনে হয়, এমনই কোনো পূর্ণ হয়ে ওঠার বোধ কাজ করে। কোনো নতুন ধারণা যখন প্রথম কোনো গণিতস্রষ্টা নিয়ে

আসতে চান তাঁর আলোচনা ক্ষেত্রে তখন তা একটি চিহ্নমাত্র। অর্থাৎ প্রথমে আসে একটি নতুন চিহ্ন (ω যেমন পূর্বের উদাহরণে)। কিন্তু এই চিহ্নটির কাছে কিছু আশা করেন এর স্রষ্টা। তাই সে চিহ্নে একের পরে এক গুণ আরোপ করতে থাকেন তিনি। এ গুণাবলী হল নবাগত চিহ্নের পুরনো ধারণাগুলির সঙ্গে সম্পর্কসমূহ। যেমন ω সমস্ত সসীম সংখ্যা থেকে বড় হোক। ω চিহ্ন থেকে ছোট যা-ই হোক তা যেন সসীম সংখ্যা হয়। ω থেকে যে কোনো সসীম সংখ্যা বিয়োগ করলে যেন ω-ই থেকে যায়। এই রকম সমস্ত দাবি করতে থাকেন গণিতস্রষ্টা তাঁর নবাগতের কাছে। এই সম্পর্কগুলিই তার সজ্জা। স্রষ্টা তাঁর নবাগত চিহ্নটিকে ক্রমে সাজিয়ে তোলেন 'কুসুমে রতনে'। এরপরে তাঁকে থামতে হয় একসময়। মনে হয় হ্যাঁ, ঠিক এ-ই তো আমি চেয়েছি। এই তো ঠিকমতো 'হয়ে ওঠা' হল। পূর্ণতা হল। ক্যান্টরের নিজের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি, একটু দীর্ঘ, কিন্তু তাৎপর্যমন্ডিত :

'The process with the correct formation of concepts is in my view always the same. One lays down a thing without properties which at first is nothing other than a name or a sign A. One then duly gives to it different even infinitely many predicates, whose significance is known through already present ideas, and which must not contradict one another. In this way the relations of A to concepts already present and especially to similar concepts are determined. With this one has then completely finished ; all conditions for the *awakening* of the concept A which slumbered within us are present, and it comes completed into being, furnished with that intro-subjective reality which is generally all that can be demanded from concepts.'

এ শুধু একটি তৈরি কাঠামোর সঙ্গে নতুন কিছু, সংগতি বিনষ্ট না করে, জুড়ে দেওয়া নয়—তার থেকে আরো বেশি কিছু। যা সংলগ্ন করতে চাইছি তার যেন একটি নিজস্ব পরিপূর্ণতা থাকে এবং ফলে সমগ্র কাঠামোটিতে নবসংযুক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত হয়ে ওঠে, বাড়তি মনে হয় না, মনে হয় না আর তাকে ছেঁটে ফেলা যায় মূল কাঠামো থেকে। গণিতের শরীরের এই বেড়ে ওঠার একটা স্বাভাবিকতা থাকে, একটি গাছের বেড়ে ওঠার মতো হয়ত।

এবং সে কারণেই কোনো সত্যও হয়ত থাকে গণিতে।

যে স্বর্গ ক্যান্টর গড়লেন সেখানে গণিত পেল অফুরন্ত মুক্তির স্বাদ। আজ গণিতের মূল ধারা এই স্বর্গ থেকেই উৎসারিত। কিন্তু এ কাহিনীর শেষ এভাবে করা যাচ্ছে না—'অতঃপর (স্বর্গ) রাজ্যে সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।' অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে ফাটল দেখা দিয়েছে, অশান্তি আঘাত করছে দরজায়। গণিত যেন একটু

অস্থির হয়ে উঠেছে এই স্বর্গ-সুখে। সে কি আবার মুক্তি প্রত্যাশী—এবার ক্যান্টরের স্বর্গ থেকে ? এ প্রশ্নের আলোচনা বারান্তরে। □

সহায়ক রচনাপঞ্জি :

Cantorian Set theory and limitation of size, Michael Hallett, Clarendon Press, 1986

Mathematics, the loss of certainty, Morris Kline, Oxford University Press, 1980

Note :

Fuzzy set theory was conceived by Prof. Lotfi Zadeh to present mathematical model for vagueness. Since its introduction in 1965 researchers from all over the globe have joined in the development of this novel idea both in its theoretical and applicational aspects. In India also considerable interest has been generated among the academicians in this new theory and so far two national-level seminars : the first in the Department of Pure Mathematics, University of Calcutta in 1984, and the second one in the Department of Mathematics, University of Tripura, 1991. The next such seminar is being held by the Depts. of Mathematics and Computer Science, Visva Bharati, this year from Feb. 26 to 28. Besides the above mentioned departments, researchers of ECSU, I.S.I Calcutta have taken pioneering role in the enhancement of research in the applications of Fuzzy set theory. The following is a partial list of centres in India where research work is going on in this field. The specific areas of activites are also mentioned.

Centre	*Area of activites*
Dept. of Pure Math. Cal. Univ.	Fuzzy relations, Fuzzy logic, Category theoretic approach to fuzzy sets, Fuzzy algebraic structures and Fuzzy topology, Applications to decision theory.
E C S U I S I, Calcutta	Application of Fuzzy set theory in image processing logic programming and other related areas.
Dept. of Math. Visva Bharati	Fuzzy topology, applications.

Dept. of Math. Burdwan Univ.	Fuzzy topology.
Dept. of Math. I I T, Kharagpur	Fuzzy algebra and topology.
Dept. of Electrical Engineering I I T, Kharagpur	Applications.
Dept. of Math. B H U	Fuzzy topology and Categories.
Dept. of Math. Tripura University	Fuzzy topology and applications to decision theory.
Dept. of Math. Allahabad Univ.	Fuzzy topology.
School of Physical Science, J N U	Fuzzy algebra and applications
Dept. of Appl. Math. Cochin Univ.	
Waltair	
Dharwad	
Ramanujan Institute	

This list is only a partial one. A society on Fuzzy set theory and Information processing has been founded in 1986 and the society has been the co-sponsors of the seminars held so far. To the knowledge of this correspondent five Ph. D. theses have been completed exclusively on Fuzzy set theory so far, the first being done at the Dept. of Pure Math. Cal. Univ. Besides, there are numerous M. Phil. theses submitted.

It is observed that people belonging to various disciplines other than Mathematics, e. g., Computer Science, Philosophy, Electronics and Economics are being more and more drawn towards this theory.

ডিকনস্ট্রাকশন বা নারী সম্পর্কে তিনটি বা দুটি কথা যা আমি জানি

অজিত চৌধুরী

॥ প্রথম ভাগ ॥

এক

এটি একটি ডিকনস্ট্রাকশন বিষয়ক প্রবন্ধ হবার কথা ছিল। পরিবর্তে আমি নারী বিষয়ে তিনটি বা দুটি কথা বলব। মৃত্যু বিষয়েও আমার কিছু বলার আছে। পাঠককে জানিয়ে রাখা ভাল যে এই প্রবন্ধে আমরা ডিকনস্ট্রাকশনের পিতা ডেরিডাকে খুন করব, যেহেতু ডেরিডা হলেন সবচেয়ে বড় মডার্নিস্ট (যা আমাদের শত্রু), একজন ঝকঝকে ফরাসী কান্ট। আমরা অবশ্য সকলকে জানতে দেব না যে ডেরিডাকে আমরা খুন করেছি। বলা হবে যে পুলিশের গুলিতে পোস্টমডার্ন ডেরিডা নিহত। কেননা ডেরিডার খ্যাতি এবং ইমেজের আমাদের প্রয়োজন আছে।

সদর দপ্তরে কামান দাগো : ডেরিডাকে ডিকনস্ট্রাক্ট কর।

দুই

কখনও, কোথাও, কোনো সাম্য ছিল না, নেই। একদল—উচ্চবর্গ—শাসন করে, আদেশ করে, বোঝায়, নির্দেশ দেয় ; বাকিরা, যারা নিম্নবর্গ, মান্য করে, প্রভুর সহযোগিতা করে, প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ গড়ে : শাসিত হয়। এই উপলব্ধিই হল ডিকনস্ট্রাকশন বোঝার প্রাথমিক শর্ত।

শব্দের জগৎ কোনো ব্যতিক্রম নয়। একটি লেখায়, বাক্যে, অনুচ্ছেদে কয়েকটি উচ্চবর্গ শব্দ শাসন করে ; এই শাসক শব্দগুলির আলোকে (অন্ধকারে) আমরা অপর শব্দগুলি দেখি, জানি, বুঝি। শাসক শব্দগুলি শাসিত শব্দগুলির উপর খবরদারি করে, শাসিত শব্দগুলিকে তার বিপরীত—অপর রূপে—প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে শাসক ও শাসিত শব্দের সমঝোতা এবং তার (চাপা) বিরোধিতার টানাপোড়েনে একটি লেখা, অনুচ্ছেদ, বাক্যের অর্থ তৈরি হয়। পাঠকও এই শ্রেণীযুদ্ধের বাইরে নয়। সে কয়েকটি শব্দের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে, বিশেষভাবে বোঝে যা তার অপরশব্দগুলি সম্পর্কে—অর্থাৎ সম্পূর্ণ লেখাটি বিষয়ে—ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এইভাবেই একটি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের অর্থ তৈরি হয়।

ডিকনস্ট্রাকশন হল এক ইনভার্সান (টেবিল ওলটানো) যেখানে শাসক এবং শাসিত শব্দগুলি অর্থগত অবস্থান অদলবদল করে এবং ফলত বাকি আপাত নিরপেক্ষ শব্দেরা,

যাদের শাসক / শাসিত কাঠামোয় সরাসরি ফেলা যায় না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, ডিসপ্লেসড হয়। তখন আমরা পরিচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধটিকে নতুন আলোকে দেখি, ভিন্নতর অর্থে বুঝি : ডিকনস্ট্রাকট করি। তত্ত্বগতভাবে এই প্রক্রিয়া শেষহীন। বাস্তবে নয় কেননা কেতাবি ডিকনস্ট্রাকশন দাবি করে যে এই প্রক্রিয়ায় লেখাটির অর্থের আমূল পরিবর্তন—ইনভার্সান—কিছুটা প্রান্তিক অদলবদল (সংস্কার, সংশোধন) নয়। এটা সবাই পারে না (ইমাজিনেশন দরকার হয়) ; সবসময় সম্ভব নয় (সময় আমাদের নতুনভাবে দেখতে / বুঝতে সাহায্য করে ;) সব লেখাকেও (ভীষণ সাদামাটা মাথামোটা লেখা) সম্ভব নয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে আমাদের একটি পরশ-পাথর আছে যার স্পর্শে সব কিছুই সোনা হতে পারে, হয়। যাঁরা একটি অবহেলিত লেখায় বা পদহেলিত টীকায় হীরের খনি আবিষ্কার করেন, তাঁরা ডিকনস্ট্রাকশনের বড় কারিগর।

উদাহরণ : পিন ফুটল, (তাই)

ব্যথা লাগল।

এই বাক্যে পিন আগে ; ব্যথা পরে।

অতএব পিন কার্য ; ব্যথা কারণ।

আবার অন্যদিক থেকে দেখলে :

ব্যথা লাগল তাই বুঝলাম যে পিন ফুটেছে।

অতএব, ব্যথা আগে (কার্য) ; পিন পরে (কারণ)।

এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্কের এক ইনভার্সান ঘটানো হল ; পিন, যাকে আমরা প্রাথমিকভাবে কার্য হিসাবে বুঝেছিলাম, কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এই ইনভার্সান ডিকনস্ট্রাকশনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি প্রথম ধাপ : কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি শব্দকে ভিন্নতর—বিপরীত—অর্থে বোঝ (ভাল=মন্দ, ঈশ্বর=দানব, কার্য=কারণ)। একটি প্রয়োজনীয় প্রথম ধাপ : অতএব আরও কিছু করার থাকে। এই ইনভার্সান ভাবনার জগতে যে ঢেউগুলি আনে তাদের অনুসরণ কর। যেমন আমরা দেখলাম যে কার্যই কারণ হতে পারে যার অর্থ দাঁড়ায় : কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই। এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি অনুসরণ করেই দেখানো যায়—গেল—যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দর্শনের জগতে একটি ধস নামল। এটি ছিল নিটৎসের উদাহরণ।

উদাহরণ বাড়াচ্ছি। মার্ক্সের ক্যাপিটাল : এই বইটির কি কোনো নির্দিষ্ট মানে আছে ? না ; বইটি বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমরা কখনই ফাঁকা মাথায়, খোলা মেজাজে একটি বই পড়ি না। মাথাটিতে সবসময়েই কিছু থাকে, ঘোরে : আমাদের পূর্বপাঠ, চারপাশে যা ঘটছে, আমাদের সময়। একজন ক্লাসিকাল পলিটিকাল ইকনমি (স্মিথ, রিকার্ডো) বিশেষজ্ঞ মার্ক্সের শ্রম-ধারণাটিকে একটি বিশেষ অর্থে বুঝলেন—যেমন তিনি বুঝেছিলেন তাঁর রিকার্ডো পাঠে : শ্রমসময় মানে

শ্রমসময় মানে শ্রম সময় যা হাতঘড়ি দিয়ে মাপ-জোক করা যায়। তাঁর এই ধারণার আলোকে কিছু বাকি শব্দের অর্থ তৈরি হল ; বাদবাকিরা একদম অন্ধকারেই রইল। এইভাবে ক্লাসিকাল পলিটিকাল ইকনমি এই কনটেক্সট কয়েকটি শব্দ (শ্রম) কে একটি বিশেষ জায়গা করে দিল যা বাকি শব্দগুলির এবং ফলত পুরো লেখাটির অর্থ নির্ধারণ করে। আর একজন, হেগেলবিশারদ, শ্রমকে একটু অন্যভাবে বুঝলেন : শ্রম এক বিমূর্ত ধারণা (তোমার শ্রম আমার শ্রম মূর্ত, কিন্তু শ্রম মানে কী ?) যা হাতঘড়ি দিয়ে মাপা যায় না। তখন অন্য শব্দগুলোর অর্থও বদলে গেল, কিছু শব্দ অন্ধকার থেকে আলোতে এল, গ্রন্থটি এক নূতন অর্থ পায়। কনটেক্সট বদলাও : শাসক শব্দগুলি বদলাবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অর্থ। তাহলে কোন মার্ক্স গ্রহণ করব আমরা ? স্মিথ-রিকার্ডোর মার্ক্স, না হেগেলের মার্ক্স, না আরও অন্য কোনো মার্ক্স ?

মার্ক্সবাদীদের কাছে এর এক সহজ উত্তর আছে : ক্যাপিটালের অর্থ তৈরি করব রাজনৈতিক প্রাকটিসের নিরিখে। ক্যাপিটালের দর্শটি ভিন্ন অর্থেই একজন মার্ক্সবাদী সমদর্শী যদি তা একই রাজনৈতিক প্রাকটিসের ছত্রছায়ায় আসতে পারে। ভিন্ন অর্থ মানেই অ্যানার্কি নয়, বিজ্ঞানের বিনাশও নয়।

এই সহজ সত্য মার্ক্সবাদীরা—এবং আরও অনেকে—ভুলে গিয়েছেন বলেই ডেরিডা নিয়ে এত চেঁচামেচি। ডেরিডা কঠিন নয়, নতুনও নয়—তবে একটু পরিশীলিত। ফলে মাথামোটা শাসকেরা শাসনের টেকনোলজি পরিবর্তনে একটু চেঁচামেচি করছেন।

ডেরিডা, প্রকৃতপ্রস্তাবে, শেখান কেমন করে যুক্তি করতে হয় : যুক্তির শর্ত এবং সীমা। লেখক নয়, পাঠক কেন এইরকম ভাবছে—এবং অন্যরকম ভাবছে না—পরিষ্কার প্রেজেন্ট করতে হবে : তার চিন্তার প্রক্রিয়া, পটভূমি, প্রেক্ষাপট, কোনো একটা বইতে পড়া কিছু আপাত-বিচ্ছিন্ন চিন্তা যা তার এই বিশেষ লেখাটি বিষয়ে ভাবনাকে প্রভাবিত করছে, তার স্থান, কোন সময়ে সে বাস করে, তার মাধ্যম, এককথায় অনুষঙ্গ। এইভাবেই ইউক্লিড, আঙ্কিক পদার্থবিদ ও অর্থনীতিবিদ যুক্তি করেন, সাহিত্য-সমালোচককেও করতে হবে।

ডেরিডা সাহিত্যের ছাত্রীকে একটু অঙ্ক শেখাচ্ছেন : (বি) ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে শেখ, অন্যরকম ভাবতে শেখ, নানা রকম ভাব, কেন ভাব বল, এবং এইভাবে হয়ত সত্য বেরিয়ে আসবে (বিজ্ঞান বলে) বা আসবে না, সত্য ? সে তো ঈশ্বর—ঈশ্বর নিয়ে ডেরিডা ভাবিত নন। আসল কথা হল যুক্তি: তার জানালাগুলো খুলে দাও, একটু আলো এবং উত্তাপ আসুক স্যাঁতসেতে মনগুলোতে। ডেরিডা মানুষ-মানুষীকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে বলছেন।

অতএব ডেরিডার ডিকনস্ট্রাকশন পাঠকের ব্যক্তিগত রিডিং—ফ্রি রিডিং-এর কথা বলে না ; এটি একটি পাঠক-নিরপেক্ষ অবজেকটিভ প্রক্রিয়া : বস্তুজগৎসৃষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে একটি বই পড়া। বস্তুজগৎ-সৃষ্ট : অর্থাৎ পাঠকের মুড-ভিত্তিক নয়—পাঠক নৈরাশ্যবাদী, তাই একটা লেখার কিছু অংশ চোখে পড়ল, বাকিটা নয়, তারপর যা মনে হল তাই লিখে গেল, একে ডিকনস্ট্রাকশন বলে না। ডিকনস্ট্রাকশন

দাবি করবে যে নৈরাশ্যবাদ বিষয়ে লিখিত সংগঠিত আলোচনায়—ডিসকোর্সে—লেখাটি স্থাপিত হোক এবং তার আলোকে সমালোচককে দেখাতে হবে কেন তার ফোকাস—যে অংশগুলোর 'পর সে জোর দিয়েছে—নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক, কেমন করে এই ফোকাস লেখার বাকি অংশটিরও অর্থ নির্ধারণ করে এবং তা কীভাবে প্রচলিত আলোচনা থেকে এই আলোচনাটিকে বিশিষ্ট করে—

এইসব। এটি একটি পরিশ্রমসাপেক্ষ যুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া। যুক্তি তার দৃষ্টির গোচরে সবকিছুই আনতে চাইছে, সমস্ত সম্ভাবনা স্পেসিফাই করছে, সীমা নির্ধারণ করছে: তার মতাদর্শগত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। ডেরিডা হলেন একজন পরিশিলীত সমকালীন ফরাসি কান্ট, আধা ফরাসি-আধা আমেরিকান, একজন পরিশিলীত প্রফেসর যিনি মাথামোটা অন্যান্য প্রফেসরদের একটু ভাবতে শেখাচ্ছেন।

না; তার চেয়েও কিছু বেশি। নানারকমভাবে ভাব, পড়, লেখ, বাঁচ, মালটিন্যাশনাল বলতে পারে, সি আই এ পারে যার জোর আছে, দুর্বল ভারতবর্ষ পারে কি? বা আরও দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টি? মালটিন্যাশনাল বলে: নানারকমভাবে ভাব, তাহলেই তো তুমি আমার মতো ভাববে কেননা এই সব ভাবনার প্রাকটিস তো একটাই —আমার প্রাকটিস। অন্য কোনো প্রাকটিস হলেই শিশুর ভি ডি ও খেলনা থেকে বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল একঝাঁক উড়োজাহাজ, কলিঙ্গের আকাশপথ তখন সম্রাট অশোকের দখলে, যখন মাটির পৃথিবীতে শবেরা মিছিল করে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে পড়ে তিব্বতে, চীনে, জাপানে, অসভ্য মানুষগুলো শোনে ভগবান বুদ্ধের শান্ত শান্তিময় বাণী: নানারকমভাবে বাঁচার কথা, দর্শন। আমি সম্রাট অশোকের এম্পায়ারে একটি গুপ্তগহ্বর খুঁজছি।

তিন

একটি কুকুরকে আমরা কুকুর বলি। কেন?

কুকুরকে কুকুর না বলে ঈশ্বর বললে এবং ঈশ্বরকে কুকুর নামে ডাকলে কুকুরের কুকুরত্ব এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের কিছু যায় আসে না। নামকরণ যা কিছুই হতে পারত, আরবিট্রারি। এটি হল ভাষাবিদ সস্যুরের প্রথম প্রতিপাদ্য। বস্তুজগৎকে আমরা বিভাজন করি, টুকরো-টুকরো করি, টুকরোগুলিকে নাম দিই, ডাকি: কুকুর, ভালবাসা, ঈশ্বর। প্রতিটি নামেরই একটি অর্থ থাকে। অথবা: প্রতিটি অর্থই একটি নামের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। বস্তুজগতের বিভাজনের সঙ্গে অর্থের জগতেও এক সমান্তরাল বিভাজন ঘটে।

বস্তুজগতের এই বিভাজনও এলোপাথারি, আরবিট্রারি। অর্থাৎ অর্থেরও। এটি হল ভাষাবিদ সস্যুরের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য। আমরা বলি: নদ, নদী। অন্যভাষায়—ফরাসিতে, স্প্যানিশে—হয়ত নদীর বিভাজন ভিন্নতর (যেমন, ছোট নদী, বড় নদী, সমুদ্রগামী নদী)। পৃথিবীর সর্বত্র, সকলের কাছে, নদী একই অর্থ বহন করে না। অথবা: আমরা

সকলে একই অর্থ প্রকাশ করতে চাই না ; তাই বস্তুজগৎকে ভিন্নভাবে ভাঙি, ভিন্নতর নাম দিই। অতএব বস্তুজগতের নামকরণ এলোমেলো, তার বিভাজন এলোপাথারি। অথচ আমরা কথা বলি, হাসি, ঝগড়া করি, বিনিময় করি : কমিউনিকেট করি। কেমন করে ?

কেননা আমরা তুলনা করতে পারি, একটি টুকরোর তুলনায় অন্য টুকরোটিকে বুঝি। কৃষ্ণ কালো, মেঘ কালো, আঁধার কালো : কালো কাকে বলে ? কালো সাদা নয়, লাল নয়, নীল নয়, হলুদ নয়, সবুজ নয়, এই অসংখ্য শেষহীন 'না'-এর তুলনায়—আয়নায়—আমরা কালোকে দেখি, বুঝি, জানি। প্রতিটি টুকরোই অন্য টুকরোগুলির তুলনায়, বিরোধিতায় অর্থাৎ সংযোগে একটি অর্থ অর্জন করে। টুকরোগুলির অর্থ তাই পরস্পর সংযুক্ত, সংপৃক্ত। এটিকে আমরা সস্যুরের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বলব।

অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বস্তুজগতের—এবং অতএব তার অর্থের—একটি কাঠামো (বিন্যাস, স্ট্রাকচার) আছে। ভাষাবিদের কাছে চ্যালেঞ্জ : এই আপাত-এলোমেলো বস্তুজগতের এলোপাথারি নামকরণের ভিতর লুকিয়ে থাকা কাঠামোটিকে বের কর তারা কেমন করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, ভাব করে, ঝগড়া করে। কেমন করে এই নামকরণ এল, থাকল, চলে গেল—একটি ভাষার ডায়াক্রনিক স্ট্রাকচার—সস্যুরের ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল না। সস্যুর জানতে চেয়েছিলেন এই সময়ে, মুহূর্তটিতে, ভাষাটির যুক্তির কাঠামো, শব্দগুলির সমন্বয়ের নিয়মাবলী—সিনক্রনিক স্ট্রাকচার—কেমন করে তারা পরিবার তৈরি করে, গোষ্ঠী করে, বন্ধু করে।

ফ্রেন্ড শব্দটির অনেক বন্ধু আছে, যেমন—শীপ (ফ্রেন্ডশীপ), লেস (ফ্রেন্ডলেস), লি (ফ্রেন্ডলি), এইভাবে ফ্রেন্ড শব্দটি শীপ, লেস, লি-র সঙ্গে একটি ক্লাব (সিনট্যাগমাটিক রিলেশন) তৈরি করে। আবার 'শীপ' এই টুকরোটি পার্টনারের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে (পার্টনারশীপ)। এইভাবে শীপ-এর সহযোগে ফ্রেন্ড এবং পার্টনার এই দুটি শব্দের ভিতর এক সম্পর্ক (প্যারাডিগমাটিক রিলেশন) তৈরি হয়। কমকথায় : অক্ষর এবং শব্দগুলির পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি এবং মাধ্যমের সাহায্যে যুক্ত হবার কয়েকটি প্যাটার্ন আছে যা আমরা জানি। বেড কথাটি আমি ঠিকই বুঝতে পারব যতক্ষণ নিশ্চয়ভাবে জানি যে আমি রেড/শেড এইসব কথা শুনিনি। কমকথায় : শব্দগুলিকে আমরা চিনি, জানি, বুঝি একে অপরের তুলনায়, সংযোগে যার একটি প্যাটার্ন এবং নিয়ম আছে। শব্দেরা ক্লাব তৈরি করে। ক্লাব : অর্থাৎ সকলের প্রবেশাধিকার নেই, কেউ-কেউ ঢুকতে পারে। এইভাবে শব্দজগতে এক এক্সক্লুশন এবং ইনক্লুশন প্রিন্সিপল্ কাজ করে, যার মাধ্যমে আমরা শব্দদের শনাক্ত করি, তাদের অর্থ বুঝি। শব্দেরা এই ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে, পরিবার ও গোষ্ঠী তৈরি করে, নিজেদের অর্থ তৈরি করে।

অর্থ তৈরি করে : না, সস্যুর ঠিক এই কথা বলেননি। সস্যুর বলেছিলেন যে এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শব্দেরা নিজেদের—অর্থাৎ বস্তুজগতের—অর্থ প্রকাশ

করে। ডেরিডা বলবেন : পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থ তৈরি করে, নির্মাণ করে। এইখানেই ডেরিডার ইন্টারভেনশন।

চার

শব্দ এবং শব্দের সহযোগে অর্থ—এবং উদ্বৃত্ত অর্থ—তৈরি হয়, যেমন মানুষ (পুঁজিপতি) এবং মানুষের (শ্রমিকের) সহযোগে তৈরি হয় মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য।
শব্দেরা ইনোসেন্ট নয় ; এখানেও দাস/প্রভু সম্পর্ক বিরাজ করে, ক্রিয়াশীল।
ডেরিডা সস্যুরের ইনোসেন্স ভেঙে দিলেন। শব্দেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে : 'কেমনতর সম্পর্ক ? সমতার' ? ডেরিডা জিজ্ঞাসা করবেন। না, সমতার নয়, কিছু-কিছু শব্দ—একটি বাক্যে/পরিচ্ছেদে কিছু-কিছু শব্দ—চোখ টানে, একটা আলাদা জায়গা করে নেয়—উপরের জায়গা, প্রিভিলেজ্‌ড জায়গা—বাকিরা নিচে পড়ে থাকে, অবহেলিত, দৃষ্টি এবং মনের অগোচরে। কেন এমন হয় ? কেননা আমাদের, পাঠকদের, মনে সর্বদাই কিছু একটা ক্রিয়াশীল, কোনো প্রেক্ষাপট বা কলরব, অথবা অন্য কোনো বই-এর একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়, কিছু শোনা কথা, আমাদের চারপাশ—একটি গল্প/কবিতা/প্রবন্ধের কিছু শব্দ এবং বাক্যকে আমরা আলাদা, বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ফেলি। তখন এই শব্দেরা অপর শব্দদের সঙ্গে উপরের জায়গা থেকে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ গ্রাস করে। না ; শব্দদের ভেতর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না ; কিছু শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে : প্রভুত্বের, শাসকের। এবং এইভাবে অর্থ তৈরি হয় কেননা অর্থ শব্দদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়, সামাজিক : নির্মিত। কিছু শব্দ অন্য কিছু শব্দের উপর প্রভুত্ব তৈরি করল, বাকিদের হটিয়ে দিল এবং এইভাবে শব্দদের ভেতর এক অসমান সম্পর্ক স্থাপন হল যার নাম গল্প, কবিতা, প্রবন্ধটির অর্থ।
কিন্তু কেউ, কখনো, কাউকে কি নিচে রাখতে পারে বা তাড়াতে ? যে আছে নিচে, পশ্চাতে, অগোচরে, সে উপরকে টানছে, উপরের 'পর পড়ছে নিচের ছায়া অর্থাৎ আলো, আর সেই আলোছায়ায়—গোধূলি আলোকে—উপরের রূপ বদলে যেতে থাকে, বদলায়, যেন উপর যা, তা নয়, অন্য কিছু, উপরকে আমরা যে অর্থ দিয়েছিলাম তার চেয়ে ভিন্নতর উপর এক উদ্বৃত্ত অর্থ বহন করে চলে। কমকথায় : কিছুই এক্সক্লুড করা যায় না। যাকে বাদ দিয়েছ, সে তার ছায়া ফেলবে অর্থাৎ আছে। যাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, সে তার পায়ের চিহ্ন রেখে গিয়েছে : আছে। কাকে বাদ দেবে, তুমি ? রোল কল কর, সকলেই আছে।

অনাম্নী লেখাগুলো উঠে আসছে অন্ধকার থেকে, অবহেলা থেকে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে, নতুন বিবলিওগ্রাফি লেখা শুরু হোক। নতুন যে ঝকঝকে সিলেক্টেড রাইটিংস বের হল, তাতে যারা বাদ গেল খুঁজে বার কর, তাদের নিয়েই তৈরি কর না তোমার এম. ফিল. ডিসার্টেশন, কে বলেছে

সাদা মানুষের গা-ঘেঁষাঘেষি করা লোকগুলোকে রেফার করেই লিখতে হবে তোমার পেপারগুলো। আমরাই আমাদের এগজামিনার হব।
ইন্টারভিউ বোর্ডের টেবিল উল্টে দাও, কে কার ইন্টারভিউ নেয়? কারা যেন ইন্টারভিউ বোর্ডে হেসে উঠেছিল. 'আহা, মারছ কেন' সিনিয়রতম পুলিশ অফিসারটি বলেন, 'দেখুন স্যার, সেন অ্যাণ্ড দাসের মানির চারটে ফাংশান জানে না' 'কিরে কলেজ স্ট্রিট কেন গিয়েছিলি?' 'ভাইএর জন্য ফুটবল কিনতে স্যার', 'কি বললি?' 'বল্‌স স্যার, বল', হাতদুটি ফুটবলাকৃতি করে সে বলেছিল।
শিরদাঁড়া সোজা কর, সফল মানুষের গায়ের উত্তাপ বা ওকাসা কিছুই তোমার হারিয়ে যাওয়া কাঁচা বয়স ফেরত দেবে না, কেন সফল শব্দগুলির সঙ্গে মিছে গা-ঘেঁষাঘেষি করা।
কালো সাহেবগুলোতো ফরেন মার্কেটে সেমিফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্যই ইউনিভার্সিটির কোর্সের সবটা নিয়ে নিল, ওভাবে কোনো ঢং না করে কোনো মেয়েকে বলতে শুনেছ 'এস শুই', ডেকে আন অসভ্য কিশোর ও চরিত্র, সিটি দাও জোর তুমি বুঝি কলোনির ছেলে। তারপর আস্তাকুঁড় থেকে শব্দ কুড়িয়ে আন, জড়ো কর, শব্দ বোমা তৈরি হল, ছোড়, শব্দবোমা ছোড়। দাউ-দাউ করে জ্বলে রাজধানীর ইউনিভার্সিটি।

পাঁচ

ডেরিডা পরিচিত ফিলসফি অফ প্রেজেন্স ভেঙে দিলেন। যে অ্যাবসেন্ট, সে-ও আছে, প্রেজেন্ট। তা না হলে আমরা কেমন করে বুঝব গতি বা ফুটবল খেলা। মারাদোনা ফুটবল পায়ে ছুটছে অথচ মারাদোনা সবসময়েই আছে কোনো এক স্থানে। মারাদোনা যদি সবসময়েই কোনো না কোনো স্থানে থাকে তাহলে সে কেমন করে ছোটে?
মারাদোনার ছোটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যদি তার অবস্থানটি—প্রেজেন্স—পূর্বতন স্থানগুলি, যাকে সে ফেলে এসেছে, তার চিহ্ন বহন করে। প্রেজেন্সের অভ্যন্তরে অ্যাবসেন্স আছে বলেই আমরা বুঝতে পারি ধাবমান রেলগাড়ি, শিল্পকলা এবং ভালবাসা। জীবন পরীক্ষার খাতায় উত্তরের চেয়ে কিছুটা বেশি জটিল এবং রহস্যময়ী। 'পরিষ্কার লেখ, দু-নম্বর বেশি পাবে' এইভাবে ভাবতে-ভাবতে ইউনিভার্সিটির ভাল ছাত্রটি প্রফেসর হন, সব কিছুই পরিষ্কার—অর্থাৎ প্রেজেন্ট—দেখতে চান এবং এইভাবে তিনি নগ্ন হন প্রতিদিন অর্থাৎ প্রতিরাত। অথচ জীবন, যে একজন নারী, কিছুটা তো আবরণ চায়, সে কি তার লজ্জা না লীলা? প্রফেসর নারীটির পোশাক খুলে নেন; তিনি শুধু জানেন না পোশাকের অভ্যন্তরেও থাকে আর এক পোশাক—এতো দ্রৌপদীর বস্ত্র, দুঃশাসন কি পারবে তা হরণ করতে?
আসলে কোনো কিছুই পরিষ্কার নয়, একটা মুখের মধ্যে মিলেমিশে আছে অনেকগুলো মুখ—মুখ? সে তো মেটাফর। (কেন সেই মুখ খুঁজে ফের তুমি, সব মুখেই তো আছে তার মুখ, আছে না?) একটি মুখেই তো অন্য মুখগুলো চিহ্ন রেখে গেছে—ট্রেসেস—এই মুখ অন্য মুখ থেকে আলাদা—ডিফারেন্ট—কেননা সে শুধু ডেফার করে অন্য মুখগুলোকে, তারাও আছে, আবির্ভূতা হবার জন্য, একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে অন্যমুখগুলো। একমুখ, অন্যমুখ, যে কোনো মুখ।

ডিফার‍্যান্স : যা ডিফার এবং ডেফার করে যুগপৎভাবে, একইসঙ্গে ডিফার করে এবং দি অ্যাক্ট অফ ডিফারিং, সবসময়েই এই ডিফারেন্সের খেলা চলে, দি প্লে অফ ডিফারেন্সেস। এই পৃথকীকরণের শেষহীন খেলা আছে বলেই তো পার্থক্যীকরণ 'এই বইটা পড়লাম, বেশ লাগল'। আবার এই পার্থক্য তো একটা প্রতীক্ষা মাত্র, এই বইটিতো আর একটি বই হবার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে, একটি বই-এর ভিতর লুকিয়ে থাকা অন্য বইগুলো, সবসময়েই একটি বই থেকে অন্য বই লেখা হয়, প্রথম বই বলে কিছু নেই—আদি নেই—অতএব অন্তও নেই। একে তোমরা যে কোনো নামেই ডাকতে পার : ডিফার‍্যান্স, স্পেসিং, এস্পেসমেন্ট, ঈশ্বর। কী, কঠিন লাগছে, মাথাটা ঘোরে? আসলে এটা হল লেখকের খেলা, ম্যাজিক। লেখকের স্ত্রী সেজেগুজে সুপারমার্কেটে যান, লেখক একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে অর্থাৎ কঠিন করে তাঁর কথাগুলো রাখেন। যদি বল, বাদ দেব—দিলাম—এই অনুচ্ছেদ।

ছয়

একটি মুখেরই ভিতর আছে অন্যমুখগুলো : অর্থাৎ মুখটি উদ্বৃত্ত অর্থ বহন করে—সে যা তার চেয়েও বেশি কিছু। মুখ একটি রিজার্ভার যা ওভারফ্লো করে। আবার, এই স্থানে, মুহূর্তটিতে, তো আমি একটিই মুখ দেখি। অতএব, এই মুখ একটিই মুখ, অন্য মুখ নয়। তাই অভাববোধ—ল্যাক—থাকে : আমি অসম্পূর্ণ, আমি যা তার চেয়ে ছোট—বেঁটে—হয়ে আছি, কোথাও অভাবের ছায়া থেকে যায়। অথচ এই অভাব ব্যক্তির—দর্শকের, শ্রোতার, পাঠকের—বস্তুর নয়। ছোট ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে, ধুলোঝড়ের ভিতর থেকে, কলরব অতিক্রম করে, ব্যক্তি বস্তুকে বহুরূপে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ আর একটু চেষ্টা করলেই তো সে বেরিয়ে আসতে পারত তার ব্যক্তিগত কুয়ো থেকে, তখন সে দেখলেও দেখতে পারত যে আকাশ আরও বড়, দিগ্‌বিদিক্, বল্গাহীন, আর তার মনে পড়ত, বুড়ি-ঠাকুমার কাছে শোনা সেই সীমার ভিতর অসীমের কথা যখন কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিল তার বিশ্বরূপ : বেদের ভিতর আমি সামবেদ, ধেনুর ভিতর কামধেনু, আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি বরুণ।
অভাব ব্যক্তির, বস্তুজগতের নয়। আবার ব্যক্তিও বস্তু জগতের এক অংশ ; তাই অভাব ব্যক্তির নয়, তার অজ্ঞতার। ব্যক্তি জানে না যে সে অসীম : আদিহীন, অন্তহীন। খণ্ড-খণ্ড টুকরোগুলো জড়ো করে সে তৈরি করতে পারত—করে—এক টোটালিটি যা সম্পূর্ণ। এমনি করেই তো তৈরি হয়েছিল চীনের প্রাচীর, কাফকা বলেছিলেন : খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেওয়াল গড়ে তোল, ফাঁকগুলোতে জড়ো কর বারুদ আর উপকথা, উৎসব কর—চীনের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে। (কেমন করে জানলে, দেখেছ কি? কে বলল, সম্রাট? চেন কি তাকে? অথবা শত্রুদের যাদের জন্য এই চীনের প্রাচীর?)
আমাদের অভাব নাই, কেননা আমাদের মিথ আছে, উপকথা আছে। এই অভাবহীনতার কোনো সমাজবিজ্ঞান হয় না, যুক্তি হয় না, যুক্তির ব্যাখ্যায় সব সময়েই অভাব থাকে

কেননা যুক্তির ভিতরে—যুক্তি ধারণাটিতেই—অভাব আছে। সর্ষের ভিতরেই ভূত। প্রশ্ন : আমরা কি কোনো সম্পূর্ণতা তৈরি করতে পারি—চীনের প্রাচীর—যেখানে ফাঁক থাকলেও উৎসব থাকে ?

অনেক অভাব তৈরি করল ওরা : সিভিল সোসাইটি এল না, বুর্জোয়া প্রণয় ও বুর্জোয়া পরকীয়া হল না, বিবাহের আগে সংগম না সংগমের আগে বিবাহ (বিবাহ কি হবে রাজাসাক্ষী করে না আগুন ?) এইসব জিজ্ঞাসা ও অভাব নিয়ে উত্তেজিত বিতর্কের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায় দুপুর, বিকেল। ইনকমপ্লিট মডার্নাইজেসন এবং তজ্জনিত অভাববোধ, ল্যাক : এটাই ছিল ওদের একমাত্র আলোচনার বিষয়। ক্রমশ অভাব রোমান্টিসাইজড হয়, একটি ফেটিশ তৈরি করে : আমার সংসার, ধর্মের ষাঁড়, বিদেশ-ভ্রমণ এবং একটি অভাববোধ আছে—আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে। এইভাবে অভাব একটি হেগেলীয় ইউনিভার্সাল—নেগেটিভ ইউনিভার্সাল—তৈরি করে, অভাবের সন্তান আমরা। তখন সাদামানুষেরা এবং কালোমানুষেরা গোলটেবিলে বসে, অভাব নিয়ে আলোচনা করে—তোমাদের দেশে অভাব কেমন ? আমাদের দেশে…। অভাব যদি ইউনিভার্সাল হয়, ইউনিভার্সালি ভাগ করে নেওয়া যায় (শেয়ারড্ হয়), কমিউনিকেট করা যায়, (পেপার লেখা যায়, কনফারেন্স করা যায়) তখন তা কেমন অভাব, অভাব কি তখন একটি ক্লিশে নয় ? ডেরিডা বলবেন এই পৃথিবীতে, চেতনার জগতে, কোনো অভাব নেই কেননা আমরা সব সময়েই সাপ্লিমেন্ট করতে পারি, আর যখন আমি সাপ্লিমেন্টই করতে পারি তখন তো কখনই অভাব ছিল না কেননা সাপ্লিমেন্ট করার সম্ভাবনা তো বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল। (প্রশ্ন : কে সাপ্লিমেন্ট করে ? প্রভু না ভৃত্য ? কার হেগিমনি ?)

"আমি তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার মুখ হারিয়ে যাচ্ছে, কী বিশ্রী মাংসল হয়েছ তুমি, আর তখন আমার মনে পড়ল ছেলেবেলার মাস্টারবেশনের দিনগুলোর কথা, প্রতিরাত আমি আমার ধাইমার সঙ্গে মিলিত হতাম জাগরণে, স্বপ্নে, আমি আমার ধাইমাকে মনে করে তোমার মুখের দিকে, তাকালাম, তখন, কী আশ্চর্য, তোমার মুখ কেমন বদলে গেল, মাংসল তুমি তখন এক হস্তিনী যেন, তুমি নও, ধাই-মা নয়, অন্য এক নারী যেন, প্লাম্প, তার ভারীশরীরের ভাঁজে, ফাঁকে লুকিয়ে আছে এক আহ্বান, আমি তোমার কাছে গেলাম, তুমি বললে কী হল, আজ ?" —এটা ছিল কারো এক কনফেসন, রুসোর কি ?

প্রতিদিনের—এবং রাতের—সেক্সে অভাব থাকে কেননা একটি মুখকে মূঢ় মানব একটিই মুখ ভেবেছিল। একটি মুখকে যারা বহুমুখ ভাবতে পারে, তারা শিল্পী।

মাস্টারবেশন সাপ্লিমেন্টারি : বাস্তবের সেক্সকে সাপ্লিমেন্ট করে। বাস্তবের সেক্সে অভাব থাকে না যখন মাস্টারবেশন তাকে সাপ্লিমেন্ট করতে পারে। তখন মাস্টারবেশন আর মাস্টারবেশন থাকে না বা বাস্তবের সেক্স বাস্তবিক, সব মিলে সেক্স তখন এক অন্য কিছু : সম্পূর্ণ। তখন বেডরুমের মানুষ এবং মানুষীটি অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যেন বা, 'এসো আমরা আজ এই রোলে প্লে করি।' সেই রোলগুলি লিপিবদ্ধ করা যায়—হয়—

বাৎসায়ন করেছিলেন। মাস্টারবেশন সম্পূর্ণ, কেননা মাস্টারবেশনের ভিতর দিয়েই প্রতিদিনের সেক্স তার মাত্রাগুলি অর্জন করে।

আমি পরাশর, তীব্র সূর্যকে ঢেকে দিলাম অমোঘ এক কুজ্ঝটিকায়, আমার স্পর্শে মেছুনী তখন সত্যবতী, রাজরানী : মহাভারতের মা। পারবে শান্তনু, রাজচক্রবর্তী, আমার মতো ঝর্ণা হতে, কিংবা জন্ম দিতে এক প্রবাদশিশুর ?
আমি এক নারী নির্মাণ করি, যার আত্মা নেই, শুধু শরীর আছে—উজ্জয়িনীর নারীরা তাঁর অনুকরণে ভ্রুবিলাস করে নগরীর রাজপথ দিয়ে হাঁটে শরীরময়ী "সেই নারী", এলিটপাড়ার হাভাতে স্বামীগুলো হাঁ করে দেখে।

সাত

সব কিছুতেই কি অর্থ আছে, খুঁজতেই হবে। সস্যুর বলেছিলেন যে শব্দজগতের আন্তঃসম্পর্কই অর্থ প্রকাশ করে। ডেরিডা সংশোধন করলেন : অর্থ তৈরি করে। কিন্তু অর্থ কি থাকতেই হবে ? মোনালিসার হাসির কি কোনো মানে আছে ?
হেগেল বলেছিলেন যে এসেন্স (সারবস্তু) অ্যাপিয়ারেন্স রূপে প্রকাশ পায়। ডেরিডা বললেন : অ্যাপিয়ারেন্স এসেন্স নির্মাণ করে। এসেন্স কি তৈরি করতেই হবে ? শুধু প্লে অফ অ্যাপিয়ারেন্সেস, হয় না ? যেখানে পাওয়ার নেই রিসন নেই ফুকো নেই ডেরিডা নেই, আছে শুধু তুমি আর আমি : প্রকৃতি, ভালবাসা অর্থাৎ বিস্মরণ। ডেরিডা রুসোর প্রকৃতি—স্টেট অফ নেচারের মানে বোঝেননি। প্রকৃতি হল সমাজেরই অভ্যন্তরে এক গুপ্তগহ্বর যেখানে সমাজের আলো—gaze—প্রবেশ করে না। অর্থাৎ বিস্মরণ আছে। বিস্মরণ কী ? প্রভু অর্থ তৈরি করে। তাই অর্থের বিস্মরণ—ডেস্ট্রাকশন—মানে প্রভুকে ভুলে যাওয়া, প্রভুর বিস্মরণ। গুপ্তগহ্বর তৈরি কর—আন্ডারগ্রাউন্ড, বেসএরিয়া—যা প্রভুর নাগালের বাইরে।
বিস্মরণ স্বাধীনতার আর এক নাম। যেহেতু সাম্য এক সোনার পাথরবাটি, এবং প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই একমাত্র বাস্তব, আমি সাম্য, স্বাধীনতা, ঈশ্বর বা প্রভুত্ব খুঁজি না, ভৃত্য-রূপে নিজেকে চিনি, বস্তুত প্রভুকেও। কেননা প্রভুরও সকল স্বাধীনতা নেই, যেমন প্রভুমাত্রেরই স্পন্ডিলাইটিস থাকে, ফলত সে মাথা নোয়াতে পারে না এবং এই কারণে প্রেম, কবিতা এবং ড্রাগ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রভুর কাজ জয় করা, এই কারণে সে অনেক সময় আহত হয়, যেমন হার্ট অ্যাটাকে এবং নিন্দুকের ছোড়া ঢিলে। বাঁচার জন্য তার কিছু পারিষদ চাই। প্রভু নির্বান্ধব। আমি প্রভু হতে চাই না।
নিজেকে ভৃত্যরূপে চেনাই হল সবচেয়ে বড় সচেতনতা। আর সকলেও ভৃত্য, শুধু জানে না যে তারা ভৃত্য; ফলত তারা প্রভুর কণ্ঠস্বরে কথা বলে। কেউ-কেউ সোস্যাল ক্লাইমবার যারা, প্রভুর এজেন্ট হয়। বাকিরা নিষ্পাপ, কিছুটা নির্বোধ, যীশুর সন্তান। (কলার তুলে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কলার চেপে ধর, দেখবে কলারের তলায় শিকলের দাগ।)

আমি প্রভু হতে চাই না কেননা আমার মনে হয় যে প্রভুর চেয়ে ভৃত্যই বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, প্রভু কবিতা বোঝে না যদিও সে কবিতা লেখে এবং বন্ধু-পত্নীদের কবিতা শোনায়। অবশ্য ভৃত্য হবার কয়েকটি অসুবিধা আছে। যেমন সময়মতো প্রোটিন, ভিটামিন এবং কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় না এবং সবসময়েই মাস্তানদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। আমি যেহেতু এইসকল অসুবিধার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে শিখেছি, ভৃত্য হওয়াই পছন্দ করি।
আমি ভৃত্য একটি সীমা পর্যন্ত, আপেক্ষিক। প্রভুকে আমি তার সীমা বেঁধে দিই— প্রভু যেন আমার শেকলে বাঁধা কুকুরটি। আমি কুকুরটিকে খাবার দেব, পরিবর্তে কুকুরটি আমার বাড়ি পাহারা দেবে, যেমন সূর্য ও স্যাটেলাইটগুলি পৃথিবী ও নেশনস্টেটগুলিকে রক্ষা করে তাদের নিরীক্ষণের মাধ্যমে। আমি প্রভুকে রাত্রির আকাশে তীব্র সার্চলাইট ঘোরাতে বলেছি যাতে আমি ধেয়ে আসা ঝড় এবং শত্রুদের আক্রমণের আগাম খবর পাই। শুধু রাত্রির আকাশে এক আশ্চর্য সিগনাল ঘোরাফেরা গুহা-মানবের কাছে, গুহা থেকে গুহান্তরে : সবকিছু ঠিক আছে তো? কখন জড়ো হতে হবে? কোথায়? কীভাবে? প্রভু এবং তার নির্বোধ চাকরেরা এর অর্থ বোঝেনি।
বাদবাকি বিস্মরণ—বিস্মরণ স্বাধীনতার আর এক নাম। কেন আমি সবসময় প্রভুর সঙ্গে লড়াই করব, অর্থাৎ প্রভুর কথা—প্রভু হবার কথা—ভাবব? কেন আমি দেখব নিজেকে প্রভুর চোখে, আয়নায়? চিরস্থায়ী যুদ্ধে কোনো মহত্ত্ব নাই : তারাই প্রভুর সবচেয়ে বড় সাধক যারা প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল চিরকাল।

কে রাজা কেই বা উজির? ঝুপড়ির ছেলেরা লিখতে শুরু করল, কাউন্টার হেগিমনি তৈরি হয়, গল্পের টিয়াপাখির শরীরে হাত পড়ে আর ভদ্দরলোকেরা তাদের জন্তুর মুখগুলো দেখাল—ওরা নাকি লেখাপড়া জানে, সোফিসটিকেটেড। জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করেই দিনরাত কাটাব কেন, এসো দিনশেষে আগুন জ্বালিয়ে একটুখানি উৎসব করি, নাচি, তারপর জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ি। গুহার কোটরে-কোটরে থাকবে হাতের ছাপ, তোমার, আমার : আমাদের লেখা। ঠোঁটগুলো সবসময়েই কামড়ে বসে থাকে কেন গো তোমার, যেন যুদ্ধজয় করতে চলেছ, ঠোঁট ভালবাসার জন্য, যুদ্ধজয়ের জন্য নয়। রোজ সকালে উঠে আমি মনে-মনে বলি : আজ নতুন করে প্রেমে পড়ব। মা বলে : পোড়ামুখী দু চক্ষের বিষ ফের তুই প্রেমে পড়েছিস। আমি বলি 'মা, তুমিও প্রেমে পড়, আর কতদিন স্বামীর বন্ধুদের আপ্যায়ন করে যাবে তুমি। এসো, বোষ্টুমী হই' জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস এবং জীবনানন্দ দাশের ব্যবধানে আর কোন কোন কবিকেই আমরা চিনি না ভোল ভোল বেঙ্গল রেঁনেসাস ভোল নৈয়ায়িকদের ভোল হুদি ভেসে যায় যমুনার জলে।

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

তুমি তো জান না কিছু, না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।

কপট ;
মূর্খ, সস্তায় বাজিমাত করছে ;

অগভীর,
ফ্রাসট্রেটেড ;
একটা জোকার, কিছু জানে না, হামবাগ ;
বদমাস।

মুখ আছে, বলে যাও। তবু তুমি আমাকে এড়াতে পারবে না। আমি তোমার ছায়া, তোমাকে অনুসরণ করি, গুপ্তচর। আমি তোমার মাথার চারিপাশে। তোমার কানের চারিপাশে। তোমার বুকের চারিপাশে, ভিতরে। তুমি আমার গান অস্বীকার করতে চাইছ, পারছ না, গানগুলি তোমাকে অনুসরণ করে, এনসার্কল করে, আক্রমণ করে, তোমার ভিতরে প্রবেশ করে, তুমি অন্ধকারে দেখ যাকে তুমি খুন করেছ সে : ভূত। আমি নগরীর ছেলেদের বাঁশি বাজিয়ে নিয়ে যাব সর্বনাশের দোরগোড়ায় আর ভদ্দর-লোকদের মেয়েদের শেখাব কেমন করে ঝুপড়ির ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। খাবার টেবিলে বসে তোমার মেয়ে যখন তার ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবে সেই অদ্ভুত মানুষটার কথা আর তুমি শুনবে যে তার মুখেও আছে কাটা দাগ তখন তুমি কী হল ভয় পেলে ?

আর সবাই যখন পংক্তিটির শেষ দুটি শব্দকে "লক্ষ্য করে" পড়ে একজন মামুলি প্রেমিকের দেবীপুজো দেখছেন, খালাসিটোলার এক লেখক শিখিয়েছিলেন যে শিরদাঁড়া সোজা করে পড়লে জীবনানন্দ দাশের কবিতার মানে কেমনভাবে বদলে যায়, ডিকনস্ট্রাকটেড হয়। শ্রী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ই ভারতবর্ষে ডিকনস্ট্রাকশনের প্রথম প্রবক্তা, উদ্ভাবক। □

ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা

সুকুমারী ভট্টাচার্য

ধর্মের ভূমিকায় ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ধর্মের নৈতিক দিকটি সমাজকে ধারণ করে, যাতে ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থকে আঘাত না করে ; এই অর্থেই 'ধৃ' ধাতুতে 'মণিন' প্রত্যয়ে ধর্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। কিন্তু নৈতিক নির্দেশ ছাড়াও ধর্মে আরও কিছু-কিছু দিক থাকে, যেমন আনুষ্ঠানিক দিক, বিশ্বাসের দিক ইত্যাদি। সাধারণত বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই অনুষ্ঠান হয়। দেবতাদের স্তবে, নৈবেদ্যে প্রসন্ন করে কিছু চাইলে তাঁরা তা দেন এইটি যজ্ঞের যুগের মুখ্য বিশ্বাস। এর মধ্যেও বেশ কয়েকটি অঙ্গ আছে বিশ্বাসে (১) দেবতারা আছেন (২) মানুষের প্রার্থনা তাঁরা শোনেন (৩) মানুষের প্রার্থনাপূরণের ক্ষমতা তাঁদের আছে (৪) এই প্রার্থনা-পূরণ তাঁরা করে থাকেন যথাবিহিত স্তব ও নৈবেদ্য পেলে। এই সব বিশ্বাসের ফল যজ্ঞানুষ্ঠান। বৈদিক যুগে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক কিংবা তারও কিছু পরে পর্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান হত। পরে পশু কৃষির কাজে বেশি প্রয়োজনীয় হওয়ায় যজ্ঞে পশুবলির যথেচ্ছ অপচয় বন্ধ হওয়ার পরে, ক্রমে প্রথমে অহিংস ধর্মাচরণ ও পরে জ্ঞানমার্গের কিছু ধর্মবিশ্বাস—আজীবিক, বৌদ্ধ, জৈন ও উপনিষদ্—সমাজে বিস্তার লাভ করে। এরই কিছুকাল পরে খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকে পূজার প্রচলন হয়। তখন বেদের দেবতার মতো নিরাকার দেবতার উপাসনা, মুক্ত ভূমির উপর কুশ বিছানো বেদীতে হত না ; তখন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। বিগ্রহ এসেছে, অন্য নৈবেদ্য (দুগ্ধজাত খাদ্য ও ফল ; আমিষ নৈবেদ্য প্রায় বন্ধ) হয়েছে। দেবতারাও প্রায় আমূল পরিবর্তিত হয়েছেন, সংখ্যায় অনেক বেড়েছেন। এর শাস্ত্র মহাভারতের শেষ প্রক্ষেপ—ভার্গব মুনিদের রচনা—ও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়।

যজ্ঞনির্ভরই হোক, পূজাভিত্তিকই হোক, ধর্ম মানুষকে কী দিয়েছে ? শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য বাদে সমাজে অনেক সংঘর্ষ ঠেকিয়েছে ধর্ম, সম্প্রীতির বাণী প্রচার করে। মানুষকে একধরনের সংহতি ও নিরাপত্তার বোধ দিয়েছে। আর ভরসা দিয়েছে, অদৃশ্য কোনো দেবলোকে মানুষের হিতৈষী দেবতারা তাদের বিপদে সাহায্য করেন। আয়ু, স্বাস্থ্য, বিত্ত, বিজয়, সন্তান, স্বর্গ, এমন কী মোক্ষও দেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক—মানুষ অসহায় অবস্থায় ঐকান্তিক আগ্রহে কামনা করেছে এই ভরসা, যা সে ধর্মের কাছ থেকে পেয়েছে।

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে যজ্ঞের ওপরে মানুষের বিশ্বাস টলে যেতে থাকে, পূজা

আসে। দেবতাকেন্দ্রিক নানা সম্প্রদায়—তার কিছু-কিছু বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ছিল—দেখা দেয়। পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে এই সময়কার ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়। জন্মান্তরবাদ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতক থেকেই ছিল, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাছাকাছি তার সঙ্গে যুক্ত হয় কর্মবাদ ও নিয়তিবাদ। পুরোহিত ও শাস্ত্রকারেরা সমাজের অভিভাবক হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কতকটা ঈর্ষাবিদ্বেষের সম্পর্ক ছিল, আবার পরস্পর-সহিষ্ণুতাও ছিল। কিন্তু সাধারণ দুঃখী মানুষকে বহু শতাব্দী ধরে বলা হতে লাগল তার দুঃখের কারণ (১) তার নিজেরই পূর্বজন্মের দুষ্কর্ম (২) নিয়তি। এ দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ এবং কোনোটারই কোনো প্রমাণ নেই তবু শাস্ত্র ও পুরোহিতদের কথাই মেনে নিল লোকে। তার একটা কারণ, অধিকাংশ দুঃখী দরিদ্র মানুষ কোনোমতেই বুঝতে পারছিল না তাদের দুর্দশার কারণ কী। পুণ্যবান্ লোকও দুঃখ পাচ্ছে, আর দুরাচার ব্যক্তি সবরকমে আরামে আছে—এই ব্যাপারটার কোনো ব্যাখ্যা তারা পেত না। তাই তাদের বোঝানো হল গত জন্মের পাপেই তাদের দুঃখ, এ জন্মটা উচ্চ ত্রিবর্ণের ধনীদের সেবা করলে আগামী জন্মে সুখের সম্ভাবনা আছে। এখন পূর্বজন্মও অভিজ্ঞতার বাইরে, আগামী জন্মও তাই, কাজেই মানুষকে বোঝানো হল, অলক্ষ্যে অ-দৃষ্ট তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ সমাজের অত্যাচার অন্যায় অবিচারকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হল, যে সমাজের ওপরতলার লোকেরা নিচুতলার মানুষের নিষ্প্রতিবাদ সেবা পেয়েই চলবে, একটা মিথ্যা প্রত্যাশায় প্রবঞ্চিত হয়ে।

যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড যখন ক্রমেই নানা নামে ও জটিলতায় ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছিল এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন তার প্রতিবাদে ধীরে ধীরে জ্ঞান-কাণ্ড নানা প্রস্থানে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করল : উপনিষদ্, আজীবিক, বৌদ্ধ, জৈন ও নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, যাদের সকলের বিস্তৃত পরিচয় আজ আর বিশেষ পাওয়া যায় না। এরা সকলেই জন্মান্তরে ও মোক্ষে বিশ্বাসী এবং আজীবিক বাদে বাকি প্রায় সকলেই কর্মবাদেও বিশ্বাসী। কিন্তু এগুলির মধ্যে দর্শন ও তত্ত্বগত দিক সবটা জনসাধারণের বোধগম্য হত না, নীতি ও সামাজিক নির্দেশের মধ্যেই এগুলি ক্রমে সীমিত হল। কিছুকাল পরে জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মেই কার্যত অন্তর্ভুক্ত হল, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হল ; সমাজ তখন পৌরাণিক, সম্প্রদায়-বিভক্ত, ও প্রধানত পূজানিষ্ঠ। বহু নতুন দেবতার আবির্ভাব হচ্ছিল এবং তাদের ঘিরে নতুন নতুন বিশ্বাস-সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল। যদিও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রধান ছিল, তবু এগুলি ছাড়াও অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। জনমানসের এক এক ধরনের প্রয়োজন মেটাত এক এক সম্প্রদায় ; এবং প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কালগত বিবর্তন দেখা দিয়েছিল তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এসব বিবর্তন এসেছিল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরিবর্তিত আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে। তবুও ক্রমে-ক্রমে সব সম্প্রদায়ই শিলীভূত হয়ে যেতে থাকে, বিশ্বাস করে তার মতটিই একমাত্র সত্য, বাকিরা ভ্রান্ত।

তাছাড়া মুসলিম-বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে, মুসলিম সমাজেও হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মেছিল। দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান ছিল সুফীসম্প্রদায়ের। মধ্যযুগের শেষদিকে প্রতিবাদের প্রবক্তা হিসেবে দেখা দেন কবীর, নানক, দাদু, রামদাস, শংকরদেব, চৈতন্য, জ্ঞানদেব এঁরা। এঁরা প্রত্যেকেই সম্প্রীতির কথা বলেন, মোল্লা-মৌলভি পাণ্ডা-পুরোহিতদের স্বার্থসর্বস্ব ভূমিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, জাত-পাতের অসারতা প্রচার করেন এবং সাধারণ দুঃখী মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন এক ধর্মবোধের কথা বলেন যেখানে বিভেদ গৌণ, মানুষে-মানুষে মিলনই সত্যতর, যেখানে ধর্মগুরু বা পুরোহিতরা বা সমাজপতিরা নিচুতলার মানুষকে শোষণ করতে পারে না। এঁদের ঈশ্বর দীনহীনকে আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন সর্বভাবে। কিছুকাল এঁদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিবাদটি জীবিত থাকে এবং সমাজের এক অংশের প্রাণবত্তাকে ধরে রাখে। কিন্তু মূল ধর্মসম্প্রদায়গুলি দু-ভাবে সক্রিয় হয়। প্রথমত, প্রতিবাদীদের নানাভাবে পীড়ন নির্যাতন করে, কারণ ওই মূল ধর্মগুলির আচার্য পুরোহিতরা অধিকাংশ স্থলেই রাষ্ট্রশক্তির কাছাকাছি থাকে এবং সে শক্তির সাহায্যে এদের অত্যাচারের ক্ষমতা অব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদী মতগুলির কিছু-কিছু তত্ত্ব এরা মূল ধর্মতত্ত্বের মধ্যে স্বীকার করে নেয়। এছাড়াও, প্রতিবাদী মত যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে তাদের অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে কিছুকাল পরে প্রতিষ্ঠার পথ ধরে আপনিই আসে অবক্ষয়, ঘুণ ধরে সম্প্রদায়ের মধ্যে; বিভেদ সৃষ্ট হয় ও ধীরে ধীরে সেগুলি ক্ষীণবল হয়ে হয়ে লোপ পায়, নয়ত মূল ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এমনি করেই মধ্যযুগের সন্তদের নির্মিত সম্প্রদায়গুলির জীবনীশক্তির ক্ষয় হল একদিন।

শোষণ ও নির্যাতন থামেনা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, তাদের রূপ পরিবর্তিত হয় মাত্র। ইংরেজ রাজত্বের একটি মূল রাষ্ট্রনীতি ছিল হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ ঘটিয়ে নিজের রাষ্ট্রশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় সামাজিক পীড়নের সঙ্গে জুড়ল বিদেশি রাষ্ট্রশক্তির চাপ। সমাজের বিন্যাসে নতুন শ্রেণীভেদ হল। বর্ণবৈষম্য, জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র এ ভেদগুলি তো ছিলই, তার সঙ্গে সংযুক্ত হল 'বাবু' অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত, এবং অধিকাংশক্ষেত্রে ইংরেজের দরবারে চাকুরিজীবী নতুন এক শ্রেণী; বাকিরা যারা ইংরেজি জানে না, পাশ্চাত্য প্রভাবের বাইরে চিরাচরিত জীবনযাত্রায় যাদের দিন কাটছে তারা ক্রমেই সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে' ভাগ হয়ে গেল সমাজ। অপ্রত্যক্ষ, গৌণ আর এক পীড়ন এল জনসাধারণের জীবনে। ধর্ম তখন নানা নামে বিরাজিত—হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তো ছিলই, ইসলামও ছিল, নতুন এল খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পন্থী আরও ছোটবড় নানা সম্প্রদায়। মৌলিক ভেদটা—ভদ্রলোক-ছোটলোকের—রয়েই গেল।

এই অপরিচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ধনী দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান জাতপাতের কঠোর নির্দেশ, নানা ধর্মের বিভ্রান্তিকর পরিমণ্ডল,

এবং এরই সঙ্গে ভদ্রলোক-ছোটলোকের দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন অংশ। আবার প্রতিবাদ দেখা দিল সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে। যদিও খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজীদেরও বহু অনুগামী ছিল দরিদ্র অশিক্ষিতদের মধ্যেও, তবু এগুলি মূলত ভদ্রলোকের মধ্যে অভ্যুত্থিত এবং এদের ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশই শিক্ষিত। ভদ্রলোকের সমাজে যেমন এইসব প্রতিবাদী সংস্থা, সমাজের প্রত্যন্ত দেশে তখন আর এক চিত্র। একদিকে জীবন-জীবিকার প্রবল চাপ, বিদেশী শাসনব্যবস্থার অবোধ্য রাষ্ট্রযন্ত্র, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের নানা নতুন মাত্রা যোগ হতে লাগল দুঃখীর জীবনে। হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হল সাধারণ মানুষ। পাশ্চাত্যীকরণের নতুন পরিমণ্ডলে, অভাবের নতুন চেহারায়, চাকুরির নতুন নিয়মকানুনে, বিচারব্যবস্থার পরিবর্তনে, সর্বাঙ্গীন বঞ্চনার লক্ষ্য এই দরিদ্রসাধারণের মধ্যে অসহ্য একটা বস্তুগত জীবনের ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিবাদ এল আবার মূল ধর্মধারার বাইরে সরে গিয়ে নতুন মত ও পথ ঘোষণা করে। কখনো যৎসামান্য অনুষ্ঠানে, কখনো নতুন আচারে, কখনো প্রতীকী উপাসনায়, কখনো নতুন ধরনের গুরুবাদে এঁরা প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন, গোপনে, বড় রাস্তা থেকে সরে গিয়ে, সবার অলক্ষ্যে সমাজের দূরতম প্রান্তে। আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, লালন ফকির, সাহেবধনী, কর্তাভজা, খুশি বিশ্বাসী আরও অনেক অকীর্তিতনাম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে। এঁদের অধিকাংশই গুরুকেন্দ্রিক। এক পথ-প্রদর্শকের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে দুর্বহ জীবনভারে মনের দিকে কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ এঁরা নতুন সম্প্রদায়ের দীক্ষায় লুপ্ত আত্মবিশ্বাস খানিকটা যেন ফিরে পেলেন। এঁরা সকলেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অস্বীকার করেছেন, জাতপাত মানতে রাজি হননি, কোনো ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করেননি, আদিপ্রবক্তা ও কখনো-কখনো তাঁর বংশধর বা শিষ্যপরম্পরাগত উত্তরপুরুষকে 'গুরু' বলে মেনেছেন। ফলে সম্প্রদায়ের বাকি সকলেই স্বাভাবিকভাবেই ভাই-বোন হয়ে গেছেন। সকল ধর্মই চেষ্টা করেছে ভগবানকে 'বিশ্বপিতা' বলতে, বলেওছে শাস্ত্রবচনে, কিন্তু এর থেকে যা প্রতিপন্ন হয় অর্থাৎ তাহলে বিশ্বপিতার সকল সন্তানই সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভাই-ভাই, এই কথাটাতেই ঠেকে গেছে। সে কি আজ ? বেদান্তের মূলে ভণ্ডামির উদ্ভাবনের সময় থেকেই। শংকরমতে ছুঁচো-পেঁচা-সাপ-ইঁদুর সবের মধ্যে ব্রহ্ম আছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ চণ্ডাল-খ্রীস্টান-মুসলমানে গিয়ে হিন্দু বেদান্তীর সর্বজীবেব্রহ্ম দৃষ্টি আটকে যায়। মূল ধর্মধারার এইসব ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, কাজে ও কথায় ঘোরতর অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী সংস্থাগুলির উদ্ভব হয়। এঁরা গুরুর বা তাঁর শিষ্যের রচিত গান করেন সমবেতভাবে, হয়ত বা তাঁর সমাধি বা কোনো পীঠস্থানে ফুলজলপাতা দেন ; এঁদের সমবেত উৎসবে—বার্ষিক বা বিশেষ তিথিভিত্তিক—খাওয়াটা নেহাৎ দরিদ্র মানুষের মতো সাদামাটা। গান-সংকীর্তন একত্র উপাসনাই মুখ্য। ঈশ্বর, কখনো বা গুরু বিশ্বপিতা ; মানুষমাত্রেই জাতিধর্মবর্ণসম্প্রদায়নির্বিচারে তাঁর সন্তান, অতএব তারা পরস্পরের ভাই-বোন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখ্য ধর্মপ্রস্থানগুলি মুখে ঐক্যের কথা বললেও কাজে

বিভেদকে মেনে নেয়; তাই ঐক্য, সৌভ্রাত্র, সার্বজনীনতাকে কাজে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এইসব ছোট ছোট সম্প্রদায় তৈরি হয়। যতদিন এই বিশ্বাস ও আচরণে ঐক্য থাকে, ততদিন সজীব থাকে এই সংস্থাগুলি; যদি কাজে-কথায় গরমিল দেখা দেয়, তখন এরা ক্ষীণবল হয়ে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়, বা মূলধর্মস্রোতে বিলীন হয়ে যায়। ইংরেজ চলে যাবার পরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রাষ্ট্রব্যবস্থায় নীতির দিক থেকে স্বীকৃত রইল না, জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে কোনোটিই প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতার নীতি ঘোষণা করেনি, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ বাদে। তবু মাঝে-মাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে; ধর্মীয় সংস্থা এগিয়ে এসে থামায় না, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ভেতরে-ভেতরে ধূমায়িত হতে থাকে। গত কুড়ি বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতাতে যুযুধান, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতালোভী হিন্দুত্ব এতদিনে রক্তাক্ত নখদন্ত প্রকাশ করেছে। হাস্যকর-রকমে তুচ্ছ দাবি এখন যুদ্ধবাজদের ঘোষিত দাবি: যে রামের কোনো ঐতিহাসিক সত্তাই প্রমাণিত নয়, অযোধ্যা-সাকেতের ভৌগোলিক অবস্থান যেখানে সংশয়িত, রামের জন্মভূমির কোনো নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ যেখানে রূপকথার পরিসরেই শুধু সম্ভব, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর যে, এই বৃহৎ দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়, গৃহহীন, সেইখানে ভিন্নধর্মীর একটি প্রাচীন উপাসনাস্থান চূর্ণ করে। ঠিক সেই জায়গাতেই 'রামজন্মভূমি' মন্দির নির্মাণ করাই সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রয়োজন মনে হল। কাজেই হিন্দু ধর্ম আজ তার প্রাচীন অবস্থানের যে সামান্য পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তা বর্জন করে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের লোভে উদগ্র হয়ে, নখদন্ত প্রকাশ করেছে। এবং মূলধর্মধারার অধিপতিরা কেউ সবাক্‌ভাবে কেউবা নীরব সম্মতি দিয়ে এ উন্মত্ততার সমর্থন করছে, অর্থাৎ এই ভ্রাতৃঘাতী ধর্মীয় জিঘাংসা বাধা পাচ্ছে না মূল ধর্মসংস্থার কাছে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য ক্ষোভের কারণ ঘটেছে এবং তাতে যদি ইসলামীয় ধর্মান্ধতা ইন্ধন জোগায়, তাহলে দেশজোড়া দাবানল জ্বলে ওঠা অনিবার্য। অবশ্য, সেটা মৌলবাদী হিন্দু একলা হাতেই সম্পাদন করতে পারে কারণ ভারতবর্ষে তারা শতকরা বিরাশি জন, অতএব প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী।

আজ হিন্দু মৌলবাদের যে অনমনীয়তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ, ইতিহাসে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের এক কাল্পনিক অতীতের অভিমুখে স্থাপন করছে, তার অমঙ্গল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু আজ হিন্দু মৌলবাদের আড়ালে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই প্রতিবাদী ধর্ম দিয়ে এর প্রতিকার হবে না, সুস্থ দেশ-প্রেমিক সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে এই অন্ধ ক্রূর জিঘাংসার প্রতিবাদ করছে সমবেত ভাবে, এবং প্রতিকার যদি আসে তো সেখান থেকেই আসবে।

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে দেখেছি, মূল ধর্মধারার মধ্যে তত্ত্বগত, সম্প্রদায়গত ও আচরণগত অবক্ষয় ও অসহিষ্ণুতা দেখা গেলে, কিছু মানুষ বাইরে বেরিয়ে এসে সৌভ্রাত্র, সংস্কারমুক্তি, সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করেছে বারেবারেই। কিছুদিন পরে যদি সে সংস্থাতেও অনমনীয়তা ও অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করে, তবে আবার মানুষ অন্যভাবে

ওই একই উদ্দেশ্যে নতুন প্রতিবাদী সংস্থা সৃষ্টি করেছে। আজই প্রথম ধর্মীয় প্রতিবাদী সংস্থার স্থান নিয়েছে সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি। হিন্দু মৌলবাদের, 'মর্যাদা পুরুষোত্তম', 'রামরাজ্য', 'হিন্দুরাষ্ট্র' এসব ধারণা যে প্রকৃতপক্ষে সত্যকার ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ক্ষমতালোভীর জিঘাংসাপ্রণোদিত, তা সাধারণ মানুষ বুঝছে ধীরে ধীরে, এবং হাতে হাত মিলিয়ে ঘোষণা করছে, ভারতবাসী শুধুমাত্র 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নীতির দ্বারাই চালিত হবে, মৌলবাদের দ্বারা নয়। □

আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে

উদয়ন ঘোষ

[উদয়নের এই লেখাটি দু'টি কিস্তিতে ছাপা হবে। এবার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল। ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা ছাপা হওয়া কাম্য নয়। পুরো লেখাটি লেখক এখনও শেষ করতে পারেননি, তাই এই ব্যবস্থা। —সম্পাদক]

প্রথম অধ্যায়

চারিদিকে, নীল সাগর, ডাকে, শুনি।

পাঠক, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি প্রকৃতই আমার নীলিমা, প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় আপনাকে। বস্তুত, আপনি আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। আপনি—আমি আইডেনটিক্যাল, আবার এলিয়েনেটেডও। না হলে আপনার জন্য এই লেখার কোনো প্রয়োজন থাকত কি? আমরা তো কবেই আথেন্সের উপকণ্ঠ আকাদেমি-উদ্যান থেকে স্বভাব-কবিকে নির্বাসন দিয়েছি। স্থান দি'নি তো ইউটোপিয়ায়। অভিব্যক্তি জরুরী, আর অভিব্যক্তি মানেই তো আপনি, তাই না? আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

নিবেদন এই যে, বেশ কিছুদিন হল 'আমি এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে' নামে এক লেখা পাই এক একজিকিউটিভ ডাইরীর পাতায়, তাঁরই ডেথবেডে, লুম্বিনী পার্কে। পাঠক, এই লেখা তারই অনুলেখন মাত্র। ঘটনা ও চরিত্র রিয়াল, তাই কাল্পনিক[১] নাম রেখেছি।

'আমি এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে'

আমি এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। যাঁর পাতায় লিখে যাব বলে আজ কলম ধরেছি, তিনি

---

১. তুলনীয়: 'আমরা কল্পনা করি নানা দৃশ্য নানান চেহারা / এ হল কল্পনালোক, কল্পনালোকের সব প্রাণীরা জীবিত। / ···এমনকি একজন ব্যক্তিকে কল্পনালোকে, স্বপ্নলোকে, ইহলোকে দেখে নাকি মানুষেরা।'

'...কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি একটা গরুর ছটা শিঙ / এ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হল না; একজন / মানুষের বুকে এক হাত আছে গলার নীচেই / এ দৃশ্য কল্পনা করা কখনো সম্ভব নয়, ফলে / বোঝা যায় যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে! / শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব। / এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে।'

বিনয় মজুমদারের কবিতার দুটি উদ্ধৃতির 'কল্পনালোক', 'ইহলোক' তথা 'কল্পনা' আশা করি পাঠক বুঝবেন। বিনয় মজুমদারের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটির নিম্নরেখ টানা সম্পাদকের একধরনের পাঠ-নির্দেশ। সম্পাদক : উদয়ন ঘোষ।

একজন একজিকিউটিভ, লাল ভেলভেটের জ্যাকেটে কেমন যেন স্পর্শসুখ লাগে। বিপদ এই যে, যে কোনো এলাইট একজিকিউটিভ বস্তুই, আচম্বিতে, সারফেসে এসে যান। কিন্তু এটা যেহেতু আমার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক, তাই এঁকে পেয়েই আমি বেশ গোলে পড়েছিলাম। লিখে-টিকে রাখি কোথায় ? উপরন্তু আমি নিজে দেখতে ভালো না, আমার মণিবন্ধ এত রোগা যে, কেবলি আমার লিকলিকে লিঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়ে যাই। তাই আমার হাতে এই ডাইরী মোটেই সোনার হাতে হল না, সোনার কাঁকন যদিও তিনি, তবু, বাস্তবিক, কে কার অলংকারও হল না। এঁকে আমি লিখে-টিকে রাখি কোথায় ?

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডেই রাখি।

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবন-যাপন শুরু হয়েছে, সেই ১৯৫১ থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সবে তখন মামাবাড়ি শিলিগুড়ি গেছি। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো হলেও আমার এই সবেধন নীলমণি মামার ইনার-আই আছে। তাঁরই প্যাকেট থেকে চুপিসারে সিগারেট নিয়ে সেই সাতসকালে পায়খানায় গিয়ে সুখটান দিয়েছি সবে, অমনি ইনার-আই 'বন্ধঘরে সিগারেট খেতে নেই, ওতে কার্বন মোনোক্সাইড/ডায়োক্সাইড জমে তোকে শেষ করবে।'

সেইদিন থেকে আমি অদ্যাপি, সবরকম ওয়াটার-ক্লোজেটে, বন্ধঘরে, যতক্ষণ থাকি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাই।

থাকি তখন কৃষ্ণনগরে। এখানে একদা আমি বাস্তবিক এক নকশালী আন্ডারগ্রাউন্ড দেখি। অবশ্য তার চেয়েও প্রকৃত নকশালী আন্ডারগ্রাউন্ড দেখি আমি বীরভূমের জঙ্গলে। সে কথা পরে লিখব।

এখন লেখার এই যে, আমি আমার এই লেখা কোথায় লুকিয়ে রাখছি। যাতে কেউ দেখতে না পায়। অন্যের ডাইরী না দেখার কোড অফ কনডাক্ট আমার বাড়িতে কারুর নেই। বরং আমার বাড়ির লোক খোঁজে, কে আমাকে চিঠি দিল, আমি কাকে চিঠি লিখছি, অথচ শেষ না করে রেখে দিয়েছি, পরে গেছি ভুলে, এমন চিঠি দেখেছে আমার স্ত্রীও। বিবাহের পর থেকেই তার ঐ খোঁজ। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার স্ত্রী বিলক্ষণ লিখতে পারতেন Discovery of my Husband. না, পারতেন না। আমাকে আবিষ্কার করা বড় কঠিন। কেননা আমার আন্ডারগ্রাউন্ড আছে। আমি বেশির ভাগ সময় আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকি। সারফেসে আমাকে পেলেও আমি হয়ত তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। আমার আন্ডারগ্রাউন্ড অবশ্য বাস্তবিক নয়। তবু, হ্যাঁ, আমি, তবু, আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকি। যখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম, তখনো ছিলাম, এখন যে আসানসোলে থাকি, এখনো আছি। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণনগরের বাড়ি আমার পৈত্রিক বাড়ি। তার বয়স ১৯৯৩-এ ৫৫ বছর হল। অর্থাৎ ঐ বাড়ি দেশভাগের আগে। তার চুনকাম হয়েছে বটে, কিন্তু তার এলিমেন্টাল কোনো পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত গুণগত কি পরিমাণগত কোনো পরিবর্তনই হয়নি। যে কারণে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘর বছর-বছর বদলেছে।

নির্দিষ্ট ঘর রাখা যায়নি। আমার বাবা কৃষ্ণনগরের চাকরির সূত্রে ১৯৩৯-এ এসে, প্রথমে ভাড়া বাড়ি—পরে এই বাড়ি করেন কিন্তু সেভাবে বাড়ি করেননি ঐ কৃষ্ণনগরে এসে। আমাদের দেশবাড়ি, রংপুর নীলকামারীতে যেমন বেডরুম তথা মাস্টার বেডরুম ছিল না—ছিল উত্তর ঘর, দক্ষিণ ঘর, বড়ঘর, বাইরবেরি (বৈঠকখানা) ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর আমিষ, রান্নাঘর নিরামিষ (হবিষ্যি)—প্রায় তেমনি এই কৃষ্ণনগরেও বাবা যে বাড়ি করেছিলেন, তাতেও শোবার ঘর ছিল না। কেবল বড়ঘর, মাঝের ঘর, গ্যারেজের ওপরের ঘর, ফালতু ঘর (একপ্রকার স্টাডি-কাম-গেস্ট রুম—এখানে বলা ভালো, আমার, ঠাকুর্দা ঐ নীলকামারীর কল্যাণে, দু-চারটি স্টেশন পর, হলদিবাড়ির নেক্সট স্টেশন, তৎকালীন জলপাইগুড়িতে, যেতেন—ঐ সূত্রে আমার পিশিমার বড় ভাশুরের, যিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন, ডুয়ার্সের দেবপাড়া টি-এস্টেটের, কাছে যেতেন—সেখানেও ঐ ফালতু ঘর ছিল, যা ছিল আদ্যন্ত গেস্ট রুম) ইত্যাদি ঘর ছিল ঐ কৃষ্ণনগরে। কিন্তু আমি, বাড়ির বড় ছেলে, আমার বিবাহিত জীবনের শোবার ঘর, আমার একমাত্র ভায়ের ও বোনের শোবার ঘর, ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল না। আমরা আসানসোল থেকে ছুটি-ছাটায়, কলেজে অধ্যাপনা করার দৌলতে, দু-দুবার বছরে বড় ছুটি পেয়ে যখন যেতাম কৃষ্ণনগর, তখন কোনোবার ঐ মাঝের ঘর অথবা গ্যারেজের ওপরের ঘর, কখনো-বা ঐ ফালতু ঘরে থাকতাম, এ নিয়ে আমার স্ত্রীর অনুযোগ ছিল। কেননা, নির্দিষ্ট ঘর না থাকলে কনজুগাল-লাইফে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়, সে নিয়ে জীবনে যে কত টানাপোড়েন এবং সেই সূত্রে আমাদের উভয়ের কত যে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি হয়, সে সব কথা সময়কালে বলা যাবে। এখানে বলে রাখা ভালো, বড় ঘর বলে কথিত ঘরে মা-বাবা শুতেন, বরাবর শুতেন,—এতেও আমার স্ত্রীর ক্ষোভ ছিল। সে যাই হোক, এই কৃষ্ণনগরী কাঠামোতে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল ঐ ফালতু ঘর। ফালতু ঘরে একটা নীলকামারী কায়দায় 'কার' ছিল। 'কার' হল এখনকার loft অর্থাৎ upper room, upper chamber, অর্থাৎ যদিও তা 'কার'/ upper chamber কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ঐ ছিল আমার আন্ডারগ্রাউন্ড, ওখানে উঠবার বিলট-ইন সিঁড়ি ছিল, লোহার। ওখানে রাখতাম ঐ ডাইরী। তাও এক কাঠের বাক্সে, যেখানে পুরনো বই থাকত, বাবা কিছু ফেলতে পারতেন না।

ঐ 'কারে' আমি জীবনে প্রথম সহবাস করি আমার প্রতিবেশী এক 'দিদির' সঙ্গে। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি, ১৯৫০, ঐ দিদি তখন স্কুল টিচার, ইংরেজির। অসম্ভব ভালো ইংরেজি জানতেন। ট্রান্সলেশনে মাস্টার ছিলেন। লেটার-রাইটিঙেও। কত চিঠি আমাকে লিখেছেন। আমি তখন কলকাতায় এম. এ. পড়ি। সব বাংলাতে। বাংলাতেও উনি মাস্টার। আমি তাকে আনন্দময়ী[১] ডাকতাম। কেননা তিনি আমাকে, একদা,

১. তুলনীয় : Only good actions are expedient ; only a man who is kind is reasonable and reasonable to the exact extent of his kindness : Chernishevsky on Dostoyevsky.

আমার প্রথম ভয়ানক মন খারাপ করার দিনে, আনন্দ দিয়েছিলেন ; না, ঐ আনন্দ নয়। ঐ আনন্দ তো ঐ 'কারে'-এ, upper chamber তথা sky বা আকাশে, হ্যাঁ loft তো আকাশও হয়, অথবা sky, air ইত্যাদিও হয়—ভাবা যায়—আমার প্রথম সহবাস air বা sky-তে, loft-এ, 'কারে' ? ওখানেই রেখেছি আমার সব, আমার ডাইরী, আমার মদের বোতল (এম. এ. পড়াকালীন যে অভ্যাস আমার হয়েছিল সিগনেটের বুড়োর কৃপায়, আঃ, ওখানেই বুড়োর কৃপায় তৎকালীন সাউথ পয়েন্টের ক্র্যাফটের টিচার কমল কুমার মজুমদারকে দেখি, আর দেখি তাঁর 'ঢ্যাঙা'কে, অর্থাৎ মানিকদা সত্যজিৎ রায়কে। ঐ কমলদাই আমাকে ১৯৫৮ তে প্রথম কে. টি., খালাসি টোলায় নিয়ে যান, ছোট এলাচ তারপর খাওয়ান, মদ্যপানের পর কুলকুচি করতে হয়, তাতে দাঁত ভালো থাকে এ-সব শেখান) আমার নিজেরই উপার্জন থেকে সরানো টাকা (এরিয়ার বাবদ পাওয়া টাকা, ইউ. জি. সি.-র, যা মা বা স্ত্রীর গোচরে ছিল না, তাও আমি ঐ 'কারে' রাখতাম। এই সেদিনও রেখেছি, ১৯৯০-এ, যখন এরিয়ার বাবদ বেতনবৃদ্ধির ৪৫ হাজার টাকা পাই—তার থেকে ৫০০০ সরিয়ে রেখেছিলাম ঐ কারে, তা দিয়ে কি করেছি যদি কারুর কৌতূহল থাকে জানার, তাহলে তাকে জানাই, একদা ১৯৭৫ পর্যন্ত নকশাল-বাড়ির দাবানলে ঢেলেছি, পরে আমার গণ্ডগোলে হিসেবে, যখন ২/৪ শত টাকার হিসেব মেলাতে পারতাম না, তা ঐ আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই ম্যানেজ করতাম। এখন ঐ 'কারে' এক কানাকড়ি নেই। কিসে খরচ হল সে কথা পরে। তবে জ্ঞানত কোনো অবৈধ পথে খরচ করিনি। সেদিক থেকে আমি কৃপণ, কৃপণরা অবৈধ পথে অপব্যয় করতে পারে না, সে-রকম হাড় কেপ্পন ঐ কারণে আদৌ অবৈধ পথে পা বাড়ায় না। আমি অবশ্য অবৈধ পথে অনেকবার গেছি, সবই প্রায় কানাকড়ি খরচ না করে। যাঁরা বলেন, স্বেচ্ছাচারী হলে, উচ্ছৃংখল হলে সে অপব্যয়ী হয়—কথাটা সত্য হলেও, পুরো সত্য নয়, আমিই তার প্রমাণ, সে কথাও সময়কালে ডিটেলে লেখা যাবে। সবই যে লিখতে হবে আমাকে—কেননা, বিবেকদংশন, না বিবেকদংশন নয়, সত্যের চেহারা যে কত বৈধ ও আবার অবৈধ, এ দেখে আমি আত্মহারা, তথা আমি ডিপ্রেসড, যে জন্য আমাকে লিখতেই হবে।

লিখে দেখেছি, প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তো আমার আন্ডারগ্রাউন্ড হল ঐ। বলা যায়, ১৯৮০ থেকেই, আমার ঐ আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ যে ১৯৮০ তে, তখন থেকেই আমি, আন্ডারগ্রাউন্ড বা আন্ডারওয়ারলড বুঝি, বা কথায় ব্যবহার করি অধিকন্তু ঐ সময়েই এক জয়ানে আমার ডস্টয়েভস্কির *Notes from the underground* পড়া হয়ে যায়। কান্টের *The Beautiful and Sublime* ও। আমি সব কথা তাকে বলতাম, অর্থাৎ আমার ঐ আনন্দময়ীকে। না, স্বীকার করা ভালো, সব কথা বলা যেত না। বলা যায় না। এই এখন যে সব কথা লিখছি, এ কেবল পারছি, কেন না, এ তো বলা ভালো যে নিজেকেই বলা—তাই পারছি সব লিখতে। তবে এও ঠিক যে কতগুলি কথা আছে, যা নিজেকেও বলা যায় না। বল্লে,

চাবকাতে ইচ্ছে করে নিজেকে। বলতে ইচ্ছে করে, না, ওসব কথা শিকেয় তুলে রাখ। ভাবতে নেই সব কথা, কথা—কে হায়, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

যাই হোক, আমার ঐ আনন্দময়ী, যাঁর কাছে প্রায় সব কিছুই কনফেস করেছি এবং কনফেসনের সূত্রেই তিনি আনন্দময়ী কেননা ঐ ১৯৫০-এ কৃষ্ণনগরে দেরাদুনের মা আনন্দময়ী এসেছিলেন। তখন তাঁর খুবই নাম-ডাক। আমি অব্দি গিয়েছিলাম ঐ ধর্মসভায়। মা-বাবা তো গিয়েছিলেনই। ঐ আমার আনন্দময়ীও গিয়েছিলেন। সেখানে মহিলারাই বেশি যেতেন। এবং মহিলাদের সঙ্গে, তেমন করে প্রার্থনা জানালে, নিভৃতে তিনি কথাও বলতেন, শুনতেন। মহিলাদের সবরকম সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, যদি তাদের ঐ কনফেসন ঠিকঠাক হত তাঁর কাছে। আমি এমন 'নিভৃত' (আন্ডারগ্রাউন্ড ?) থেকে বেরিয়ে আসা অনেক মহিলার মধ্যে সমাহিত আনন্দ দেখেছি। তাই কনফেস করে আমারও যখন প্রথম আনন্দ হয় আমার আনন্দময়ীর কাছে, তখন তাঁকেও আমি আনন্দময়ী ডাকি। এ কেবল আমার আর তাঁর মধ্যে। সম্ভবত আমার স্ত্রী টের পেয়েছিলেন ১৯৫৮-তে, যে বছর আমাদের বিয়ে হয়, যে বিবাহে আনন্দময়ীর ভূমিকা ছিল মুখ্য—এবং সে কথাও যথাসময়ে লিখব।

এখন মাত্র বলার এই, ১৯৮০-তে আমার মা আনন্দময়ী, হ্যাঁ আমার মা আনন্দময়ী, মা, কেননা আমি সেই ১৯৭০-এ বিবাহের বেশ কিছু পরে, আমার মা আনন্দময়ীর বুকের দুধ খেয়েছিলাম। তাঁর দু বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। এবং তাঁর বিবাহের একবছর পর তিনি মা হন।··· সেই সময় ঐ নকশালবাড়ির কল্যাণে আমি মা আনন্দময়ীর কুচবিহারে যাই। সেও আমার একপ্রকার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া। কেননা আমি তখন নকশাল-বাড়ির দাবানলে জ্বলছি। আমার তখন আসানসোলে থাকা নিরাপদ নয়। না, পুলিশের জন্য না, সি. পি. এম. ঠ্যাঙারে বাহিনীর জন্য। মতাদর্শগত অ্যান্টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশনের হাত থেকে নিজেকে লুকাতে। ওঃ, ভাবা যায়, সেখানে একরাত্রে, ভয়ে, আতংকে, কয়েকটি সন্দেহজনক যুবকদের সন্ধ্যায় ঐ আনন্দময়ীর কোয়ার্টার্সে ঘোরাফেরা করতে দেখে, রাত্রে আনন্দময়ীর কাছে শুই। একপাশে সদ্য একবছরের শিশু ডানদিকে, আর তাঁর বাম পাশে আমি। বামবিচ্যুতি অথবা আলট্রা-লেফটিজম, অ্যান ইনফেনটাইল ডিজঅর্ডারে একেবারে ভয়ার্ত শিশু বনে গিয়ে, আনন্দময়ীর বুকে মুখ গুঁজে। যখন সদ্য শিশুকে দুধ খাইয়ে তার বুক খোলাই ছিল। সেখানে মুখ দিয়ে শিশুর মুখ দেয়া বামবুকের দুধ খাই। আনন্দময়ী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেছিলেন, আয় বুকে আয়, খোকন আমার ভয় কি, তোকে বুকে আগলে রক্ষা করব।

রক্ষা পেয়েছিলাম। মায়ের বুকের দুধ যেমন রক্ষা করে শিশুকে, তেমনি সেদিন আনন্দ-ময়ী আমার ইনফেনটাইল ডিজঅর্ডারকে রক্ষা করেছিলেন।

যে কথা আগে লিখতে চেয়েছিলাম, সেটা লিখে নি' দ্রুত, কেননা, স্ত্রীর আসার সময় হল, তাড়াতাড়ি লিখে আজ এই আসানসোলের loft-এ রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এখানে এই আসানসোলে, আমাদের ফ্ল্যাটে, যথার্থই loft ছিল।

লিখি যে, ১৯৮০-তে আনন্দময়ীর কলকাতায় ইংলিশ ইনস্টিটিউটে ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং নেবার সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঐ মুক্তাঙ্গনের পাশে ইনস্টিটিউট অব ইংলিশে। লাইব্রেরীতে ছিলেন তিনি। কথা-কথান্তরের পর জানালেন, এই দ্যাখ তোর আন্ডারগ্রাউন্ড, এক ঢাউস ডিকশনারী খুলে পড়তে দিলেন, দেখলাম লেখা : below the surface, hidden, secret, not public, avoiding notice, *a secret system by which slaves were enabled to escape to the free states and Canada,...* below the earth, in a hidden or obscure manner.

তো ঐ আমার আন্ডারগ্রাউন্ড। অবসকিওর, রিয়ালি অবসকিওর। এবং আমার সিক্রেট সিসটেমও। যে সিসটেমে আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পালাই, কিন্তু ইতিহাসের মতো ফ্রি-স্টেট কোথাও পাই না।

আনন্দময়ী ১৯৮১ সালে আমার সঙ্গে শেষ যোগাযোগ করেন। যে বছর এক ক্যাম্পে তিনি শিলিগুড়ি যান। ঐ মাধ্যমিকের ইংরেজি নতুন সিলেবাসের তালিম দিতে যে ক্যাম্প শিলিগুড়িতে হয়, তখন আমি মামাবাড়িতে, ঐ ১৯৮১ সালে, মামার ছোটছেলের বিয়েতে। সেখানে দেখা। আনন্দময়ী বল্লেন, তোর উচিত ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গে আন্ডারওয়ারলডের সম্পর্ক খোঁজা। তুই সেই কোচবিহারে যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলি তখন যা করেছিলি আমাকে নিয়ে তাকে কি কেবল আন্ডারগ্রাউন্ড বলে? তাকে আন্ডারওয়ারলড বলে।

বলতে কি, আমি এই ডাইরীতে অনেকবার ভুলে আন্ডারগ্রাউন্ড লিখতে আন্ডারওয়ারলড লিখেছি। ঐ ওয়ারলড ও গ্রাউন্ড তো আইডেনটিক্যাল। কী, তাই না?

আনন্দময়ী বল্লেন, খেয়াল রাখিস, আন্ডারওয়ালড হল : The Sublunary or Terrestrial world, the abode of dead, the nether world, a sphere or region beyond the world, lying below the ordinary one. ঐ Sublunary-র অর্থ ?—অর্থ হল Subject to the moon's influence, চন্দ্রাহত হওয়া যাকে বলে, আর terrestrial শব্দের অর্থ হল opposite to heaven.

জানার পর আমার আর একটা কথাই লেখার থাকে—বাবা লোকনাথের কৃপা ছাড়া এ জানা সম্ভব না, এ লেখাও সম্ভব না। কেননা তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। এই বাবা লোকনাথও এক আন্ডার-গ্রাউন্ড অথবা আন্ডারওয়ারলড।

কিন্তু সে কথা পরে। তার আগে লিখি যে, ইনি অর্থাৎ এই বাবা লোকনাথ, আমার মা আনন্দময়ীর বাবা। আমার দুঃখ দুর্দশার দিনে, আমার দুঃসময়ে, যখন আমার সন্ধ্যা আসত মন্দ মন্থরে, যখন আমার সব সংগীত ইংগিতে থেমে যেত, সেই ১৯৭৫ থেকে, জরুরী অবস্থার কালে, প্রথম, মা আনন্দময়ী, আমাকে একটা পকেট ফোটোকার্ড দেন।

যেখানে বাবা লোকনাথ আছেন। গোমুখ আসনে বসে। তলায় সেই বরাভয় : রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে যেখানেই বিপদে পড়িবে/আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব।

মা আনন্দময়ী বাবা লোকনাথকে পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। তাঁর স্বামীর মাতুলালয় বারোদীর নাগ হওয়ায়, সেই সূত্রে, বাবা লোকনাথ এসেছেন ঐ স্বামীর কাছে। এবং কথিত যে, ঐ ফোটো, ঐ নাগ মহাশয়ের ব্যবস্থাক্রমে তোলা ফোটোর কপি। সে অনেক-অনেকদিন আগের কথা। মানুষ তখন রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে আজকের মতো এতটা বিপদে পড়ত না। তাই, আজকের মতো স্মরণ হত না তাঁর। তাঁর অলৌকিক জীবিত জীবনে তিনি, বস্তুত যত না রক্ষা করেছেন জনমানুষকে, তার চেয়ে এখন, অনেক-অনেক বেশি রক্ষা করতে হয় তাঁকে। কার্যত এত রক্ষাকার্যে এখন তিনি এমত ব্যাপৃত যে, তাঁর দেহরক্ষার আগে, তিনি বলা যায়, এর কানাকড়িও রক্ষা করেননি। এখন তাঁকে প্রতিদিন, ১ লক্ষ ছিয়াশি হাজার স্মরণের মধ্যে ৯৩০০০ স্মরণে সাড়া দিতে হয়। অর্থাৎ ১,৮৬,০০০ স্মরণের মধ্যে ৯৩,০০০ স্মরণ, রিয়ালি রক্ষা পায়।

এখন আমিই বা প্রতিদিন ঐ ৯৩০০০ ভাগ্যবানের মধ্যে পড়ব না কেন ? এতে যদি প্রমাণ হয় আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী তাহলে এও প্রমাণ হয় যে আমি আত্ম-প্রতারক। চৈতন্যের কাছে, অবদমিত কামনার কাছে, স্বপ্নের কাছে, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার কাছে, কল্পনার কাছে, আমি কি আত্মপ্রসারিত নই ? আমি কি আত্মপ্রতারক ?

চৈতন্যের কাছে, অন্তত স্বপ্নের কাছে প্রতারণা করা যায় না। সিগমুন্ড ফ্রয়েড কবেই এ কথা প্রমাণ করে গেছেন। অতএব লিখি যে, আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই, আমি বাবা লোকনাথকে স্মরণ করি। অবশ্য ঐ যে রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে—এখানে আমাকে 'রণে', ঐ ১৯৭৫-এ কয়েকমাস, মানে করতে হয়েছিল শ্রেণীসংগ্রামের তথা রণাঙ্গণের 'রণ', আর এখন সব ধুয়ে মুছে, এখন আমি 'রণ' বলতে বুঝি সংসার অঙ্গনের সেই দিল্লীকা লাড্ডু, অর্থাৎ স্ট্রাগল, স্ট্রাগল ফর সুপ্রিমেসি, স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, বস্তুত যা স্ট্রাগল ফর একজিসটেনস।

লিখি যে, আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদা-মাকেও স্মরণ করি। স্মরণ করি মানুষকে। কিন্তু আদ্যামাকে পারি না, দেবাদিদেব মহাদেবকে পারি না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পারি না—পারি লোকনাথ বাবাকে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে, সারদা-মাকে, স্বামীজীকে, স্বামীজীকে, স্বামীজীকে।

বিবেকানন্দকে বাল্যকালে স্মরণ করতাম খুব। যখন স্বপ্নদোষ হত আমার, তখন বীর্য রক্ষার্থে বিবেকানন্দকে স্মরণ করতাম।

স্মরণ তো মানুষকেই।

কিন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করব কি করে ? যখন কবেই জানিয়ে গেছেন অ্যারিস্টটল, He has no eyes, no ears, ইত্যাদি। কোলরিজ সূর্যাস্তের সূর্যকে যতই বলুন like God's own head—ঈশ্বরের মাথা নেই, He has no head অ্যারিস্টটল স্পষ্টতঃ বলে গেছেন।

নিজেও বুঝি তো, জীবনের উৎস সন্ধানে এগিয়ে। চৈতন্যের জগৎ কেবল আমাদের এই স্নেহের সবুজগ্রহের জীবপ্রবাহে। আমাদের সৌরপরিবারে আর কারুর প্রবাহে চৈতন্য নেই বলেই জানি। সবার আগের কথা বড় অন্ধকারে। সেখানে কেবল, চারিদিকে, নীল সাগর দেখি। অচৈতন্যের সমুদ্র। তারও, তারও আগেকার কথা (আসলে অনাদির তো আগের কথা নেই—সে যে অনাদি) বড় আগ্নেয়। সূর্যই যদি আমাদের পেরেন্ট সান হন, অথবা আদি পিতা, তো সেই সূর্যের তো চৈতন্য নেই। যদিও, কেউ তাঁকে না বলতে তিনি এসে যান পাংচুয়ালি পূবের আকাশে, পূবের হাওয়ায়। এবং এই যে এসে যান, বা এই যে সূর্যোদয়, এ সব কথাও কিন্তু সঠিক নয়। এতই অচেতন এই সূর্য যে, এঁর উদয়-অস্ত বলে কিছু নেই। সূর্য কেবল ঘোরাচ্ছেন আমাদের। না ঘুরিয়ে পারছেন না বলে অবশ্য নিজেও ঘুরছেন। বড়ই আন-কনসাস তাঁর এই ঘূর্ণি। তাঁর হিলিয়াম, তাঁর হাইড্রোজেন, পুনরায় তাঁর হিলিয়াম অচেতন পদার্থ। ওঃ, কী উত্তাপ এই অচেতন ক্রিয়া-কর্মের!

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে। অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়, আর তার প্রতিবিম্ব যদি হয় মানবহৃদয়—তাহলে অমাময়ী নিশি ও মানবহৃদয় যাত্রাকালে প্রতিবিম্ব—সমান্তরাল হলেও, দেখেছি ভোরের বেলা জেগে উঠে ঐ অমা ও আমি আইডেনটিক্যাল—অতএব হে ঈশ্বর, তোমাকে যে ভাবেই ভাবি না কেন, তুমি সেই অচেতনই থেকে যাও, তুমি পাষাণ, তুমি অগ্নি, তুমি বধির, তুমি অন্ধ, তুমি রূপাতীত, তাই তোমার রূপ নেই, তুমি গুণাতীত, তাই নির্গুণ, তুমি অচেতন, তাই নির্বেদ।

তবু তোমার মহিমার অন্ত নেই। কেননা আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে যুগে যুগে এসেছি চলিয়া, স্খলিয়া, স্খলিয়া; রূপ হতে রূপে। কিন্তু প্রাণ হতে প্রাণে কি? তুমি কি প্রাণ? তবু সে তোমারই দান। গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

'জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়। অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরো পরিসীমা আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।'

'মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে মানসের বিশ্বও বাস্তব। যত বেশী স্পষ্ট করে মানসনেত্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি, ঠিক তত স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানসনেত্রের দেখা দৃশ্যই এ বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়, সেই হেতু এ-অঘ্রান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।'

সেইজন্যই তো লিখছি, লিখতে পারছি এ অঘ্রানে। আরও লিখি যে, 'পৃথিবী, ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে, আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেত বেশ।'

'আমার ব্যথা, প্রস্তাব, প্রয়াস, তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো। তার মানে মানুষের,

বস্তুদের প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে…'

যদি সেভাবে ভাবা যায়, তাহলে, এই যে আমি লিখে যাচ্ছি, নিজের কথা, একি বাস্তবিক নিজের কথা ? যে কথাগুলোর উল্লেখে এই কথা, সেই কথাগুলো কিন্তু নিজের কথা নয়, সবই বিনয় মজুমদারের কথা। এবং এ বড় আশ্চর্য যে, কথাগুলো আমার নিজেরই। বল্লে বিশ্বাস যাবেন না, বিনয় মজুমদারের সিনট্যাক্স, আমারো সিনট্যাক্স। তেমন জীবনানন্দও, অর্থাৎ জীবনানন্দের, না সিনট্যাক্স নয়, জীবনানন্দের স্ট্রিম অব কনসাসনেস, আমারো স্ট্রিম অব কনসাসনেস। চেতনার ভাষা এক।

এই বেলা এই কথা সেরে রাখা ভালো যে, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব প্রায়শই আমাকে বলেন, তুমি বিনয় মজুমদারের মতো কথা বল, বেশি বোলো না, পাগল হয়ে যাবে। সত্যিই কি তাই ? সত্যিই কি জয়, ওগো জয় গোস্বামী, বিনয় মজুমদার পাগল ? তুমি তো জানো ভালো, বিনয় বেড়ে শুয়ে আছে, জানিনা সে ঐখানে শুয়ে আছে কিনা ! বিনয় চলে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া ? পাখিদের মতো পাখা বিনা ?

জয়, জয় গোস্বামী, তুমি যদি এ লেখার পাঠক হও কখনো তাহলে নিশ্চয় তোমার খেয়াল হবে তুমি যেমন আমাকে চেনো না আমিও তেমনি তোমাকে চিনি না— তোমাকে পড়েছি মাত্র উন্মাদের পাঠক্রমে। দিনপঞ্জী লিখছি বটে কিন্তু জীবনানন্দ বিনয় জয় কারুর সাথেই আমার কোনো পরিচয় নেই। এই দিনপঞ্জী একবার শুরু হয়েছিল ১৯৫১-তে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। কেটে গেল কলেজে ভর্তি হয়ে। আরেকবার শুরু হল গাঢ় বেদনায়। ১৯৫৮-তে। যখন আমার স্ত্রীর লাইফ-স্টাইল আর আমার লাইফ-স্টাইলে বনিবনা হল না। আবার কেটে গেল ১৯৬২-তে। যখন চীন-ভারত কলহ শুরু হল। ওঃ, বিশ্বাস করো জয়, ঐ চুলোচুলি আমাদেরও হয়েছে স্বামী-স্ত্রীতে। ঠিক ঐরকম। একেবারে ঐরকম। কানে বাজে কেবল ঐ হিন্দী-চীনী ভাই ভাই অথবা 'যদিদং হৃদয়ং তব…' ইত্যাদি ; আর তৎকালে ঐ চীন-ভারত কলহে শক্তি-সুনীলদের কি অমানুষিক কলহপ্রিয় ক্রোধ : দু-একটা মনে আছে আজো— 'আমরা এমন হিংস্রভাবে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়াবো/যেরকম ভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি / কেননা পৃথিবীর এই অত্যুজ্জ্বল সময়ে / তোমরা জানোয়ারের মত / মানুষের আত্মা ও অস্তিত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছ।' …জানো জয়, ঠিক আমার মার মতো, ঐ ১৯৬২-তে উনিও, আমাদের প্রথম দাম্পত্য-কলহে ঐরকম কুম্ভীরাশ্রু ছেড়েছিলেন, আসলে খুশি হয়েছিলেন আমার মা, খুশি হয়েছিলেন আমাদের দাম্পত্য-কলহে। যেমন খুশি হয়েছিল ওরা। ওরা যারা চীন-ভারত মৈত্রীকে ভালো চোখে দেখেনি। ভাবলে বুক ফাঁকা হয়ে যায়, শক্তি-সুনীল অপেক্ষা করল না, 'বরং অপেক্ষা কর যখন যন্ত্রণা', রাম বসুর কাছে একথা শুনেও অপেক্ষা করল না, ঘটনা ঘটবার আগেই লিখে ফেল্ল, 'আমরা সাপের মতো নোংরা ও অবিশ্বাসপ্রধান তোমাদের কাঁধে হাত রেখে/দেখব না তুষার।'

আহারে, চীন, জয়, শোনো, কি লিখেছিলেন তোমার অগ্রজ—লিখেছিলেন, 'তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই / কামনা করব / আমরা ভালোবাসতে পারবো না তোমাদের দেশের / কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ।'

ভাবা যায় জয়, তুমি কাদের ভাই, ভাবা যায়? এত কথা লেখার দরকার ছিলনা। যদি না ঐ ও'দের তুল্য কথা আমার মাও সে সময় না বলতেন। 'তোর ঐ সন্তান যখন আসে আসুক, তাকে কোলে নিতে পারব না।'

ঐ ১৯৬২-তে আমার স্ত্রী মায়ের ব্যথা পেয়েছিল কিন্তু ছেলে পায়নি কোলে। অ্যাবোরশন হয়ে গেল পাঁচমাসের আগেই। মায়ের আর পঞ্চামৃত দেয়া হল না। ক্রমক্রন্দনে আমি যখন দুঃসহ টানে কষ্ট পাচ্ছি, তখন মা আমার, আমার বুকে-পিঠে পান-তেল মালিশ করতে করতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'সন্তান গেলে, সন্তান আসে।' কথাটা ছিল, বৌ মরলে বৌ হয়। কিং ইজ ডেড, লং লিভ দা কিং। অর্থাৎ আমরা ভালবাসতে পারব না তোমাদের দেশের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ। এবং তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই কামনা করব।

জয়, যে কারণে তোমাকে স্মরণ, সে কথা লিখি। লিখি যে, তুমি লিখেছিলে, ১৯৮৪-৮৫'র কোনো এক সময়ে, যখন আমার স্ত্রীর ভিতর থেকে ইউটেরাস খুলে নেয়া হল। সেই রক্তাক্ত তথা পৌরুষ দিনে, লিখলে তুমি, শিক্ষা নাও, শিক্ষা এই উন্মাদের পাঠক্রম/ খুলে দিলাম আজ থেকে / ছাত্রদের সংখ্যা কম / খাদ্যহীন মাংসভুক সূক্ষ্ম কাজ কামড়ে খাও। / এই দিলাম অন্ধকার চিৎকারের মাংসহাড় / উন্মাদের মাংসহাড় খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ / নাকের জল চোখের জল, মাতৃবুক ভগ্নীবুক / খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ জ্বলছে ভোগ ভোগজ্বালা / রোগ নিভুক।

হ্যাঁ রোগ নিভুক।

এই যে জয়, তোমার সঙ্গে কথা—এতো তুমি ভালই জানো, তোমার সঙ্গে বাস্তবিক কোনো কথা হয়নি—বিনয়ের সঙ্গেও কদাচ না—আর জীবনানন্দ, তিনি ছিলেন দূর অস্ত—এ দাস রহুঁ দূর। তবু ভাব-ভাবনা এমন, যেন সব ভাই-ভাই, সহোদর। হ্যাঁ, সহোদর। সবাইকে জানাই ইত্যবসরে, চিৎপ্রবাহের ল্যাংগুয়েজ সবারই এক—তা সে কাফকাই হোক, অথবা ডস্টয়ভস্কি, কিংবা জীবনানন্দ-বিনয়-জয় অথবা আমি। এই আমি এবং সব্বাইকে জানাই আরো, দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম লেখা।

বলা বাহুল্য, বাক্যটি বিনয় মজুমদারের। তবু লিখি যে, দিনপঞ্জী, ডাইরী, মানুষের মনের নিকটতম লেখা। এবং বাক্যটি আমার। একান্ত আমারই।

ঐ মনের নিকটতম কথা লিখতে গিয়ে, মনে আছে ভালো, আমি সেই 'কার', 'loft', upper chamber তথা underground-এ, আমি, প্রথম সহবাস করেছিলাম, লিখেছিলাম।

কথাটা লিখতে তখন আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। তবু লিখেছি। এখন ভাবতে বুক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমার কেননা, ঐ সহবাসের কথা দিয়েই প্র্যাকটিক্যালি আমার লেখা শুরু।

গভীর ভাবে ভাবলে বুঝতে পারি, যেহেতু এই লেখা মনের নিকটতম লেখা, তাই ঐ বাক্যই আসে আদিতে। এখন তো জেনেই গেছি, প্রকৃতির ভিতরকার কথা হল ঐ সহবাস। যে জন্য ঐ কুসুমে, ফুলে বর্ণ, সুগন্ধ, এবং প্রজাপতির আকর্ষণ। তার মানে ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে যায় বাবু প্রজাপতি। স্পষ্ট যেন শুনি কোনো বাবু প্রজা-পতি অন্য কোনো বাবু প্রজাপতিকে বলছেন, পাড়ায় (ফুলপাড়ায়) গিয়ে দেখে এলেম একটি ডাগর কালো মেয়ে (কালো গোলাপ)। এই চলছে ফুল বাগানে। প্রকৃতির রেড লাইট এরিয়া। এইমাত্র মনে পড়ে গেল কালো গোলাপের কথা। সেই আমার মতো আউটসাইডার কামু যেমন দেখেছেন, মাকে কবর দিয়ে এক ছুটে চলে এসেছি বান্ধবীর কাছে, সহস্নান হল খুব, বেলাভূমিতে ভ্রমণ যথেচ্ছ হল, এক আরবকে গুলি করে মারলাম কারণ জানিনা, পরক্ষণই পূর্বদৃশ্যের সেই অন্ধকার ঘর, রাশি রাশি কালো গোলাপ। আমি যে আউটসাইডার, আমি যে এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে, প্রকৃতি আমার চারপাশে রাশি রাশি কালো গোলাপ ফোটালেন, যেন শক্তির সেই 'সারঙ্গ, যদি ঝর্ণা ফোটাই', তেমন কালো গোলাপ ফোটালাম।

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে বস্তুত রাশি রাশি কালো গোলাপই থাকে, বিশ্বাস করুন, অন্ধকার থাকে না।

তাই সহবাস যে প্রকৃতিরই মনের কথা, টের পেয়ে আমি যে সারাদিন সারারাত, কারণে অকারণে, যখন-তখন, যত্রতত্র, ঐ সহবাসের কথা ভাবি—এ আমার প্রাকৃতিক কর্ম, আমার প্রাত্যহিকী। প্রকৃতি আমাকে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড দিয়ে, তদুপরি পুংলিঙ্গ করে, আমাকে কেবল সহবাসের কথা ভাবাচ্ছেন। কার্যত এটা আমার ডেস্টিনি। এতেই বস্তুত আমার কপাল পোড়ে।

লিখি যে, সহবাসে যে প্রবৃত্তির কাঁধে হাত রাখা আছে, তা কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক না। প্রকৃতি, ঐ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন, কিন্তু যেইমাত্র তিনি প্রবহমান হলেন অর্থাৎ শিশু ঘরে এলো, ঘর আলো করে শিশু ঘরে এলো—অমনি প্রকৃতি সহবাস থেকে প্রবৃত্তি কেড়ে নিতে পা বাড়ান। প্রবৃত্তি পুরো, কেউ কাড়তে পারে না। ওটা স্বভাবের অন্তর্গত। তবু প্রকৃতি মধ্যবর্তে শিশু রেখে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। মানুষজনের ভিতর, পশুপাখির প্রজাতিদের ভিতর যে যেমন পারে প্রবৃত্তিকে সহবাসের উপর মাতব্বরি করতে দেয় না। কেননা শিশুর কান্না আছে, হাসি আছে, অস্তিত্ব আছে, সে সমাজকে তার চারপাশে জড় করছে—এ-সবে প্রবৃত্তি কিছু বিনয়ী হয়, আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়, সামাজিক হয়। প্রবৃত্তি সামাজিক হলেই তা বৈপ্লবিক। সুখানুদানী। বায়োলজিকাল।

Mind is never without thought....সব চিন্তা পারি কে লিখতে?

লিখি, বাবা লোকনাথের জীবনী পড়িয়েছিলেন ঐ মা আনন্দময়ী। তাতে লেখা, আজন্ম ব্রহ্মচারী লোকনাথ ফিরে এলেন জন্মভূমি দর্শন করতে। এখানে জগজ্জননী মহামায়া এক মায়াজাল বিস্তার করলেন লোকনাথের জ্ঞানের দীপশিখাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে। তিনি এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী।

লোকনাথ ও বেনীমাধব অনেকদিন পর গ্রামে ফিরে আসায় এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় গ্রামে। গ্রামবাসীরা সাধ্যমতো সন্ন্যাসীদের সেবা-যত্নের জন্য এগিয়ে আসেন।
এঁদের মধ্যে লোকনাথের বাল্যকালের সাথী ছিলেন এক বাল্যবিধবা। তিনিও এলেন নিষ্পাপ মনে সাধু সেবার জন্য। গুরুদেবের আদেশে এই মহিলা লোকনাথের সেবার ভার নিলেন। আন্তরিক সেবা-যত্নের মাধ্যমে এই সেবিকাটি লোকনাথের হৃদয়ে নিজের আসন স্থাপন করে নেন। মহামায়ার মায়ায় উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়েন।
কিসের যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চলচিত্ত হয়ে পড়েন তাপস লোকনাথ। ধ্যান সমাধিতে মনঃসংযোগ করতে পারেন না। নিজেকে সমর্পণ করেন মেয়েটার বাহুবন্ধনে। অনাস্বাদিত ইন্দ্রিয় সুখের আনন্দে যেন হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া তরীর মতোই তিনি ভেসে যান। **যেন তরী সেই সাগরে ভাসান, যাহার কূল তিনি নাহি জানেন।** গুরুদেব সবই দেখেন, সবই বোঝেন, কিছুই বলেন না। তাঁর অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন তিনি মৌন সম্মতি জানাচ্ছেন। লোকনাথ ধ্যানাসনে বসে চঞ্চল হয়ে উঠলে গুরুদেব বলতেন— বৃথা সময় নষ্ট করে কেন মনকে কষ্ট দিচ্ছ লোকনাথ। মন যা চায়, তাই কর। জানবে এটাও সেই মহামায়ার লীলা। তোমার জীবনটাই যে যোগময়। **'কোন কিছুই বাদ দিতে পার না—পারবে না। সকলের মধ্য দিয়েই তুমি লক্ষ্যস্থানে পেঁছাবে।'**
বাবা লোকনাথ লক্ষ্যস্থানে পেঁছেছিলেন। গোমুখো আসনে বসে, তিনিই একমাত্র সাধক, গোমুখো আসনে বসে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছিলেন। তাঁর ভাবশিষ্যরা তাঁর কার্বনকপি হতে পারেনি। হায় রে লোকনাথ মিশন! হায়রে লোকনাথ সংঘ!
আমার মা আনন্দময়ীকে ঐ লোকনাথ বাবার জীবনী পড়ে বলেছিলাম, আদ্যন্ত বার্নার্ড শ' তোমার বাবা। শ'ও বলতেন, Never resist temptation, hold first that which is good.

তো, আমিও বলেছিলাম আমার মা আনন্দময়ীকে ঐ 'কারে', 'loft' এ, আমার underground এ, কার্যত upper chamber এ, 'আমি যে পারছি না আর। শরীরের ঘ্রাণ-সুবাস, স্বাস্থ্য-সুস্থতা তো ঐ জামাকাপড়ের তলায়, গাত্রহরিদ্রায়।...'
তখন ১৯৫০, কেবল ক্লাস টেনে পড়ি, উনি তখন টিচার। আমার তখন ১৪, ওনার ২৪। ওঁর চোখদুটো আশ্চর্য কালো গোরুর মত। শান্ত, বিষণ্ণ। রোগাই ছিলেন তখন। বয়স দেখাতো আরও বেশি। চুল ছিল খুব। পরন্তু গালে টোল পড়ত।
কারে উঠছি, বাড়িতে কেউ নেই প্রায়, পিশিমারা রান্নাঘরে, স্নানান্তে ঢুকেছেন, রান্না শেষ করে, ওখানেই, ঐ নিরামিষ রান্নাঘরের মেঝেতে, বসে, খাবেন। ঠাকুমাও আছেন, তিনি কেবল তরকারী কোটেন। তারপর কমিউনিটি লাঞ্চ।

আমি একা ঘরে, উঠছি কারে। মাঝামাঝি উঠেছি এমন সময় উনি,—সেকিরে, কোথায় উঠছিস, পড়ে যাবি তো? কি আছেরে, ওখানে? তখন তো উনি আমার আনন্দময়ী না, তখনো উনি আনন্দ দেননি। তাছাড়া তখনো তাঁর কাছে কনফেস করিনি আমার বেদনার কথা। তখন কি করে বলা যায়, আমি 'কারে' উঠছি, আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে

রাখা একটি ম্যাগাজিন দেখতে, গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফের ম্যাগাজিন। বুগাদা দিয়েছিলেন। এই বুগাদার কথা কোনো একসময় লিখব। কেননা বুগাদা আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে সাহায্য করেছিলেন খুব। বুগাদার নিজেরও আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। কিন্তু সে কথা পরে। মোটকথা হল, ঐ গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফিতে অনেক আশ্চর্য নুড ছবি আছে। আঃ, কি করে লিখি যে, আমার ক্রনিক রোগ, এপিলেপ্সির অ্যাটাকে যখন আমি মুহ্যমান হই, তখন, তারপর কনভালসন কেটে গেলে ঐ নুড ছবি দেখলে আমার যেন স্বাস্থ্য ফিরে আসে। কেন তা, কি করে বলব! কেবল এ'কথা লিখতে কেমন, কষ্ট হয় আমার। খুব কষ্ট হয়। একথা লিখতে বড় কষ্ট হয়। এইসব লিখে, আমি কি আলাদা? কেবল আমারই কি এমন লেখা হয়? আমারই কি মুদ্রাদোষে আমি এমন হতেছি আলাদা? এ ভেবে, এ-সব লিখতে বড় কষ্ট আমার। তবু, সেই কথা বারবার লিখি। লিখি যে, দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম লেখা। এছাড়া আমি মনের নিকটতম কথা কোথায় আর লিখব? আমার জীবনের সব গোপনতা, কেউ না কেউ টের পেয়েছেন, ধরা পড়ে গেছি কতবার, কত কারুর কাছে। কেবল আজ পর্যন্ত এই দিন-পঞ্জীর খবর কেউ জানে না। ধরা পড়িনি এখানে। এখানেও কি বাবা লোকনাথের কৃপা?

মা আনন্দময়ী জানিয়েছেন, বাবা লোকনাথের কৃপা তুই পাবি। তবু ঐ মা আনন্দ-ময়ীকেও বলতে পারিনি, এই দিনপঞ্জীর কথা।

তো সেদিন হল কী, ঐ যে 'কারে' উঠছি সিঁড়ি বেয়ে; মাঝামাঝি পৌঁছেচি কি পৌঁছাই-নি এমন সময় উনি। কি আছে রে, ওখানে?

—সোকিরে, কোথায় উঠছিস, পড়ে যাবি তো। কি ব্যাপার রে, —তোর? ওখানে কি?

—কিছু না। এমনি।

—এমনি উঠছিস?

—হ্যাঁ, এমনি। ওখানে উঠে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে আমার।

—তাহলে আমিও উঠব।

—না, তুমি না।

—কেন? কেন না?

—না, ওখানে আমি একাই থাকব। থাকি তাই।

—কি তোর গোপন আছে ঐখানে?

—কিছু না।

—বেশ তো, কিছু না-ই দেখব আমি।

উনি সিঁড়িতে পা দিলেন।

—উঠছ যখন আগেই বলি, এই কথা আর কাউকে বলতে পারবে না। কেউ যেন জানতে না পারে আর।

—বেশ তো, আমার আসা কেউ টের পায়নি। সব গেল কোথায়?

—মা-বাবা বাজারে গেছেন পুজোর কেনাকাটা করতে। আর ঠাকুমা-পিশিমা হেঁসেলে।
—তবে আর কি, তবে তো সোনায় সোহাগা।
বলতে বলতে উনি উঠতে লাগলেন। আমিও উঠে 'কারে' যাই। ওঁকে ধরতে হবে, নাহলে কারে পা দেয়া মুস্কিল। আমি কারে অবস্থান নিয়ে হাত বাড়িয়ে বসে, আর উনি উঠছেন। ওঁর ব্লাউজের ভিতর থেকে নিটোল স্বাস্থ্যবান বুক দেখা যাচ্ছে। ঐ এক আমার এক ডেস্টিনি যে—বুক দেখতে পেয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। কেবল মার বুক দেখতে পারি না। চোখ সরিয়ে নিতে হয়। মা আমাকে দুধ ছাড়াতে, এক বছরও হয়নি আমার, বাবার নির্দেশে কুইনাইন মেখেছিলেন তাঁর দুধের বাঁটে। সেকি ভুলবার! আমি মরে যাব, তবু ভুলব না ঐ কুইনাইন।
হাত ধরলাম ওঁর। প্রায় টেনে তুলতে হল। টালমাটাল হলাম। কারের উপর আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম কারে, আর ঝোঁকের মাথায় উনিও পড়ে গেলেন আমার উপরে। সহজে উনি উঠতে পারলেন না। হাঁফাতে লাগলেন। কতক্ষণ কে জানে! একসময় বুঝি, আমার বুকের উপর ওঁর বুক ওঠা-নামা করছে। কী আশ্চর্য মখমল স্পর্শ! যেন দুধে আর্দ্র। একবার এ পৃথিবী পায় তারে, পায় নাকো আর। উনি কাত হয়ে নিজেকে সামলালেন। তবু শুয়ে, উঠতে পারলেন না। শাড়ি উঠে গেছে হাঁটু ছাড়িয়ে। হাতির দাঁতের মতো মসৃণ সাদা দুটি পা। ঐ শরীরে এতদিন ছিল ঐ পা, আমি বুঝতেই পারিনি, যদিও দেখেছি কতবার ওঁর কাঁধ, বুক, পায়ের পাতা, হাতের কনুই, গলা, গলার নিচে, কখনো-সখনো, ব্লাউজের কাটে, ওঁর বুকের উপরিভাগ—বুকের নিটোল স্বাস্থ্যবান খাঁজ। কতবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়েছে। পারিনি। কতবার এপিলেপ্সির অ্যাটাকের পর গার্ডিনাল ট্যাবলেট খেয়ে কালঘুম ঘুমিয়ে, কতবার ওঁকে দেখতে পেয়েছি, ওঁর ঐ বুকের উপরিভাগ, কতবার; কতবার আমার আরোগ্যস্নান হয়েছে। ঐ সময় বিস্মৃতি ঘটত আমার। কিছু মনে রাখতে পারতাম না, তার আগে, যা করেছি। এমনকি পেটভরে ভাত খাওয়া অব্দি মনে থাকত না। কতবার ঐ অ্যাটাকের পর, সামান্য ঘুমিয়ে, উঠে, মার কাছে ভাত চেয়েছি। মা কেঁদেছে। —এই তো ভাত খেলি বাপ্, এই তো পেটভরে খেলি, হায়, আমার ছেলের একি হল?
মরাকান্না জুড়েছেন, আমি তখন ভেবে পাইনি, কেন এই কান্না। খাইনি ভাত, তবু কেন বলছেন, খেয়েছি নাকি পেট ভরে। কৈ, মনে পড়ে না তো! মনে পড়লে, আমারও বুক ফাঁকা হয়ে যেত। খুব তাড়াতাড়ি মনে পড়ত, যদি ওঁকে দেখতাম। কেমন আরোগ্যলাভ হত নিমেষে।
তেমনি।
তেমনি আরোগ্যলাভ হয়েছিল, সেদিন, ঐ 'কারে' উনি উঠে বসে কথা বলতেই আমি ওঁর ঠোঁটে আঙুল রেখে ইংগিত করলাম, চুপ।
তো চুপ।

উনি চুপচাপ দেখতে লাগলেন কার। কাঠের বাক্স ছিল সামনেই। দেখলেন। দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়ে কাঠের বাক্স ঘাঁটতে লাগলেন।
যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই হল, ঐ নুড ম্যাগাজিন দেখে ফেল্লেন।
ফিসফিস করে বল্লেন, ও এই ব্যাপার।
আমি ওঁর হাত চেপে ধরে ম্যাগাজিন কেড়ে নি'। উনি ছাড়েন না। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে, কেন এ-সব ছাইপাশ দেখিস, এই বয়সে, গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তোর এখন থেকেই অসভ্যতা। ফের যদি এ-সব দেখিস তো বলে দেব তোর মাকে।
—না, লক্ষ্মীটি, বোলো না। বিশ্বাস করো, এ-সব দেখলে আমার শরীর ঠিক হয়ে যায়।
—সেকিরে!
তখনো ঐ কানে কানে ফিসফিস করে ঐ বিস্ময়, সেকিরে!
তারপর নিজে পাতার পর পাতা নুড দেখতে থাকেন। যেন নিজেরও শরীরে সুস্থতার ঢেউ দিচ্ছে, এভাবে, নাকের ডগা ঘামিয়ে, কপাল ঘামিয়ে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে, স্লো বাট স্টেডি হয়ে, বিলম্বিত ক্ষিপ্রতায় দেখতেই থাকেন। তখন তাঁর শাড়ী পা দেখাচ্ছে, সেখানে মসৃণতায় যেন স্নেহ এবং স্নেহ অতি বিষম বস্তু—উনি ম্যাগাজিন রেখে, আমার কাছে সরে এসে, ততোধিক কানে কানে বল্লেন, সেই অমোঘ কথা, Am I not superior to these paper nudes. তখনো কাগুজে বাঘ কথাটা শিখিনি।
আমি ওঁকে জড়িয়ে না ধরে পারি না।
—আয়, আয়, তাই যদি হয়, আয় তাহলে, আমার বুকে আয়। বাকি কেবল থাকে সেই একসট্যাসি যার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই যদিও—তবুও লজিক্যাল ডেভেলপমেন্টে আমরা ঐ 'কারে' শুয়ে পড়ি ওঁরই দৌলতে। পরস্পরের উপর শুয়ে পড়ি যাদুবলে।

আমার প্রথম সহবাসে আমি ডুবতে ডুবতে অতলে তলিয়ে যাই। ঐ প্রায়ান্ধকারে, তখন চারিদিকে, কী আশ্চর্য নীল সাগরের ডাক শুনি, অন্ধকারে নীল সাগর ডাকে, নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি। মাথার ভিতর নীলাভ আলো আমার সব সাধ-আহ্লাদকে ডেকে নিয়ে আসে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারি না। আমি মোমের মত অকালে গলে ঝরে পড়ি।
ঐ আমার কাল। আমার অকালবর্ষণ। তবু আনন্দ। এ আনন্দ যমজ আনন্দ। এখন আরেকরকম আনন্দের কথা লিখি। এতো সেই আনন্দ নয়। উনি আরও কত আনন্দ দিয়েছেন। আমাকে আমার বেদনায় এক আশ্চর্য আনন্দ দিয়েছিলেন তারপর। তারপর থেকে, ঐ সহবাসের পর থেকে উনি আমার ক্রমনৈকট্যে এলেন দিনের পর দিন। সে কথা ভুলবার নয়। —এপিলেপ্সিতে বাঁধাকপির রস খেতে হয়, ভিটামিন 'কে' (K), ঐ রসে, তোর মাথার স্নায়ুকোষের 'মাথাগরম' ঠান্ডা করে দেবে। আমি জেনেছি। নে খা, রোজ এমন খাবি, আমি এনে দেব।
আঃ, কতদিন উনি এমন বাঁধাকপির রস খাইয়েছেন আমাকে। বছর দুয়েক তো হবেই,

১৯৫৩ সালে কলকাতায় অনার্স পড়তে যাওয়া পর্যন্ত খাইয়েছেন। আমি ভালো হয়ে যাচ্ছিলাম। কেন যে ভাল হয়ে যাচ্ছিলাম, মোটেই ভাল লাগত না আমার। আমার ঐ ক্রনিক এপিলেপ্সি চলে যাবার মতো হলে, আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হতে লাগল। কেউ আমাকে ছাড়ল না, সবাই আমাকে তখন পেয়ে বসল। কেননা আমি আর 'সিক' নই, আমি ফিট। ফিট হয়ে গেলে কে ছাড়ে মানুষকে ?

কেউ না, আমার মাও আমাকে ছাড়লেন না।

এই মা নিয়েই আমার বেদনা।

মারও বেদনা কম ছিল না। বিয়ে হয়ে আসাতক মা আমার ঐ দুই পিশিমার খপ্পরে। ঠাকুমা ছিলেন অপূর্ব উদাসীন। তাঁর নামও ছিল অপূর্বসুন্দরী। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। আমি দ্বিতীয় দেখিনি আজও।

এক পিশিমা বালবিধবা। ১১তে বিয়ে, ১২তে বিধবা। স্বামী মারা যাবার পর তার পিরিয়ড শুরু হয়। প্রথম পিরিয়ড থেকেই উনি কোল্ড। কিন্তু রাগে অগ্নি-শর্মা। মা-বাবার অভ্যাস ছিল দেরি করে ওঠার। পিশিমা সহ্য করতে পারতেন না মার ঐ দেরি করে ওঠা। —এক জ্যোৎস্না (চন্দ্র) চলে গিয়ে আরেক জ্যোৎস্না (সৌররোদ) আসার আগেই যদি ঘুম থেকে না উঠতাম, তখন ঐ ১১/১২ বয়সে, শাশুড়ি একদিন সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে ব্যথা দিয়েছিলেন। আমি তো তবু সাঁড়াশি হাতে করিনি।

তাতেই যথেষ্ট। সাঁড়াশি অভিযান তাতেই সার্থক। বিনা সাঁড়াশিতে।

ঐ মা, ছোটবেলায়, ঐ পিশিমার কাছে আমার শোবার দৌলতে, আমাকে মোটে দেখতে পারতেন না। পিশিমা একদিন রহস্যভেদ করে আমাকে কানে-কানে জানিয়েছিলেন, ও তো তোর সৎমা।

শুনে, বেদনায় হায়, ভরে গিয়েছে পেয়ালা।

যদি, দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গলালোক, তবে তাই হোক।

আমি মাথা ঠুকে কত হিসেব করেছি, বলবার নয় আমার জন্ম তারিখ বাবার খাতায় লেখা, স্বচক্ষে দেখেছি, ১৯৩৫, ২৭ ফেব্রুয়ারী। আর পিশিমা বলেছেন, এই মা-বাবার বিয়ে হয়, ১৯৩৬, ৩০ ডিসেম্বর।

—৩০ ডিসেম্বর মানে জানিস ? পৌষ মাসের মাঝামাঝি। ও সময় হিন্দুদের অন্তত বিয়ে হয় না। ও তোর পিশিমার তোর কানে বিষ ঢালা।

—কিন্তু, মা কেন, আমাকে, দুধ দিলেন না আর ? কুইনাইন মেখে দুধ ছাড়ালেন কেন ঐ ১০ মাস দশ দিনের বয়সে। এক বছরও হয়নি আমার তখন।

—আরে তখন যে তোর ভাই এসেছিল তোর মার পেটে !

—তাই বলে কুইনাইন ?

—আর অল্টারনেটিভ কি আছে ?

অল্টারনেটিভ, বিকল্প, কথাটা ঐ প্রথম শুনি এবং তখন থেকে ঐ বিকল্পের বেনোজলে ভেসে যাই।

—তোর ঐ দুধ খাবার এত সখ? আগে বলিসনি কেন? রোজ তোকে দুধ খাওয়াবো আমি—তাহলে হবে তো?

—ঐ গোরুর দুধ? না, আমি গোরুর দুধ খাব না, ও তো একই হল, বাছুরের মুখ থেকে বাঁট টেনে—দুধ দোয়া হল—না, ও দুধ খাব না।

—তবে কি আমার দুধ খাবি? আমার যদি দুধ থাকত, ঠিক খাওয়াতাম তোকে?

—তোমার বুক আছে অমন সুন্দর, আর দুধ নেই বলছ?

—আরে, দুধ আসে নাকি ছেলেপুলে না হলে?

—বেশ তো, আমাকে তুমি ছেলে কর, মা হও তুমি।

—পাগল ছেলে!

বড় আদরে বুকে নিয়ে, নে খা, পারিস তো, টেনে নে।

স্তন তার, করুণ শঙ্খের মত, দুধে আর্দ্র', এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। আমি অন্তত পাইনি। কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলাম। আনন্দ হয়েছিল খুব। তবু প্রত্যয় যায়নি। আজও যায়নি। কেননা, আমার জননী, গর্ভধারিণী বার-বার প্রমাণ করেছেন তিনি সৎমা। আর আমার মা আনন্দময়ী বার-বার প্রমাণ করেছেন তিনি মা।

একদিন, যে নীল অন্ধকারে, 'কারে'ও আনন্দ হয়েছিল খুব, সেই নীল অন্ধকারে, চারিদিকে, নীল সাগরের হয়ে ডাকে, আমাকে ঐ নীল অন্ধকার, এও শুনি॥

মাকে দেখেছি অরব নীল অন্ধকারে, নীল নির্জন দুপুরে, বাবার ছাত্র গিরিনকাকুর সঙ্গে শুয়ে থাকতে। তখনো ১৯৫০।

কী করে লিখি যে, পৃথিবীর সব সহবাস দেখা যায়, ঐ সহবাস দেখা যায় না। আঃ, বুক কেবল পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। সব বেগুনী হয়ে যায়, মনে হয়, কাঁটার মুকুট পরেছি, তিনবার পড়ে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে পালাতে। মনে হয় ডানকাঁধে ক্রুশ, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ।

তখন থেকেই ক্রমে ঈশ্বরে আমার আর মতি থাকে না। ক্রমে ঐ ঈশ্বর এক মহান কল্পনা, এই কেবল টের পাই। টের পাই, আজ এই ধ্বংসমস্ত অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মত মা যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছেন, সেই কথা সময়ের মনে জানাবার আধার একজন পুরুষের নির্জন শরীরে একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোক-বর্ষ ঘিরে॥

অর্থাৎ বস্তুত, অন্ধকার নেই। চতুর্দিকে আলোকবর্ষ। হৃদয়বিহীন অপার আলোক-বর্ষ। আলোকবর্ষ অর্থাৎ বস্তুত অন্ধকার নেই॥

গিরিনকাকু যদি আমার জন্য কোনো গল্পের বই কিনে দিতেন তখন আমি তা ঐ কারে বসে কুটিকুটি করে ছিঁড়ি। সেখানে যজ্ঞের বালি রাখার কড়াই আছে। বস্তুতঃ

সেই অগ্নিদগ্ধ বালি, ভস্ম তখনো আছে। তার কদিন আগেই মহালয়া গেল। ঐদিন পিতৃতর্পণে যজ্ঞ হয়েছিল, বাবা করেছিলেন তর্পণ। বলাবাহুল্য ঠাকুরদার উদ্দেশে। ঐ যজ্ঞাবশেষ এখনো আছে কড়াইতে। ফেলে দিতে নেই। পরবর্তী যজ্ঞ পর্যন্ত থাকবে। সেখানে পুড়াতাম ঐ বই, তার এক পৃষ্ঠাতেও চোখ না বুলিয়ে। এভাবে পুড়িয়েছি, ভাবলে গা শিউরে ওঠে এখন, এভাবে পুড়িয়েছি দেব সাহিত্য কুটীরের "বিশ্ব পরিচয়", বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "শেক্সপীয়রের গল্প" (চার্লস ল্যাম্বের অনুবাদ), রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ", "গীতাঞ্জলী", বাংলা "থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স", "টাওয়ার অব লন্ডন", বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী", সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী", ত্রৈলোক্যনাথের "ডম্বরুচরিত" বিদ্যাসাগরের "ভ্রান্তিবিলাস", "শকুন্তলা", আর কত নাম করব, মানুষ হবার ঐসব গ্রন্থগুলি গিরিনকাকুর মার বুকে হাত দেয়া হাতে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, উপহার অথবা উৎকোচ, তাই পুড়িয়েছি।

এখনো বুকের ভিতর ঐ অগ্নি জ্বলে।

অথচ চতুর্দিকে, বলা বাহুল্য, নীল লবণাক্ত সাগর।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নারি !

এখন পর্যন্ত একটি কথাও আমি লুকাইনি। দেখাই যাক না, সত্য কথা বলতে বলতে, সত্যের নির্মম কোমল, বৈধ-অবৈধ শরীর দেখতে দেখতে, দেখা যাক, পৃথিবীর ঘাস, সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর নিষ্পেষিত মনুষ্যতার আধারের থেকে আনে কী করে যে সূর্যে সূর্যে চলি, মহানীলাকাশ ! ভাবা যাক—ভাবা যাক—ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শতশত শতজলঝর্ণার ধ্বনি।

হল কী, ঐ ১৯৫০ থেকে, বেশ কিছুকাল, ১৯৫১-র শারদীয় পুজো পর্যন্ত ঐ মা আনন্দময়ীর শুশ্রূষার ঝর্ণা নামল আমার বুকে।

সেই সময়, উল্লেখ করিনি তেমন, ঐ পিশিমার আমার কানে কানে, 'ও তো তোর সৎমা' বলার পর থেকে আমি বারে-বারে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

আমার এপিলেপ্সি আছে।

এ নিয়ে এখুনই যা লেখার লিখি।

আমার এপিলেপ্সির বাহ্যিক কারণ আমার মা। আন্তরিক কারণ আজও জানিনা তেমন। তো ঐ বাহ্যিক কারণই কিছু বলা যাক।

আমার যখন তিনমাস বয়স, তখন মা আমাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। সবে তখন তিনি রান্নাঘর থেকে ফিরেছেন। কোনোমতে মাছের ঝোল নামিয়ে। আমি নাকি খুব কাঁদছিলাম, তাই। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে দুধ খাওয়ানো। আর আমার

কান্নার মধ্যে দুধ খাওয়া। আমিও নাকি হাঁপাচ্ছিলাম তথৈবচ। মা আমাকে দুধ খাওয়াতেই পারছিলেন না। এ বুক-ও বুক করে কোনো বুকেই নাকি মুখ দিচ্ছিলাম না আমি। মা কার প্রতি রেগে কে জানে, সংসারের প্রতিই হবে, যে সংসার মাকে নিয়ে যাচ্ছিল আমার থেকে দূরে, ঐ সংসার, যে সংসারে মার দায় ছিল আমিষ ঘরে ভাত করা আর মাছের ঝোল করা। পাশে বসে দিলালী গল্পে মেতে ওঠা আমার ছোটো পিশিমা, একটু যদি মার হাত থেকে ঐ দায় ক্ষমা-ঘেন্না করেও নিয়ে নিতেন, তাহলে আমি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে, আমার মা কাছে আসতে পারতেন। অমন কাণ্ড ঘটত না তাহলে। সমানে তখন ছোটো পিশি, 'খোকন কেঁদে সারা হল, যাও শিগগির', বলতে বলতেও একবারের তরেও বলেননি, 'যাও, আমি দেখছি'। মা তাতে রেগে আরও দেরি করছিলেন ঝোল ফোটাতে, এতক্ষণে আমার যা হবার হয়ে গেছে, আমি কেঁদে সারা হচ্ছি, একবার টাশ লেগেও গিয়েছিল নাকি, মা তখন ধপাস করে মাছের ঝোলের কড়াই মেঝেতে নামিয়ে দে ছুট।

শেষরক্ষা হয়নি। মা তখন রেগে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বিছানায়। আর কী যে হল, আমি ঐ নিক্ষেপে বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে। পড়েই নাকি অজ্ঞান। সে জ্ঞান ফিরেছিল নাকি ৭২ ঘণ্টা পর। আমার নাকি প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। ১০৫°। সঙ্গে তড়কা। কনভালসন। আর ঐ কনভালসনই ক্রমান্বয়ে এপিলেপটিক ফিটে যায়।

যত বয়স বাড়তে লাগল, তত একটা অ্যাটাকের পর অপর অ্যাটাকের ইন্টারভেল বাড়ল। কিন্তু অ্যাটাক ম্যাসিভ হতে লাগল।

বাবা আমাকে ডাঃ বিধান রায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন ১৯৫০, জানুয়ারি। মনে আছে, বিধান রায়ের সেই মুখ। ভারি লেন্সের চশমা। আড়ষ্ট কথা। খেই হারিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে। কিন্তু দেখামাত্র বলে দিলেন এপিলেপ্সি।

প্রেসকিপশন হল গার্ডিনাল ট্যাবলেট। ও কাঁচা-কচি বাঁধাকপির রস।

গার্ডিনাল চলত। তবে বাঁধাকপির রস চলত না। ওটা হয়ে উঠত না। ঐ বাঁধাকপি রোজ কেনা আর রস করা, হয়ে উঠত না। গার্ডিনালেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল দেখে ঐ বাঁধাকপি বাদ পড়ে যায়।

ঐ বাঁধাকপি মা আনন্দময়ী আমাকে টানা দু বছর ধরে খাওয়ান আর তাতেই আমি ভালো হই।

ভালো হই, ঐ বাঁধাকপিতে না ঐ মা আনন্দময়ীর নার্সিং-এ, হলফ করে বলতে পারি না। মোট কথা, এখন জেনেছি, মস্তিষ্কের রোগ এটা। মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কী পরিমাণ রক্ত বাহিত হচ্ছে বা জৈব রাসায়নিক বিপাকীয় ক্রিয়ায় কতটা গ্লুকোজ/অক্সিজেনের ব্যবহার ঘটছে—এর উপর নির্ভর করছে আমার সুখ-অসুখ।

আমাদের স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মানসিক ভারসাম্য কোথায়/কোন কোন জায়গায় থাকে এবং কীভাবেই বা সময়মতো এদের ব্যবহার করে পরিবেশ/সমাজের সঙ্গে

আমরা খাপ খাইয়ে চলতে পারি—আবার কীভাবেই বা এই শক্তি হঠাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে দুর্বল হয়ে আসে বা লোপ পায়—যার ফলে আমরা সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার শক্তি হারাই—আমি পড়ে দেখেছি, এ-সব প্রশ্ন আর রূপকথার গল্পের মতো রহস্য-ঘেরা নয়—আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও আরোগ্যের ইংগিত জানাচ্ছে।
আমাকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিশেষত আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান, যদিও অ্যাটাক হয় না এখন, তবু এপিলেপটিক সিম্পটম ব্রেনে এখনো ডরম্যান্ট কিনা জানার জন্য পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি (PET) করা দরকার। ঐ Test-এ ধরা পড়বে, কী পজিশন। বম্বেতে হয়।
যাইনি।
আমি যেমন অকাল্ট সায়েন্সে বিশ্বাসী, এই সেদিনও আমার আঙুলে ছিল ১০ রতির গোমেদ, তেমনি আমি বাবা লোকনাথ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদা মায়ে বিশ্বাসী, আমার বড় ভালো লাগে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে, যিনি নর্দমার জল ও গংগার পবিত্র পাপহরণকারী জলকে আইডেনটিক্যাল ভেবেছিলেন ; আবার তেমনি আমি বিজ্ঞানমনস্কও। বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে আমি মানি, আমার পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি করা দরকার। এখন অ্যাটাক না হলেও পূর্বে যে দৃশ্য দেখতাম, এখনো মাঝে-মাঝে তা দেখি, রেকভারি হলেও যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে রিলাপ্স করতে পারে।
কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছে নেই ঐ ব্যাপারে। বম্বে যদি যাই, তাহলে গোয়ায় যাব, 'মুন্না বড়া পেয়ারা' গান শুনব, তার গোয়ানিজ ভাষা মনে নেই, বাসু ভট্টাচার্য জানে ভালো, সেও তো বম্বেতে। কিন্তু বম্বেতে ঐ PET করতে যাব, এ অসম্ভব।
কেননা, লিখতে লজ্জা নেই, আমি এপিলেপ্সি ফের চাই। To take hold of my sick nervous system. সে আমাকে অনেক দিয়েছে। আমার নির্মোহ একাকীত্ব, আমার প্রবল যৌনতা, আমার যৌন ঈর্ষা, আমার স্মৃতিভ্রংশ, আমার দিবাস্বপ্ন, আমার গোপনতা, এবং Secret system by which I am enabled to escape to the underground.
দিবাস্বপ্নে কত কী দেখেছি।
দেখেছি, আমার মনের মানুষকে, যে কেবল, পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে। দেখেছি, গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম। খয়েরী শালিখগুলো, দেখেছি, খেলছে বাতাবী গাছে—তাদের পেটের শাদারোম, দেখেছি, সবুজ পাতার নীচে ঢাকা পড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে। তারা সব ক্রমে হলুদ পাতার কোলে কেঁপে কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে। এও দেখেছি, কারুর না কারুর গোরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মত। হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড় চোখ মেলে। আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির মেঘগুলো লেগে আছে।
দেখেছি, রাত্রির দানবীকে, যার মাথা নেই, তথাগত বক্ষ নেই। দু-বাহু কর্তিত। আমি

যেন তার অতিকায় উদর বিদীর্ণ করে এসেছি, আমার অধোদেহে দেখি তার লালাময় নাড়ি। আমার শুক্রও শুকিয়ে যায়।

আকাশে অনেক তারা দেখি, দিবায়,...আমি মরে গিয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলে ওইসব তারাদের কাছে চলে যাব। এই পৃথিবীতে আর না থাকাই ভালো। তার চেয়ে বেশী আনন্দদায়ক ওই মহাশূন্যে ঘোরা। পৃথিবীও এককালে একটি তারাই নাকি ছিল। অন্তত তারার মধ্যে তো ছিলই।

এখন আর ঐ দিবাস্বপ্ন দেখি না। স্মৃতিতে চোরকাঁটার মতো লেগে আছে ঐ সব দৃশ্য। কে হায়, হারাতে চায়, স্মৃতি। স্মৃতি যে সততই সুখের।

—না, আমি যাব না বোম্বাই।

—আমি তোকে নিয়ে যাব।

—না, আমি যদি একেবারে ভালো হয়ে যাই—তুমি আর আসবে না আমার কাছে।

—কেন এই যে আসি আজকাল।

—সে তো, অনেক লবণ ঘেঁটে।

—আসি তো!

—এখনো যে ভাবনা তোমার, তাই আস। একেবারে ভালো হয়ে গেলে তুমি ফিরে যাবে আবার ঐ কুচবিহারে।

—দূর পাগল! জানিস না, আমি রিটায়ার করেছি।

—বাড়িটা তো আছে, মরতে বাড়ি করতে গেলে কেন? বেশ তো ছিল ঐ কোয়ার্টার্স।

—তা রিটায়ার করে থাকতাম কোথায়?

—কেন আমার কাছে?

—তোর বউ আছে না?

—একসঙ্গেই থাকতে।

—সে থাকা যায় না। তুই ভালো হলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।

—না, তুমি মরবে না, আমার আগে তুমি মরবে না।

—আবার বিধবা হব বুঝি?

হ্যাঁ, এই শেষ কথা বলেছিল মা আনন্দময়ী।

কবে যেন শুরু করেছিলাম, মাতামহী স্নেহলতারও এক আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। সেই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল আমিই দেখতে পাই নিজগুণে। অর্থাৎ মাতামহী আমাকে দেখান বিশ্বাস করে। এবং উনি বিশ্বাস করেন আমাকে। তাঁর জীবনের বড় দুটি আন্ডারগ্রাউন্ড আমি জানি। উনি যেই জানলেন, আমি জানি, অমনি আমার সঙ্গে সখ্য হয়ে গেল তাঁর। সখ্য মানে? সখ্য মানে হল বন্ধুত্ব, বৈষ্ণব মতে, ভগবানের সহিত সমপ্রাণতামূলক সম্পর্ক। আমি/মাতামহী নিমেষে সমপ্রাণ হলাম।

এখনো গা শিউরে উঠছে, সে কথা ভাবতে। কবেকার কথা, অনেক অনেকদিন আগেকার

কথা, আমি তখন সবে ক্লাস সিক্সে উঠেছি। ১৯৪৫ সবে চলে গেল। প্রোমোশনের পর দিন ১৫ দিন ছুটি হল যুদ্ধের কারণে। কৃষ্ণনগর কলকাতার কাছে, পুবে, জাপানিরা বোমা ফেলতে পারে, এমন গুজব চারদিকে। আমরা কিন্তু জাপানিদের পক্ষে, আমরা ছড়া কাটছি প্রকাশ্যে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি / বোম ফেলেছে জাপানি / বোমের মধ্যে কেউটে সাপ / বৃটিশ বলে, বাপরে বাপ!

বাবা ভয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি তখন নিবু-নিবু। আজকের মতো এমন রমরমা, সে তখন ছিল না। তবে শুরু হচ্ছিল ঐ যুদ্ধের কল্যাণে। এবং দেশভাগের আগে ঐ শিলিগুড়ি, ঐ সেবক ব্রিজ, ঐ হিলকার্ট রোড, ঐ তথাকথিত নিউ জলপাইগুড়ি ওরফে শিলিগুড়ির ঐ জমজমাট জংশন-স্টেশন, এ-সব কাকপক্ষীদের টু-শব্দও ছিল না তখন। তখন শিলিগুড়ি বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম, জলপাইগুড়ি খেয়ে নিচ্ছে তাকে। এখন হায়, শিলিগুড়িই খেয়ে নিচ্ছে জলপাইগুড়িকে। চিবিয়ে খাচ্ছে না আদর করে খাচ্ছে, গালে চুমু খেয়ে। নিজের স্টেশনকে নিউ জলপাইগুড়ি নাম দিয়ে। পরে, NJP করে এই তো সেদিন জলপাইগুড়ির নাম মুছে দিল সে। শিলিগুড়ির গর্ব করার তখন মাত্র এই, সেই একমাত্র দার্জিলিং যাবার গেটওয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন সেবক ব্রিজ দেখাও ছিল এক পরম আশ্চর্য জিনিস দেখা। আর ছিল তখনি ভুটানিদের ভীড়। টসটসে লাল আপেলের মতো গাল তখন তাদের। কিন্তু বুক নেই। মোঙ্গোলয়েডদের বুক তেমন থাকে না, দুধ থাকে ঢের, এখন যেন অনেকটাই তারা আদি অস্ট্রিক হয়ে গেছে। এখনতো ওরা শীতের পাখির মতো আসানসোলেও আসে।

তখন এত ব্যাংকও ছিল না ঐ শিলিগুড়িতে। তবে চারু মজুমদারের বাড়ি ছিল ঐ শিলিগুড়িতেই, সেভাবে ধরতে গেলে শিলিগুড়ি তখন থেকেই ঐতিহাসিক হবার জো খুঁজছে।

এহেন শিলিগুড়িতে আমার মাতামহীর নাম ডাক ছিল খুব, চারু মজুমদারের থেকেও বেশি ঐ ১৯৪৫-এ। আমার মাতামহী ছিলেন সেই তেঁতুলপাতা, যেখানে দশজনের ঠাঁই হয়। অর্থাৎ মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনি এলে সুখী হন। মামা মুখ বেজার করেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। প্রথম তিনদিন ঐ শিলিগুড়ি পৌঁছে মামার আদর পাই। না, বলা ভালো, মামীমার আদর পাই। আমাদের ব্যাপারটাই উল্টো। কেননা আমাদের ছিল 'তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই / মামার বাড়ি ভারি মজা, কিল চড় নাই। মামা এল ঠ্যাঙা নিয়ে পালাই পালাই।' এক মাসের বেশি থাকা যেত না। মামা একটা কিছু প্লট করে আমাদের ভাগিয়ে দিতেন। কেবল আমাকে পারতেন না। কেননা আমি ছিলাম মাতামহীর প্রকৃত দৌহিত্র। মামাকে স্পষ্ট বলা আছে, এই নাতি থাকবে। খরচ আমার।

হ্যাঁ, আমার মাতামহীর খরচ করার মত সম্পত্তি ছিল। তাঁর পিতৃ-সম্পত্তি ছিল ঢের। তিনিই ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান, স্নেহলতা। কত পেয়েছিলেন দেবী-

গঞ্জের পিতৃ সম্পত্তি, আমি হিসেব করে দেখেছি। মনে রাখতে হবে, সেই ১৯৪৫-এ, মাতামহীর ইনহেরিট করা শেয়ার, সার্টিফিকেট ও ক্যাশ টাকা ছিল ২৫ হাজার। বসতভিটা বিক্রিরও প্রায় ২৫ হাজার। সংলগ্ন আম বাগান, পুকুর ও পাট ব্যবসায়ের গুদাম মালসমেত বিক্রির ১৭ হাজার। অর্থাৎ ৬৭ হাজার। আর কিছু লেখার দরকার নেই, কেবল এই লিখলেই চলবে যে তখন শিলিগুড়ির শ্রেষ্ঠ উত্তরবঙ্গীয় কাটারী-ভোগ আলোচালের (আতপ) মণ ছিল মাত্র ১০ টাকা। এখন লিখি, এখন ঐ কাটারী-ভোগ আতপ চালের মন ৪৬৪ টাকা (১৯৯১)। তাহলে ৬৭ হাজার কত হয় এখন? তখন মাতামহী এক টাকার রাজার মাথার রুপোর কয়েন দিলে ২০টা আমসন্দেশ তথা রাজভোগ পাওয়া যেত। যার দাম এখন ৪০ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৪০ গুণ।

এই টাকা দিনে দিনে বাড়ে কালকেতুর মতো, শিলিগুড়ি ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক অধুনা) বাড়ছিল। কেউ জানতো না। এমন কি মামাও না। তখন ম্যানেজারকে অ্যাপ্লাই করলে অ্যাকাউন্ট আদ্যন্ত গোপন থাকত। ঐ ব্যাংকের চারজন ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট ও ক্যাশিয়ার আর চেক লেজার-কিপার ছাড়া কাকপক্ষীও টের পেত না। এখন তো সবই ঢিলেঢালা।

ব্যাংকে এই অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তরুণদাদু। মাতামহীর খুড়তুতো দেওর। রোজ রাতে, ঐ ১৯৪৫-এ, ঐ তরুণদাদু মাতামহীর ঘরে থাকতেন গভীর রাত পর্যন্ত। তরুণ-দিদা অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। তাঁদের মেয়ে বাবলি, অপরূপ রূপসী ছিলেন, আমি অমন রূপ আর দেখিনি। সে, বাবলি একবার আমাকে তার পা দেখিয়েছিল জাঙ্গিয়া অব্দি। ওঃ, কি নিটোল হস্তিদন্ত ছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রথম পিরিয়ডে বমি করতে করতে শেষ হয়ে যায়। তো, ঐ তরুণদিদার দুঃখের অবধি ছিল না। অমন করুণ চোখও আমি আর দেখিনি। অনুমান করি গভীর রাত পর্যন্ত তিনি শয্যাকন্টকে এপাশ-ওপাশ করছেন। অদূরে রূপসী বাবলি। অথবা নিদাঘ জ্যোৎস্না।

অন্যদিকে ঐ তরুণদাদু মাতামহী স্নেহলতার কাছে ফিসফিস করে প্রথমে ঐ হিসেব, পরে, স্বকর্ণে শুনেছি কিছু, ঐ ঘরের বিশাল বিছানার একবারে অন্যধারে শুয়ে, মাঝখানে তিনজন দৌহিত্র, দৌহিত্রী। পরে যখন তরুণদাদু চলে গেলে মাতামহী আমাকে প্রস্রাব করাতে ওঠাতেন (আমার তখন শয্যামূত্র রোগ ছিল) তখন বাইরে থেকে ফিরে মাতামহী তাঁর পাশে শোয়াতেন আমাকে। আমার প্রথম প্রথম ঘেন্না করত। কেমন ভেজা ভেজা শীত শীত লাগত। কিছুতে তাঁর কাছাকাছি যেতে পারতাম না। ঘাড়ে নিঃশ্বাস পড়লে অস্বস্তি লাগত। কেননা, তার আগেই, ঐ তরুণদাদু, স্বকর্ণে শুনেছি, বলেছিলেন একদিন, প্রথম যেদিন মাতামহীর আন্ডারগ্রাউন্ড টের পেলাম শুনেছি, উনি বলছেন, ৮০ ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা বীর্য হয়। মেয়েদের মাসিক চলে গেলে, ৫০-এর পর মাসিক নাকি বন্ধ হবেই, তখন আর সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু কামনা থেকে যায়।

ওঃ, কামনা যে কত বয়স পর্যন্ত থেকে যায়, এখনো সঠিক হিসেব করে উঠতে পারে না মানুষ।

তারপর স্বচক্ষে দেখেছি, মাতামহীর তলপেট অব্দি শাড়ি তোলা শরীরের উপর ঐ তরুণদাদু শুয়ে।

—তোকে আজ কিছু গোপন কথা বলব, কাউকে বলবি না, চল আমরা বাজার করার নাম করে বের হই।

১৯৫১-র কথা। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬। দেখতে বড়। তবে রোগা। আমি তখন বয়স ভাঁড়িয়ে ভোটার। সাবালক হয়েছি। এমনিতেই, সেভাবে দেখলে, আমি সাবালক। সাবালকদের যে ধরনের কনসাসনেস থাকে, আমারও তা আছে। মনে করুন, আমি তার একবছর আগে সহবাস করেছি। আর তখন থেকেই নর-নারী সম্পর্কিত খুঁটিনাটি জানছি। এ জানাই ফ্রয়েড ও রাশেলের মতে, ম্যাচিউরিটি।

আমার মাতামহীর বয়স তখন সবে ৬০ পেরিয়েছে। দশ বছর হল তাঁর মেনোপজ চলছে। তাঁর মুখ থেকেই এ-সব শোনা। বস্তুত তাঁর কাছেই এ-সব শেখা। এই পিরিয়ড, মোনোপজ, রক্ত-বীর্য—এইসব। এ ব্যাপারে আমার শিক্ষয়িত্রী দুজন। একজন মা আনন্দময়ী, অপরজন মাতামহী স্নেহলতা। মাতামহী যেমন কেবল সম্পত্তি ও প্রবৃত্তি শিখিয়েছেন, আমার মা আনন্দময়ী তেমনি শিখিয়েছেন, আনন্দ কাকে বলে। এ দুয়ের শিক্ষায় আমি সাবালক ঐ ১৯৫১-তে। তাই জগৎ বরাট, আর. এস. পি. আমাকে যখন ভোটার হতে বল্লেন, আমার মনে হল না, আমি কিছু অন্যায় করেছি। আমাকে জগৎদা বলেওছিলেন, তুই অ্যাডাল্ট।

হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট।

রিক্সায় উঠে মাতামহী বল্লেন, আজ তোকে তোর নতুন মাসীর বাড়ি নিয়ে যাব। ওখানে আমার সব কাগজ-পত্র আছে। তোকে দেখাব, তুই আমাকে সাহায্য করবি। হেলপ করবি। টাকা বাড়াতে হবে। রিচ হতে হবে। মাতামহী, কারণে-অকারণে ইংরেজি বলতেন। তাঁর ইংরেজি বড় অদ্ভুত ছিল, যেমন 'অ্যানাউন্স' কে 'অ্যালাউন্স' বলতেন, 'ইনসিস্ট' কে 'ইনছিস্ট' বলতেন, 'স্লোগান' কে 'শ্লোক' বলতেন ইত্যাদি। আবার সঠিকও বলতেন, যেমন ইমপিরিয়াল, ব্যাংক, ম্যানেজার, চেক, ব্যালেন্স, ইন্টারেস্ট, এমনকি 'কালচার' কথাটি সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে পারতেন। যেমন, 'তোর মামার কোনো কালচার নেই, এক নার্সকে নিয়ে পড়ে আছে' কিংবা 'এটা কালচার মুক্তো' অবশ্য কালচারড্ মুক্তোও বলা তাঁর অসাধ্য ছিল না।

নতুন মাসী মানে, দত্তক নেয়া মাসী, যদিও মাতামহীর সপ্তকন্যা ও এক পুত্র এখনো জীবিত। নষ্ট হয়েছে দুই কন্যা, এক পুত্র। দাদু ডাক্তার ছিলেন। মাতামহীর বুকের দুধ খেতেন, ওতে নাকি জরায়ু ভালো থাকে। এও শোনা।

এসব কথা আমাকে ঐ ১৯৫১-তেই বলে ফেলেছেন।

যখন ঐ মাসীর বাড়ি গেলাম, দেখলাম এক সর্বদা 'মা' 'মা' করা মাসীকে। আমার মা বা বাকি ছয় মাসী কখনো মাতামহীকে মা ডেকেছেন, শুনিনি। সব্বাই, আমার মামা ইস্তক ঐ তরুণদাদুর কীর্তি জানতেন। মুখে কেউ কিছু বলতে পারত না। কেননা মাতামহী সর্বদাই শাসাতেন, 'জানিস তো আমি একা থাকতে পারি। আমার যা আছে, তাতে হেসেখেলে ডুগডুগি বাজিয়ে থাকতে পারি। কারুর কাছ থেকে এক কানাকড়ি না নিয়ে।'

ঐ নতুন মাসীর বর, আমার নতুন মেসো, পড়ে গিয়ে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। সংসার দেখতেন, আমার মাতামহী। আর তাঁর সংসারও ছিল ঐখানে। সংসার মানে মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ। এখানে এসে মাতামহী নিজব্যয়ে শিলিগুড়ির শ্রেষ্ঠ মিষ্টি, ক্ষীরের মালপোয়া, নিজে খেতেন, নতুন মাসীকে খাওয়াতেন, আর তাঁর ঘর-জামাইকে। ঐ নতুন মেসো, বাস্তবিক, মাতামহীর ঘর-জামাই ছিল। ঘর-জামাই, home, domestic Son-in-Law। ঐ নতুন মাসীর কোনো ছেলেপুলে ছিল না, এখানেই মাতামহীর সুখ। উনি কন্যাদের সন্তানসম্ভাবনায় কম্‌প্লেক্‌স বোধ করতেন। বারান্তরে বলতেন, আমারই দেয়া পালংকে, আমারই দেয়া পণে, আমারই গর্ভজাত কন্যার উপর অন্য কেউ শোবে, এ সহ্য করা যায় না। তবে জামাইদের খুব যত্ন করতেন। নাতিদেরও। তারমধ্যে অবশ্যই আমি সবার সেরা প্রডিগ্যাল নাতি ছিলাম। আমি দুটি কারণেই প্রডিগ্যাল। আমি বহুব্যয়ী, wasteful, এই এক ; অবশ্য এটা বড় কথা না ; আমি যে আবার স্বেচ্ছাচারী, এই দুই। ঐ স্বেচ্ছাচারী অর্থেই আমাকে উনি প্রডিগ্যাল বলতেন। এই শব্দ শিখেছিলেন, স্যামসন অ্যান্ড ডেলাইলা দেখে। আমি, নতুন মাসী, মাতামহী দেখেছিলাম ঐ ছবি মেঘদূত সিনেমায়। 'প্রডিগ্যাল' শব্দটি আমার স্বকর্ণে শোনা, ঐ ছবি দেখে। যে চুল অব্দি কাটতো না। দাড়ি না, কিছু না। চুল কাটলে ওর শক্তি কমে যেত, ঐ প্রডিগ্যাল স্যামসনের, আমাকে, ঐ ছবি দেখার পর থেকে বলতেন, চুল কাটবি না। তোর শক্তি অক্ষয় থাকলে, আমার ভাবনা নেই। আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুই বুদ্ধি করে টাকা তুলবি আর খাটাবি। এক আনা তোর।

এক আনা মানে জানেন ? ধরুন মাতামহী যদি হাজার টাকা তোলেন, তার এক আনা হল, হাজার আনা, অর্থাৎ ৬২ টাকা আট আনা, আর ৬২ টাকা আট আনা মানে হল, ৪ (চার) মণের বেশি কাটারিভোগ আতপ চাল কেনা ঐ ১৯৫১-তে। এখনকার আড়াই হাজার টাকা। ভাবা যায় ?

—আচ্ছা, তরুণদাদু এখন কোথায় ?

—ভাগলপুরে।

—কেন ?

—তোর মামা তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন ?

—তোর মামা সন্দেহ করত।
—কি সন্দেহ ?
—ঐ টাকাকড়ি।
—আর কিছু ?
—আর আবার কি থাকবে ?
আমি আর পারলাম না, বলতে বাধ্য হলাম, কেন ঐ ৮০ ফোঁটা রক্তে যে এক ফোঁটা বীর্য হয়, আমি জানি কিন্তু।
—জানিস ? তাহলে তখন ডুবে ডুবে জল খেতি।
—আমি যে প্রডিগ্যাল।
—কাউকে বলিস না কিন্তু, তোকেই আমার সব সম্পত্তি দিয়ে যাব।
দিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু আর অবশিষ্ট থাকেনি। আমার মাতামহীই যে আদ্যন্ত প্রডিগ্যাল ছিলেন।

স্নেহলতার কথা[১]

আনন্দময়ীকে আমার মাতামহী স্নেহলতার কথা বিস্তর বলেছি, কেননা এই আনন্দময়ী ব্যতিরেকে আমার জীবনে ঐ স্নেহলতা কম প্রভাব ফেলেননি। আমার অবদমিত মনকে উনিই প্রথম সারফেসে নিয়ে আসেন নিজ গুণে, আমাকে অভয়দান করেন। বলা যায়, উনিই উসকে দেন আমার অবদমন। উনিই আমার নেসেসিটি, প্রয়োজন, ইত্যাদিকে রিকগনাইজ করেন—তথা স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ ফ্রিডম দেন।
ওনার প্রডিগ্যাল চরিত্র একদিনের বাজার করা দেখলেই মালুম হয়। একদিন ঐ দত্তক মাসী, আমি, আর ঐ মাতামহী স্নেহলতা তখনকার শিলিগুড়ি বাজারে যাই। যেখানে এখন স্মাগ্‌লড গুডসের বাজার, তার কাছেই ছিল তখনকার শিলিগুড়ি বাজার। ঐ তথাকথিত হিলকার্ট রোডের পাশে। তখন সবে কাঁসার বাসনের গুরুত্ব কমছে। কাচের বাসন, অ্যালুমিনিয়াম বাসন ও স্টেনলেস স্টিলের বাসন উঁকি মারছে। উনি করলেন কি কাচের বাসন এক সেট, ডিনার সেটসহ, এবং স্টেনলেস স্টিলের বাসন এক সেট, সেও ডিনার সেটসহ কিনলেন। সে, প্রায়, তখনকার যুগে, সাতশ টাকা লেগেছিল মনে আছে। নিয়ে দত্তক মাসীর বাড়িতে সব মজুত করে, জানালেন, এবার ডাইনিং টেবিল-চেয়ার হবে, অর্ডার দিয়েছি। এলে, আমরা একদিন, এই বাড়িতে ডিনার খাব। এই রকম প্রডিগ্যাল ছিলেন তিনি।
অবশ্য, এ-সব কথা যখন জানিয়েছি আমার আনন্দময়ীকে, যিনি প্র্যাকটিক্যালি আমার

---

১. এভাবে ডাইরীতে এটাই একমাত্র সাব-টাইটেল। কেন সে করল অনুমান করতে পারি। এই স্নেহলতার কথাই সবার আগে আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু যেহেতু আনন্দময়ীর কথা বলতেই যেন তাঁর আগ্রহ যেজন্য স্নেহলতা ক্রোনোলজিক্যালি আসেননি। প্রসঙ্গত জানাই—ডাইরীর যে পাতা থেকে লেখা শুরু, সে পাতায় 'আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' টাইটেলের নীচে খুব ক্ষুদ্র অক্ষরে, ঐ মার্জিনে, সুন্দর করে ১৮ বার আনন্দময়ী লেখা। কেন ১৮ বার বুঝিনি আজও॥

কাছে চলমান ডিকশনারি, যেমন ছিলেন, যদি বড়তেই দেই ছোটর উপমা, তাহলে বলতেই হয়, যেমন ছিলেন ভাষাবিদ সুকুমার সেন, আর রবীন্দ্র মিউজিয়মের কিউরেটর শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁরা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে চলমান ডিকশনারি। তেমনি চলমান আমাকে জানিয়েছেন, যদিও প্রডিগ্যাল শব্দটি হঠাৎ মনে হতে পারে বড় স্বেচ্ছাচারী, তাহলেও এই প্রডিগ্যালেরও পজিটিভ দিক আছে অভিধানে। যেমন, Nature is prodigal of her gifts…a man who gives prodigally to charities…এ সবই in a good sense…bad sense এ তো আছেই যে, extravagance, wasteful, spending…তোর দিদিমা হয়ত দুই-ই।

হ্যাঁ সত্যিই, মাতামহী স্নেহলতা দুই অর্থেই প্রডিগ্যাল। আমাকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারেও প্রডিগ্যাল।

সেটা অবশ্য আমি ১৯৫৬-তে বুঝি। যখন আমি এম. এ. পড়ি কোলকাতায়।

এবং আমার যখন সিক্স্থ-ইয়ার, বাংলায়।

তখন উনি একবার কোলকাতায় আসেন। এবং তাঁর আত্মীয়গৃহ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রোডে ওঠেন। আমাকে হস্টেল থেকে চিঠি লিখে, সেখানে আনিয়ে জানান, আমাকে তুই কয়েক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবি। যাই।

প্রথমে এক সিনেমা, অঞ্জনগড়, সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল' অবলম্বনে এক মুভি। দেখলাম ভবানীপুরের রূপালিতে। সিনেমা দেখে ফেরার পথে বল্লেন, দেখলি তো সুনন্দা ব্যানার্জির সঙ্গে রাজা মুখার্জির ভালোবাসা। ঐ ভালোবাসা খুব ভালো। কেননা, ভালোবাসা হল, সামাজিক কাজে একত্রে চলতে গিয়ে। ভালোবাসা যদি হয় সজ্জন, তাহলে তেঁতুল পাতায় দশজনের সঙ্গেও ভালোবাসা চলে। এ ভালোবাসা নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় যদি ভালোবাসা কেবল আমাতে-দেওরে হয়, যা অবৈধ বলে কাউকে বলা যায় না, ছেলেমেয়েদের কাছেও লুকাতে হয়। এমনকি ছেলেমেয়েরা যখন মা-বাপ হচ্ছে, তখনো যা চলে গোপনে। এ ভালোবাসা কেবল গায়ে-গতরে বাড়ে। তাই গায়ে-গতরে ঘুণ ধরলে ঐ ভালোবাসাতেও ঘুণ ধরে। তুই যদি ভালোবাসিস, তাহলে ঐরকম সামাজিক কর্মের মধ্যে যে ভালোবাসা হবে, তাকেই ভালেবাসবি কেবল।

কথা রাখতে পারি না। আমিও ঐ তথাকথিত অটোনমাস তথা ব্যক্তিগত ভালোবাসায় যাই আর সমূহ বিপদে পড়ি। কিন্তু সে কথা পরে।

আগে-ভাগে বলে রাখি, আমার মাতামহী, ঐ বেড়াবার ঝোঁকে আমাকে বলেছিলেন, যা কিছু নিষিদ্ধ, তুই অবাধে তাই কর—আমি পাশে থাকব, বল্ তোর কি ইচ্ছে! আমি তোর ইচ্ছে দেখব।

আমি বলি, আমি গোমাংস খাব। অবাধে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। উনি রাজি হন। আমরা 'নিজামে' যাই। বিফ-রোল খাই ঐ ১৯৫৬-তে। তখনো রোল এমন জনপ্রিয় হয়নি। ওনার সঙ্গে আমিনিয়াতেও যাই। সেখানে আমিনিয়া স্পেশাল খাই। সেদিন

এক অঘটন ঘটে। ওঁর পরনে ছিল গরদের শাড়ি ও গরদের চাদর গায়ে। তখন শীত আসি-আসি করছে। আমার বেপরোয়া মাংস খাওয়া তিলক কাটা মাতামহীর কাছে, স্বভাবতই ব্যস্তবাগীশ হয়—তাতে ঝোল ছিটকে পড়ে মাতামহীর গরদের চাদরে। উনি হাসেন। বলেন কেবল, দেখলি তো, অবাধ ইচ্ছের উচ্ছিষ্ট ছিটেফোঁটা অন্যের গায়েও লাগে। এখন তোর বিচার, তোর ইচ্ছেগুলি কতটা অবাধ করবি, যাতে তার উচ্ছিষ্ট অনিচ্ছুকের গায়ে না লাগে। আমি কিন্তু ইচ্ছুক, তোর ইচ্ছেগুলি অবাধ হোক।

তোর দাদুর মৃত্যুর পর, মনে আছে, তোরা যখন এলি, তখন শেষরাত, বারান্দায় দাদুর মৃতদেহ, অগুরু ছিটানো হচ্ছে কেবল, ধূপধুনো, ফুল, তোর দাদু বেলফুল ভালোবাসতেন, সারাদেহ তোর ছোটমাসী বেলফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল, মনে আছে? তুই ঝাঁপিয়ে এলি আমার কোলে। মনে আছে? তুই আমার বুকে মুখ রেখে গুমরে গুমরে কাঁদলি। আমার কান্না মুছে গেল। কি নিয়ে বাঁচব, তার হদিশ হল, আমার কোল জুড়ে তুই এলি। মনে আছে?

তারপর, তখনো, আমার মাসিক বন্ধ হয়নি। ভেবে দেখ, তখন মাত্র ৪৯। ১৯ বছর থেকে মা হচ্ছি প্রায় প্রতি বছর। নটি সন্তান পেটে ধরেছি। দেখবি তলপেট একটুও কুঁচকায়নি। আমার বুকেও বলি পড়েনি।

তোর দাদুর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঐ যে শেষ মাসিক হল আমার। আর হ'ল না। ৩/৪ বার ভিজে গেছে, রক্ত ঝরেনি।

ঐ সময় তোর তরুণদাদু আমাদের বাড়িতে থাকতে লাগলেন সপরিবারে। কুচবিহারের বাস উঠিয়ে রিটায়ার করে এসেছেন মাত্র ৪৫-এ। টি. বি. হয়েছিল। অবশ্য এই শিলিগুড়ির বাড়িতে তাদেরও অংশ ছিল।

দুদিনে বন্ধু হয়ে গেল তোর তরুণদাদু। আপাদমস্তকে দেওর, দ্বিতীয় বর। কত কিছু শিখলাম তার কাছে। ছেলেমেয়ে বিয়োবার সময় তোর ডাক্তার দাদুর কাছে কিছুই শুনিনি। কিছু প্রশ্ন করলেই বলতেন, তোমার এ-সব ডাক্তারি কথা শুনে কি হবে? তুমি কি ডাক্তার?

—অন্তত ডাক্তারের বৌ তো!

—হ্যাঁ, বৌ শুধু।

তোর তরুণদাদু বোঝালেন, মেয়েরা শুধু বৌ না, মেয়ে না, শাশুড়ি না, বোন না, মেয়েরা হল মানুষ।

ঐ মানুষকে গড় করত সে।

আমার পা দুটো শিউরে উঠত।

যেদিন মাসিক বন্ধের জ্ঞান পেলাম; সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘরে আমি আর সে। ঘরটা যে বড় ঘরের সংলগ্ন, সেখানেও কেউ ছিল না। বারান্দাতেও কেউ ছিল না। আর সব ঘর তো উঠান পেরিয়ে, ঐ তুমুল বৃষ্টিতে, যে-যার ঘরে।

তোর তরুণদাদু বোঝালেন, মাসিক বন্ধ হলে মা হওয়া যায় না বটে কিন্তু কামনা যায় না।
আর শুনবি ?
তারপর থেকে কি হল জানিস, নতুন করে যেন সূর্য উঠল। নতুন করে আমার দেহে রক্ত এল। রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে আমি আরও রক্তাক্ত হলাম। ও সে যে কি কাঁপুনি, তোকে কি বলব ! তখন আমার মনের বনে বাঁশ ও ঘাস ছাড়া, যার ভেতরে একটু সার আছে, সেই চন্দন হয়ে গেল।
এই স্নেহলতা মারা গেলেন ১৯৬০-এ।
দৌহিত্র হিসেবে পারলৌকিক ক্রিয়ায় আমি নিজের অজান্তে পদবী বলার সময় স্নেহলতার পিতৃদত্ত 'দত্ত' বল্লাম, স্বামীদত্ত ভৌমিক বল্লাম না।
স্নেহলতা দত্ত নামে তাঁর আত্মার, শান্তি কামনা করলাম। এও সম্ভবত তাঁরই কৃপা। অথবা তাঁরই নির্দেশ। আমার অবদমিত অভীপ্সা।
তাঁর শেষ কথা ছিল, সবই করবি, কাউকে কষ্ট দিবি না। ভোগ করবি গায়ে আঁচ লাগতে দিবি না। বাসনার সাগরে ডুববি, চুল ভেজাবি না।
কতটা পেরেছি সে কেবল জানেন আমার অন্তর্যামী, আমার মা আনন্দময়ী।
তাঁরও শেষ কথা, উঠে আয় পাতাল থেকে। অনেক ঋতু কাটালি সেখানে। এবার মর্তে আয়।
মর্তে এসেছি কিনা, তারই হিসেব করতে এই দিনপঞ্জী।

তৃতীয় অধ্যায়

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে

১৯৮৬-র ১৫ এপ্রিল, মা আনন্দময়ী আমার, মারা গেলেন। এই বাক্যটি যে কখনো আমাকে লিখতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। এ যাবৎ আমি যতবার আমার মৃত্যু-শয্যা চোখে দেখেছি ততবারই ঐ আনন্দময়ী আমার শয্যাপার্শ্বে। একবার তো ওঁর বুকের উপর মাথা রেখে লোকান্তরিত হয়েছিলাম।
কী আর লিখব সে কথা, দুঃসংবাদ দ্রুতগতিতে আসে। দুঃখের যেমন ক্ষিপ্র আক্রমণ, তেমনি দুঃসংবাদেরও।
কোথা থেকে কোথায় ভাবুন, শিলিগুড়ি থেকে আসানসোলে। মাত্র চার ঘণ্টায়।
তখন দুপুর, লিভিংরুমে আমি একা। মাস্টার বেডরুমে স্ত্রী। মরতে তখন আমি ক্যাসেটে শুনছি, 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না…', ঘর অন্ধকার, বাইরে লু। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে তখন। এমন সময় ডোর-বেল।
মা আনন্দময়ীর বলাই ছিল, আগেই, 'আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।' বাক্যটাকে যে কতবার কত কে আমার কানে দিল, ভাবতে গেলে দেখি,

আমি অভিমন্যু, সপ্তরথী বাক্য দিয়ে ঘেরা। কেবল ঐ কথা, 'আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।'

যেন সাত-কোরাসে আনন্দময়ী বলছেন, আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।··· এই বাক্য দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে যেন আমাকে তুলে আনল আসানসোল থেকে।

ওয়ারলেস মেসেজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জামা-কাপড় পরেছি। আর পরতে পরতে শায়িত স্ত্রীকে বলেছি। স্ত্রী অব্দি শোকাকুল দেখি। আমার কোনো মুভমেন্টে বাধা দেবার শক্তি হারায়। আমি আমার কাঁধে ঝোলানো নীল কটস্উলের ব্যাগ, আনন্দময়ীরই দান, কাঁধে নিলে, সে কেবল মুখ ঘুরিয়ে নেয়, জানি তার কান্না পাচ্ছে শোকে ও পরাজয়ে।

—জামা-কাপড় কিছু নিলে না যে!

—ওখানে আছে, থাকে আমার জামা-কাপড়—জানোই তো।

আর কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট করি না। ছুটে যাই জি. টি. রোডে। হাত তুলে দাঁড় করাই এক রেডক্রস ছাপা অ্যামবাসেডর। সে থামে, আমি কেঁদে ফেলি। স্টেশনে যেতে, হাতে ঘড়ি নেই, থাকে না কখনো, সমানে ডাক্তারের মণিবন্ধে চোখ রেখেছি, চার মিনিট ১৯ সেকেন্ড লাগল রিজারভেশন অ্যানেকসিতে পেঁছাতে।

ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আরেকবার কেঁদে ফেল্লাম।

বাদলবাবু ভি. আই. পি. কোটা থেকে দার্জিলিঙ মেলের একটি সেকেন্ড ক্লাস শিলপার দিলেন টু টায়ারের, জানলার ধারে। তখন ঘড়িতে বিকেল ৫টা ১০। বাদলবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমে, রাইট টাইমে আসছে ব্ল্যাক-ডায়মন্ড। মনে পড়ে গেল, বিকেল কত কান্না যেন, সন্ধ্যা এক স্তব।

ভোরে পেঁছলাম।

দেখি আনন্দময়ী শুয়ে আছেন। বিশ্বাস হয় না। আনন্দময়ী ঐখানে শুয়ে আছেন কিনা, বুঝে উঠতে পারি না। আনন্দময়ী চলে গেলেন অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া? পাখিদের মতো পাখা বিনা?

অদূরে আনন্দময়ীর ভূত। ঐ জ্যামিতিক ভূত বলে, আমি তো জানিনা, আনন্দময়ী চলে গেলেন অতদূর!

ওঁর পুত্রবধূ লাল চোখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লেন, 'আপনি ছিলেন মার সব। শেষে পরশু আমার হাত ধরে বলেছিলেন, ও আমার মনের মানুষ। আমার স্বামী। আমার সর্বস্ব। আমি ওর মা আনন্দময়ী···আমার শুনে, শোনামাত্র, মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। আমি এমনটা ভাবতে পারি না। ভাবতেই পারছি না, আপনার সঙ্গে মার সম্পর্ক আসলে কি! আপনাদের ছেলেকে বলতেই পারিনি এখনো। এ-সব কথা পুত্রকে বলা যায় কি, নিজের মায়ের মুখের এ-সব কথা, পুত্র কোন কানে শুনবে?··· আরও

বলে গেছেন মা, আপনিই যেন ওকে বিবসনা করান, আপনিই যেন ওর বুকে মধু, ঘি মাখান।

মধু, ঘি মাখিয়ে ছিলাম সারা দেহে, যে দেহের প্রতি রোমকূপে আমার স্পর্শ আছে সেই ১৯৫০ থেকে। কেমন যে লেগেছিল নিজের দু হাত, লিখে বোঝাতে পারব না। এই দু হাত এখনো আমি দেখি। এখনো, কয়েক কোটিবার ধুয়েও, আমি আমার দু হাতে, এখনো, মধু ও ঘিয়ের অনির্বচনীয় গন্ধ পাই।

আসানসোলে ফিরে, পুরোনো স্টেটসম্যান পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে আরেকটি দুঃসংবাদ দেখি। ঐ দিন, ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৬, আনন্দময়ীর মৃত্যুদিনে আমার প্রিয় জাঁ জেনেরও দেহান্ত হয়, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পারীর সাধারণ এক হোটেলে।

এও পড়ে অবাক লাগে, ঐ দিনের কাগজে, হ্যালীর ধূমকেতুও ঐ ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৬-তে পৃথিবীর কাছে আসে।

শিলিগুড়ি থেকে ফেরার দিন, আমি যখন চুপচাপ একা আনন্দময়ীর ঘরে, তাঁর তৎকালীন প্রাক্তন সুস্থ-শয্যার উপর বসে, তখন আনন্দময়ীর পুত্রবধূ আমাকে অ্যালুমিনিয়ামের ১০″ × ৮″-এর এক বাক্স হাতে দেন। তালা দেয়া বাক্স। চাবি নেই। উল্লেখে পুত্রবধূ জানান, এ তালা আপনাকেই ভাঙতে বলে গেছেন। এর চাবি উনি যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, পরে নিজেই খুঁজে নাকি পান না। বাক্সের জিনিস বের করে উনি বাক্সটি এখানে রেখে যেতে বলেছেন। আরও বলেছেন, যেদিন আপনি ফিরে যাবেন তার আগের রাত্রিতে আপনি যেন এই ঘরেই শুয়ে থাকেন।

তাই শুই। কিন্তু ঘুম আসে না।

ঐ ১০″ × ৮″ বাক্সের তালা ভাঙতে মোটে বেগ পেতে হয়নি। সেই কবে বলেছিলাম চুমকি ভালো লাগে আমার, আরো ভালো লাগে সোনালী ধাতুর ছোটো চুমকি, খুব ভালো লাগে যদি কোনো লাল ওড়নায় ঐ সোনালী চুমকি থাকে—আর যদি তুমি কখনো ঐ ওড়নায় আমার কাছে আসো, আমার সব দুঃখ চলে যাবে।

কবে কি বলেছি, নিজেরি ভালো মনে নেই। দেখি, সেই বাক্সে সযত্নে ভাঁজ করা লাল রেশমী ওড়না, সোনালী চুমকি বসানো। বাক্সের বাকি অবকাশে কেবল চুমকি, অজস্র সোনালী চুমকি।

—চুমকি তোর এত ভালো লাগে? আগে বলিসনি কেন?

—বল্লে কি হত?

—আমি চুমকি হতাম। চুমকি বড় হালকা জানিস তো? তাহলে আমাকে তুলতে পারতি, আমাকে তোর বুকে তুলে নিতে পারতি।

—কেন, তুমি তো নিতে পার, নাও তো কত!

—তাতে কি আমারো ইচ্ছে করে না!

—বেশ, আমি তাহলে টান-টান এবং স্পন্দিত তার হই—তুমি তার উপর হেঁটে যাও সাবলীল। আমি তোমার ভার বহন করব দেখো। তার হয়ে কেবল দিনরাত আজীবন

তোমাকে আমার উপর রাখবো—তুমি তারের উপর হাঁটবে, দৌড়বে, ঘুমোবে, খাবে, জ্যোৎস্না দেখবে, নাচবে, গান গাইবে, কুসুমের মতো বসবাস করবে তারে, আমার উপর !
—আমি কি সার্কাসের ক্লাউন, জোকার ? নাকি পতঙ্গ ? আমি কি বিনোদী—মাদারি যে তোর উপর সারা জীবন খেলা দেখাবো ।
—হ্যাঁ, তুমি আমার মাদারি/মাদারি-কা-খেল/রোপট্রিক-ব্যালেন্স ।
বাকি কথাও হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু বাকি কথা জাঁ জেনে বলেছিলেন ভালো। তাই লিখি ।
……জাঁ জেনের মাদারি বৃত্তান্ত, লিখি যে, দুইজনের কথামাত্র, একজন লোহার তার অথবা আমি, আরেকজন মাদারি অথবা আনন্দময়ী। অবশ্য বিপরীতটাই সত্য, অন্তত জাঁ জেনে তাই লিখেছেন। কেননা তারই ভারবহন করে মাদারি—সেক্ষেত্রে আজীবন আনন্দময়ী আমারই তো ভারবহন করেছেন। ঘরে-বাইরে। শয্যাতেও তাই। তাহলে আমি হই মাদারি আর ঐ তার হন আমার মা আনন্দময়ী। অন্তত জাঁ জেনে আমাকে তাই জানাচ্ছেন, 'এই প্রেম প্রায় আশাহীন, কেবল মমতায় ভরা। ঐ লোহার তারটা, তোমার আনন্দময়ী, তোমাকে বহন করার যতটা জোর তোমায় দেখাবে, ততটা প্রেমই তোমাকে ঐ লোহার তারকে, তোমার আনন্দময়ীকে, দেখাতে হবে ।
'আমি বস্তুদের জানি। তাদের চাতুর্য, নিষ্ঠুরতা এবং কৃতজ্ঞতাকেও জানি। সেইমতো তারটা ছিল মৃত। অথবা, যদি সে, তার, তোমার প্রার্থনায় অমর্ত, বধির, অন্ধ—তাহলে ঐ দেখ, সে, তার, জীবন্ত হয়ে উঠছে। এবং ঐ শোনো, সে কথা বলছে ।
'তুমি তাকে প্রায় শরীরী ভালোবাসবে। রোজ সকালে, যেহেতু তুমি মাদারি, তোমার লীলার অন্ত নেই, তুমি স্টান্টম্যান, রেওয়াজ, অনুশীলন, চর্চার সময়, যখন সে টান-টান এবং স্পন্দিত, তখন যাও, কাছে যাও খুব, চুমু খাও। তাকে, কানে কানে বল, সে যেন তোমায় ধরে রাখে এবং সে যেন তোমার হাঁটুর পেশীর লাবণ্য ও ক্ষিপ্রতা তোমাকে দান করতে রাজী হয়। লীলা সাঙ্গ করে তাকে ধন্যবাদ জানাও, সেলাম কর, দোস্ত কো সেলাম কর। পরে যখন সে তার বাক্সে গুটানো আছে তখন গভীর রাতে তার সঙ্গে দেখা কর, তার গায়ে হাত বোলাও। আর মিষ্টি করে, সোহাগে, তার গালে গাল রাখ। কোনো কোনো লীলাবিলাসী স্টান্টম্যান হিংস্র হয়ে তারের উপরে দাপাদাপি করে, বলাৎকার করে, সেও অবশ্য অবাধ্য হয় তখন, অথবা তার আগের থেকেই অবাধ্য থাকে বলে ঐ কাণ্ড। কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে যাতে সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করে। যদিও কোনো প্রেমেরই শেষ নেই, অথবা পরিণতি আশা করা যায় না, তবু জেনো, বশ্যতা স্বীকার করতে উভয়েই সন্নিকটবর্তী হয় অথবা বশ্য হতে বড় সুখ ।
'সাবধান। লোহার তার অথবা যদি সে আনন্দময়ীর প্রতীকই হয়, তাহলেও সাবধান। জানবে সে প্যান্থার বা দর্শকদের মতো রক্ত ভালবাসে, অথবা রক্তপাত। বরং তাকে পোষ মানাও, প্রেমে হও বলী, অথবা জয়ী ।
'তোমার লোহার তারকে, যার উপর তুমি লীলা করছ, অর্থাৎ যে তোমাকে বহন করছে,

যে তোমার আনন্দময়ী, তাকে, তোমার নয়, তারই সবচেয়ে সুন্দর অভিপ্রকাশ দিয়ে, তারই ভিতরের অভিব্যঞ্জনা কুড়িয়ে, তারই দ্রব্য ও হৃদয় সামগ্রী দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ কর। তোমার উল্লম্ফন, তোমার ডিগবাজি, তোমার ঐ আদি-অস্ট্রিক নাক, সকলই স্পর্শাতুর হবে, তবু তোমাকে সুস্থির তার উপর দাঁড়িয়ে সেলাম জানাতে হবে সকলকে, কেননা সকলেই তোমার ও তার প্রশংসা করছে হাততালি দিয়ে, কেননা সে তোমাকে বহন করছে হৃদয়-অন্তরে আর তুমি তার উপর নির্ভর করছ আর স্পন্দিত হচ্ছ, লীলাময় হচ্ছ, সুন্দর নৃত্য করছ, ডিগবাজি খাচ্ছ, সর্বোপরি সেলাম জানাচ্ছ তোমার এই স্নেহের জগৎকে। তুমি উজ্জ্বল বলেই অথবা তুমি তোমার আনন্দময়ীর স্নেহভাজন বলেই যে ঐসব লীলায় তুমি সক্ষম হবে তা নয়, তুমি সক্ষম হবে তার কারণ ঐ তারটা, যেটা মৃত ও মূক ছিল, সেটা অবশেষে গান করছে, তাই।'

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি। তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি। তখন তারি আলোয় ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়। তখন যেন বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে / তখন আমার হৃদয় কাঁপে / তারই ঘাসে ঘাসে'

আমি স্পষ্ট শুনছি সেই গান, আমার মা আনন্দময়ী চিতায় শুয়ে গাইছেন। তার চারদিকের নীল শিখা, ঊর্ধ্ব-অধোর নীল শিখা তথাপি নীল রুমাল নেড়ে বিদায় জানাবার ছলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। যাব, আমি যাবই, আমি সহমরণে যাব। সহসা দেখি আগুনে পুড়ে আনন্দময়ী যেন স্ফীতকায়া, মধু ও ঘি জ্বলছে। জ্বলতে, জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে তিনি অবিকল যেন শায়িত ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধ। সেই প্রস্তর হাসিটি ঠোঁটে লেগে আছে, অম্লান।

আমাকে সেই সংবাদে আরও বিস্তৃত জানিয়েছেন জাঁ জেনে, *Le Funambule* গ্রন্থে ঐ মাদারি বৃত্তান্তে। এই সেদিন জানালেন, আমি তোমার আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছি, তোমার গোপনতা দেখেছি, দেখেছি অজস্র নুড। অন্ধকারে দুই পুরুষ প্রকৃতির তাড়নায় অথবা নিজেদের খেয়ালে, biological love, প্রবহমানতাকে কলা দেখিয়ে ঐ দেখো সমকামী হয়েছে। ঐ দেখো স্বয়ং জাঁ জেনে, আমি আর আমার প্রেমিক পরস্পরের উপর শুয়ে আছি। ঘাম, কেরোসিন তেলের গন্ধ, কোথাও হাওয়া নেই। প্রেমিক বল্ল, একদিন অন্তত মেয়েলি পোশাক তো পরতে পার! প'রে দেখেছি কতবার, পোষাক পরলেই আমার ঘাম হয়, আমাকে দেখতে কুশ্রী লাগে, আমার লজ্জা করে, যে কোনো পোশাক পরতে। পিঁপড়ে অব্দি আমাকে ঠাট্টা করে, ও বলে, দুনিয়াকে দেখো, তুমি কি সৃষ্টিছাড়া গো, ধড়াচূড়া পরে কি যে কিম্ভূত হয়েছ যাও আয়নায় গিয়ে একবার দেখো—আর কাউকে দেখেছ, অমন করে ঢাকতে নিজেকে? বাবু প্রজাপতি অব্দি অদ্যাপি ধুতি-পাঞ্জাবী পরেনি। ঐ দেখো, কি সুন্দর নগ্ন সারঙ্গ। ঐ দেখো বিবসনা কোকিলা, ময়ূরী, চিতা। ঐ দেখো নগ্ন নির্জন সাপ। কতবার তাই আমি সাগরে ভাসাই আমার পোশাক, যাহার কূল আমি নাহি জানি।

একদিন তোমার ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডে পেলাম এক টুকরো কাগজ।

'যার ওপরে অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা। একটা সোজা লাইন, যেটা তারের তথা আনন্দময়ীর সরলচিহ্ন। তার উপর ডানদিকে বাঁকা দাগ আর বাঁদিকে সোজা দাগ। এ-সবই তার পা। অথবা বলা যায়, তার পা ফেলার জায়গা। এইভাবে সে পা ফেলবে। আর ঐ দাগের পাশে একটা করে ফিগার, সংখ্যা। কারণ একটা শিল্প, তা ভালোবাসাও হতে পারে, আবার গানও হতে পারে, এক্ষেত্রে লীলাখেলা, যা সে এলোমেলো ও বাস্তবিকভাবে কাজ চালানোর জন্য ট্রেনিং নিয়েছে, এবং সেই ট্রেনিং-এ যে অনুশীলন ও ডিসিপ্লিন আরোপ করবার জন্য খাটছে এত, সে শেষ পর্যন্ত জিতবে। সে (ইমানুয়েল কান্ট) পড়ুক আর না পড়ুক, (পিওর রিজন আর প্র্যাকটিক্যাল রিজন সম্পর্কে তার কোথাও না কোথাও প্রত্যয় রয়ে যাবে, অন্তত আবহ থাকবেই) তাতে কি এসে যায়? তাল ও লয় গোণবার পক্ষে সে ঐসব চিহ্ন, রেখা, অক্ষর, সর্বোপরি ঐ সংখ্যাকে সে ভালোই জানে। অর্থাৎ সে ঐ আনন্দময়ী তারের জন্য কার্যত শিল্পী। সে কৌশলী নয়, সে কৌশলী ব্যবসাদার জোয়ানোভিসিও (অর্থাৎ বনোয়ারিলাল ভালোটিয়া) নয়, যে বস্তুত ক-অক্ষর গোমাংস, অথবা আমাদের কোনো একটা যুদ্ধের সময়—কালোবাজারী করে কোটিপতি হয়েছিল, (যেমন সুমন, শংকর, সুনীল) তেমন নয়। সে যদিও মৃত্যুর মতো নিঃসঙ্গ, তবু সে, তুমি, যে কোনো ধাপিতে আড্ডা মারতে পার অথবা যার তার সঙ্গে মাল, মদ্যপান, ইত্যাদি করতে পার। কিন্তু এ জেনো, দেবদূত এত্তেলা পাঠাচ্ছে, (আনন্দময়ীর মাধ্যমে?) তোমাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য, 'একা থাক', এই বাক্যে। কটা চোখের মত নিষ্পন্দ তোমার একাকীত্ব উজ্জ্বল হল তাই। আর লক্ষ লক্ষ চোখের অন্ধকার দিয়ে তৈরি চোখগুলো তোমার বিচার করে, সন্দেহ করে, তোমার পতনের আশায় থাকে, (তোমার ডিপ্রেসনে খুশি হয়), কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি মরুভূমির মতো নিঃসঙ্গতার উপর অর্থাৎ এবং তার মধ্যে নাচবে। চোখ বেঁধে, যদি পার চোখের পাতা বন্ধ করে, চোখ বুজে। কিন্তু কোনো কিছুই—না হাসি, না হাততালি, শুধুমাত্র তোমার নিজের ভাবমূর্তির জন্য নাচা থেকে তোমাকে বিরত করতে পারবে না। তুমি শিল্পী, (দিনপঞ্জী লেখ, জানো যে; দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম ভাষা)—হায়, নিজের চোখের চারপাশে গভীর খাদকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

'নার্সিসাস কি নাচছে?

'কিন্তু এটা বলতে যে ছলনা, অহংকার ও আত্মপ্রেমকে বোঝায় তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা জিনিস। এটা কি মূর্তিমান মৃত্যু? তাহলে একা নাচো।

'কোথায় তোমার ক্ষত, ক্ষতটা কোথায়? (আর কারুর বুঝি আনন্দময়ী থাকে না ও চিরতরে যায় না?) আমি জানতে চাই যে সেই গোপন ক্ষতটা (তোমার স্ত্রীকে দেখিয়েছ? সে জানে?) কোথায় থাকে? কোথায় সে লুকিয়ে থাকে? (আন্ডারগ্রাউন্ডে?)—যেখানে সমস্ত লোক শেলটার নেয়, যেখানে মানুষের অহংকারকে কেউ ছোঁয়, যেখানে কেউ কাউকে দেয়—সেখানে? এই ক্ষত, এতদিনে

টের পাওনি, এই ক্ষত বিবেকের বিচারালয় ?……সবাই এই ক্ষতের কাছে যেতে পারে। এই ক্ষত হয়ে উঠতে পারে, এক ধরণের গোপন ও বেদনা-কাতর হৃদয়।

'আমরা যদি লোভী ও চঞ্চল, চকিত দৃষ্টিসম্পন্ন চলমান নারী বা পুরুষ—সকাল থেকে রাত্রি অবধি যদি কুকুর, পাখি, একটা হাটে হাঁড়ি দেখি—তাহলে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপেই আমাদের কাছে খুব পরিষ্কারভাবে সেই ক্ষতটা উদঘাটিত করবে যার মধ্যে বিপদকালে তারা গুটিয়ে যায়।

'কী বলছি ?

'বলছি, তারা তার মধ্যেই তার দ্বারা (ক্ষত দ্বারা) ব্যক্ত হয়ে আছে। যার রূপটি তারা নিয়েছে। এবং তার জন্যই এই রূপ, নিঃসঙ্গতা। ঐ দেখ সবকিছুই কাঁধের নমনীয়তার মধ্যে। যা দিয়ে তারা নিজেরা যা, তাই করে। তাদের সমস্ত জীবন তাদের মুখের একটা বদমাইশ কুঞ্চনের মধ্য দিয়ে বহে চলে। যার বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে চায় না। এবং করতে পারেও না। কারণ তারা এটার দ্বারাই এই পূর্ণ অথচ অসমঞ্জস নিঃসঙ্গতাকে জানতে পারে। হৃদয়ের এই দুর্গে (তথা আন্ডার গ্রাউন্ডে) ঐ নিঃসঙ্গতাই কেবল পরিণত হতে পারে (প্রেম পরিণত হতে পারে না, তবে মমতা পারে যা আবার নিঃসঙ্গতাকে হাইলাইটে আনতে পারে)। ঐ মাদারি (অর্থাৎ তুমি, লীলাময়ী), যার কথা আমি তোমাকে এতক্ষণ বলছি, তার করুণ চাহনিতে এটা দেখা যায় যে, তা কেবল এক দুঃখী, অবিস্মরণীয় (অথচ অনির্বচনীয়) শৈশবের ছবি ফুটিয়ে তোলে, যে শৈশবেই সে জানত যে, সে পরিত্যক্ত (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারিণী তোমার, কার্যত, সৎমা)।

'এই ক্ষতের মধ্যে, যেটা সারে না, সেটা সে নিজে, (অর্থাৎ নিজেই তাই)। এবং এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাকে দ্রুত ঢুকে যেতে হবে। সেখানেই সে তার শিল্পের (এক্ষণে দিনপঞ্জী লেখার) প্রয়োজনীয় জোর, সাহস ও পটুত্বকে আবিষ্কার করবে।'

'এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, তোমার ও তোমার আনন্দময়ীর মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে। সার্কাসের (তথা জীবনের) নাট্যশাস্ত্র তা দাবি করে। এই খেলা—কবিতা, (আসলে কবিতাই) যুদ্ধে ও ষাঁড়ের লড়াই-এর (লীলা, তথা) নিষ্ঠুর খেলা, যা পুরাকাল থেকে অদ্যাপি চলে আসছে।'

শেষ কথা জাঁ জেনে জানিয়েছেন কাল। কাল আমি শেষ রাত্রে অনুভব করলাম, আমি শুয়ে আছি আনন্দময়ীর ঘরে, পাশে ওঁর মৃতদেহ, মধু ও ঘি মাখানো, আমি সঙ্গম করছি আনন্দময়ীর সঙ্গে, ওঁর মৃতদেহের ছাল ছাড়িয়ে।

তখন শেষকথা জানালেন জাঁ জেনে, '(এতক্ষণ যা বল্লাম তোমাকে) এগুলি হল তোমার প্রতি আমার অপটু ও অপ্রয়োজনীয় উপদেশাবলী। তুমি কেন, কেউই এ-সব অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু আমি এই শিল্প, (জীবন) সম্পর্কে একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম, যার উত্তাপ তোমার (নীল হিম) গাল লাল করে দেবে—এই কেবল আমি

চেয়েছিলাম ঐ কবিতা লিখে। আর কিছু চাইনি। তোমাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছি। দোহাই বিশ্বাস কর, শিক্ষা দিতে নয়।'
আমাকে শীতঘুমে পেল।
শুয়েই থাকি সারাদিন। সারাদিন মেঘে-মেঘে বেলা হয়। বেলা যে পড়ে আসে জলকে চল। জল আমার আনা হয় না। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। চোখের সামনে আনন্দময়ী জ্বলতে থাকে। চিতা বহ্নিমান। চিতাবাঘ ঐ পাহাড়ে ছিল একদা। এখন সে রুমাল মাত্র। নীল রুমাল। হাতছানি দিতে গিয়ে কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়। সে দৃশ্য ডুবে যায় দলে।
এভাবে অতিবাহিত ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯।
১৯৯০-এ পঙ্কজ আসে।
—আপনি শুয়ে আছেন কেন? উঠুন। রোদ্রে ঘুরে আসুন বার্নপুর। রোদ্রে আপনি কেবল অন্ধকার দেখছেন কেন? মনে পড়ে আপনি বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত দেখে অন্ধকার দেখেছিলেন। ৮ মিনিট পর আপনার সূর্য উঠেছিল।··· উঠুন, বেরিয়ে পড়ুন। বন্দুকের নল থেকে একদা আপনার পায়ের বেড়ি ভেঙে চৌচির হয়েছিল। মনে পড়ে?
শুনি আনন্দময়ী, 'শীত ঘুমে একটা ব্ল্যাংকেট লাগে', ক্রমাগত বলছেন। শীতে কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ। ওষ্ঠ। দলিত বুক।
আমি কম্বল ছেড়ে শয্যাত্যাগ করলাম। বিদায় আনন্দময়ী।
দেখি, বাহিরের অন্ধকার রাতে আমি বেরিয়ে পড়েছি শীতের ঘুমের থেকে বিদায় নিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

ডুবল সূর্য ; অন্ধকারে অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ

আমি তাকে পাই না কোথাও। খুঁজি কত। মানচিত্র দেখি। ঠাণ্ডা ভূগোল ক্লাসে কতবার গ্লোব ঘোরাই। গান শুনি। দেখি গানে সে কোনোভাবে জেগে আছে কিনা—নেই, কোথাও নেই।
ছুটে যাই জনসভায়, ভাবি সেখানে দেখা পাই কিনা—পাই না। শুধু তার গন্ধ থাকে। দুধ—মাছ—সরু চালে গন্ধ থাকে। তার পদশব্দ বাজে। পায়ের ছাপ থেকে যায় দেখি মিছিলে। ঐ শুধু। মিছিলেও দেখি না।
মাঝে-মধ্যে স্বপ্নে পাই। ভোরের সেরকম স্বপ্নে কতবার ঘুম থেকে ছুটে যাই রাস্তায়। দেখি প্রথম ট্রাম মুছে যাবার আগে দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।
সে আসে না ॥ □

রূপকল্পের ভেলায় শকরুদ্দিন-দীনদয়ালরা

অশোক মিত্র

যা বলতে চাইছি, তা বলতে গিয়ে প্রতিম্ব অন্বেষণ করি, রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে রূপকল্পে পৌঁছে যাই। তোমার উপমা তুমি, বুদ্ধি এই মন্তব্য করলেও আবেগের তাতে তৃপ্তি নেই, খাঁজে-খাঁজে মনের কন্দরে আঁকা চিত্ররূপের সঙ্গে মিলে যায় এমন শব্দগুঞ্জের সাহায্যে ছবি রচনা কেন সম্ভব হবে না? উপমাই কবিতা, কিংবা রূপকল্পই শিল্প-সর্বস্বতা, এমন উক্তি হয়ত একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তাহলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না অবন ঠাকুরের কেন ছবি লেখার জন্য ভিতর থেকে এত তাগিদ ছিল।

যে-রূপকে বাঙ্ময় করে তুলতে চাই, কল্পনার সাহায্য নিয়ে তাকে তাই পরিস্ফুট করি। কখনো-কখনো উপমার চিত্রণে-ভাস্কর্যে এতটা আত্মহারা হই যে লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে, উপলক্ষই যেন প্রধান, একমাত্র তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যই যেন এত শৈল্পিক আয়োজন। শিল্প কি তবে তার ব্রত থেকে, বৃত্তি থেকে দ্বিরাচারী হল? তা-ও না। শিল্পের মাত্রান্তর ঘটল মাত্র। শিল্প প্রাক-নির্ধারিত পরিধি অতিক্রম করে অন্য-এক পরিভাষায় প্রবেশ করল। যে-মুহূর্তে তা ঘটল, চকিতে বিজলি আলো চোখেতে লাগাল ধাঁধা, এবং অতএব বুদ্ধিবৃত্তি হেরে ঢোল।

সৃষ্টি নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, চিত্রকল্পের সফলতা এই সোজা সত্যটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। যা একদা কুঙ্কুমের মতো ছিল, সূর্যের আলোয় তা কী করে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো হয়ে যায় সেই জাদুর রহস্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াসটাই স্বর্গ থেকে বিদায়ের কাছাকাছি ব্যাপার, বরঞ্চ ধার করা কথা ব্যবহার করে তখন বলা অনেক বেশি যথাযথ: দোহাই, বাক্যসংবরণ করো, ভালবাসো, উপভোগ করো।

কখনো-কখনো অবশ্য উপমা ও উপমেয় জায়গা বদল করে নেয়, শিল্পী-কবি-কর্মী যে-সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টিকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন, উপমা সেই উদ্দেশ্যকে আড়াল তো করেই না, আরো দ্রুততার সঙ্গে তার কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করে। সোমনাথ হোরের 'তেভাগার ডায়েরি' যতবারই, যতক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করি, আমাকে অবাক করে। আজ থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগেকার ধূসর থেকে ধূসরতর হতে যাওয়া অধ্যায়। তখনো দেশ ভাগ হয়নি। গোটা বাংলা দেশ জুড়ে তেভাগা আন্দোলন, যে-মানুষগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত, তাদের হঠাৎ সাহসের পেখম মেলে পৃথিবীতে দাপিয়ে যাওয়া, হয়ত

নিপীড়নের পরিমাপ প্রাত্যন্তিক নিষ্ঠুরতায় পৌঁছে গেলে এমনধারা সাহসের উদ্রেক হয়। এখন রূপকথার মতো মনে হয় তেভাগা আন্দোলনের সেই কাহিনী, গুলতি দিয়ে শিকার করে সে—রূপকথাকে মাটিতে নামানো হয়েছে বলে তরুণ সোমনাথ হোরের কাছেও হয়ত মনে হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগেকার শীতের পৌষে পার্টির নির্দেশে উত্তরবঙ্গে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে যখন তিনি পৌঁছুলেন। সোমনাথ হোর ছবি আঁকেন, স্কেচ করেন, ক্বচিৎ-কখনো সাধারণ কালিতে আঁকা ছবি কাঠখোদাইয়ে রূপান্তরিত করেন। কৃষক সমিতির মানুষগুলিকে দেখছেন, তাদের দুঃখের কাহিনী—তাদের যুদ্ধের কাহিনী শুনছেন, তাদের আশে-পাশে যে-প্রকৃতি পরিবেশ, তাদের যে-গৃহস্থালি অনুভূতি দিয়ে তা গ্রহণ করছেন, ছবিতে তা ফুটিয়ে তুলছেন। কিন্তু চিত্রকরেরও বোধহয় মনের মধ্যে নাড়া দেয়, তাঁরও রূপকল্পের প্রয়োজন দেখা দেয়। সোমনাথ হোর তাঁর চিত্রণের চিত্ররূপ হিসেবে বেছে নিলেন নৈষ্ঠিক দিনলিপি, 'তেভাগার ডায়েরি'। ছবি আঁকছেন, আঁকিবুকি কাটছেন, চোখে-দেখা চরিত্রগুলিকে কালির টানে প্রাণবন্ত করে তুলছেন, কিন্তু পুরোপুরি তৃপ্তি নেই তাতে, ছবি-আঁকাকেও বিকল্প রূপ দিতে হবে, অতএব দিনলিপি।

সোমনাথ হোর লিখিয়ে নন, ছবি-আঁকিয়ে, খানিক-খানিক লিখে ছবির বিষয়বিন্যাসকে উপমায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেখা কথাই ছবির বাড়া হয়ে গেল। ছবিকে ছাড়িয়েই চলে গেল যেন। যেমন, 'শীতের সকালে সাদা কাপড়ে জড়ানো মানুষগুলো ধান কাটছে, পাঁচজন সাতজন একসাথে। কোথাও একটি কালো গরু, কোথাও সাদা ছাগল ; সবাই প্রভাতী আলোর সাথে সাথে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছে—প্রকৃতির কাছ থেকে আহার্যের সন্ধানে'। (পৃষ্ঠা ১৩-১৪) কিংবা যেমন 'এক জায়গায় কয়েকজন মুসলমান জোতদার চেষ্টা করলো মুসলমান আধিয়ার আর হিন্দু আধিয়ারের মধ্যে দাঙ্গা বাধাতে। তাদের বললো—হিন্দু আধিয়াররা যখন ধান কাটতে আসবে, তাদের ঠেকাও। তোমাদের আমরা বেশি ভাগ দেবো। তারা জবাব দিলো—ওসবে আমরা নেই। তখন জোতদাররা এক মেলায় গিয়ে মুসলমান ব্যবসায়ীদের বললো—তোমাদের ঘর আমরা পুড়িয়ে দেবো, ক্ষতি যা হবে তাও পূরণ করবো। তোমরা শুধু বলবে—হিন্দুরা তোমাদের দোকান পুড়িয়েছে। দোকানীরা করজোড়ে বললো—আমরা ওসবে নেই। বেশি জোর করেন তো আজই আমরা দোকানপাট তুলে চলে যাচ্ছি। জোতদাররা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে আপোসের পথ ধরেছে'। (পৃষ্ঠা ১৯)

চিত্রকর ছবি আঁকেন, ছবি আঁকতে গিয়েও যা দৃষ্টান্তিত করেন তা ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান, পরিমিতিবোধ, কোথায় কোন আঁচড় মানানসই হবে-কোথায় হবে না, কোন রঙ কতটা কোথায় ঢালা, রঙ বুলোনোর চেয়ে রঙ না-বুলোনোতেও কখনো-কখনো তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ। সোমনাথ হোর কস্মিনকালেও লেখক নন, সেই তরুণ বয়সেও ছিলেন না, কিন্তু এই দিনলিপি তো তাঁর চিত্রবিকল্প, তাই তাঁর স্থূলে ভুল নেই,

পরিমিতি উপচে পড়ছে, সংক্ষিপ্ততম বাক্যের বন্ধনে সমাজের অঢেল সত্য ব্যক্ত হচ্ছে, নিসর্গও এই পরিমিতির অনুশাসনে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে।

অবন ঠাকুর ছবি লিখতেন, 'তেভাগার ডায়েরি'তে সোমনাথ হোর কথা এঁকেছেন। কাদের কথা ? শকরুদ্দিন-দীনদয়ালদের কথা, যাদের ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ছবিকে গভীরতর চিত্ররূপ দিতে গিয়ে কথার খেয়াঘাটে তাঁর উঠে আসা। অন্য কাজ ফেলে এক মিনিট শুনুন সেই বৃত্তান্ত : 'বাড়ির বেড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ছাউনির খড় পচে গেছে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, মেয়েরা সামনে বেরোতে পারে না কাপড়ের অভাবে, বছরের বহুদিনই দু'বেলা ভাত জোটে না। তবু আশ্চর্য মনের বল। জোতদার কত লোভ দেখালো, কত কাকুতি-মিনতি করলো। কিন্তু শকরুদ্দিন কথার খেলাপ করলো না। মনে পড়ে, আমাদের নিঃস্বার্থ জাতীয় নেতা পণ্ডিত নেহরুর কথা। যখনই লাখ টাকার তোড়া হাতে পড়ে, ভুলে যান মজুতদারদের ফাঁসিতে লটকানোর শপথ, যখনই সোনায় রুপোয় ওজন করার কথা ওঠে, ভুলে যান দেশীয় রাজাদের উচ্ছেদের শপথ। সে যাই হোক, পণ্ডিতজী নিঃস্বার্থ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, কারণ তিনি মহান নেতা। আর শকরুদ্দিন হয় দেশদ্রোহী কম্যুনিস্টদের দালাল, নয় কিষাণ গুণ্ডা, কারণ ঘুষে তার মন মজে না। দাবি করেই আদায় করতে চায়।' (পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬)

সোমনাথ হোরের ছবিকে হারিয়ে দিয়েছে ছবির রূপকল্প। সোমনাথ হোরের লেখা কথার বুনোন। খেতে না-পাওয়া জিরজিরে চেহারার এই আধিয়ারের দল, আর তাদের ঘরের বৌ-ঝিরা, 'তেভাগার ডায়েরি'র চিত্রণে নয়, লিখনে তাদের সমস্যাসুদ্ধু, তাদের সংগ্রামের নিঙরোনো ওজস্‌সুদ্ধু মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। রূপকল্পের জাদুকে সনম্র, সবিস্ময় নমস্কার জানাই আমরা। সেই সঙ্গে সোমনাথ হোরের কবুলতির সঙ্গে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে নিজেদের সঞ্চিত পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করি : 'দীনদয়াল শকরুদ্দিন, তোমাদের দুঃখ আমরা বুঝি, কিন্তু প্রতিদিনের সেই দুঃখ ভোগ করি না। এই দুইয়ে ফারাক খুব বেশি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমাদের কাছে শূন্যগর্ভ মনে হলে নালিশ করার মতো কিছু থাকবে না। কৈফিয়তও খাটবে না।' (পৃষ্ঠা ১৩)

তেমন-তেমন হৃদয়তা থাকলে শকরুদ্দিন দীনদয়ালরাও চিত্রের বিষয় হতে পারে, চিত্র এবং চিত্রকল্পকে মিশিয়ে দিতে, মিলিয়ে দিতে পারে তারা। অর্থাৎ যিনি মেলানোর দায়িত্বে তাঁর যদি সেই হৃদয়তা থাকে। ☐

তেভাগার ডায়েরি। সোমনাথ হোর। সুবর্ণরেখা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১। মূল্য : ২৫.০০ টাকা।

With best compliments from :

THE KRISHI FIRM

Shyamnagar (Near Rly. Station)
24, Parganas (North)
Phone : 92-2503

বিদ্যাসাগরের যে ছবিটির সঙ্গে, যে মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সেখানে একটি প্রকাণ্ড মাথা ছাড়া আর কিছুই নেই। সাতের দশক ছুটে এসেছিল এই মাথাটি লক্ষ করে। অজস্র কোপ পড়ে আকাশ-ছোঁয়া মাথাটির উপর। তারপর অনেকদিন কেটে গেল। ভাঙা মূর্তির পায়ের কাছে নিশব্দে পুষ্পস্তবক রেখে আসাই এখন স্বাভাবিক। এই রচনাগুচ্ছ পুষ্পস্তবকেরই বিকল্প।

আমন্ত্রিত লেখকরা সাতের দশকের বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উনিশ শতকের মনীষীদের বিরুদ্ধে সেদিনের খড়্গরূপী প্রশ্নচিহ্ন সম্পর্কে তাঁরা যে শুধুই অনুতাপদগ্ধ এমন নয়, তাঁদের শ্রদ্ধাও নয় একমাত্রিক।

তাই এই পুষ্পস্তবক বহুবর্ণরঞ্জিতও বটে।

মূর্তি ভাঙার অভিযান

মূর্তি ভাঙার আন্দোলন শুরু হল ১৯৭০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রান্তে এর সূচনা। তারপর অত্যন্ত দ্রুত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারের কিছু শহরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। এর ঢেউ পাঞ্জাবেও পৌঁছেছিল।

এই আন্দোলন যুব-ছাত্ররাই শুরু করেছিলেন এবং তাঁরাই পরিচালনা করেছিলেন। এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন সি. পি. আই. (এম-এল) নেতৃত্ব এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন। প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, গ্রামাঞ্চলে যখন কৃষকের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ শাসিত সমাজের ভিতকে জীর্ণ করছে তখন তার প্রভাবে জেগে উঠে এই সমাজের উপরি-কাঠামোকে যুব-ছাত্ররা সঠিকভাবেই আঘাত করছেন।

এই অভিযানের প্রথম লক্ষ্যবস্তু ছিল গান্ধী। তারপর জওহরলাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা। ক্রমশ 'বাংলার নবজাগরণ' নামে কথিত আন্দোলন ও তার নায়কদের বিরুদ্ধেও এই অভিযান পরিচালিত হয়।

এইসব ব্যক্তিদের মূর্তি শ্রেণীসংগ্রাম-নিরপেক্ষ নয়। মূর্তির সঙ্গে ছড়িয়ে আছে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতি। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরা তাদের প্রশ্রয়পুষ্ট ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সহযোগিতায়, শিক্ষাব্যবস্থা ও বিরাট বিপুল প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে নানা মিথ্যার উপকরণ দিয়ে গান্ধী ও জওহরলালের মূর্তি রচনা করেছে এবং সর্বত্র সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছে। উদ্দেশ্য, গান্ধী-জওহরলালের মূর্তির মাধ্যমে তাঁদের রাজনীতি জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে থাকুক। তাই মূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও মূর্তিভাঙার লড়াই দুই রাজনীতির লড়াই—প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতির সংগ্রাম।

কী ছিল গান্ধী-জওহরলালের রাজনীতি? এই রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ চায়নি, চেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীদের শাসন। এই রাজনীতি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মেকি সংগ্রামের আওয়াজ তুলেছে কিন্তু জনগণকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়নি। তার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের ও তার দেশীয় অনুচরদের শাসন ও শোষণকে দৃঢ় করেছে, জনগণের সংগ্রামকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির অভাবের জন্যই তাঁদের বিভিন্ন কৌশল সফল হয়েছে। তাঁদের মূর্তিভাঙা ছাড়া অর্থাৎ তাঁদের রাজনীতির স্বরূপ স্পষ্ট করে উদ্ঘাটন করা ছাড়া জনগণের মুক্তিসংগ্রাম কোনোদিন জয়ী হবে না।

মূর্তি নিয়ে জালিয়াতিও চলে। লেনিন বলেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবীনেতা ও চিন্তানায়কদের শিক্ষা থেকে তার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে মুছে দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের মূর্তিকে কাজে লাগায়। চতুর সংশোধনবাদীরা সেই কাজই করছে। বামফ্রন্ট কম্প্রাডর-শ্রেষ্ঠ স্যার বদরিদাস গোয়েঙ্কা ও হরিরাম গোয়েঙ্কার পূর্ণ-অবয়ব মূর্তির পাশে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মূর্তি স্থাপন করেছে,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেনিনের, গান্ধী-জওহরলালের অনতিদূরে হো-চি-মিনের। জ্যোতি বসুর বহুদিনের সুহৃদ কম্প্রাডর অনাদিলাল পোদ্দারের স্মৃতিকে অমরত্ব দেবার উদ্দেশ্যে অনাদিলাল পোদ্দার সরণি দেখা দিয়েছে, তার অল্প দূরে হো-চি-মিন সরণি। এমনিভাবে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চিন্তানায়ক ও নেতাদের সহাবস্থান ঘটিয়েছে। এই সহাবস্থান তাদের রাজনীতির চরিত্রকে তুলে ধরে। যখন তারা গোয়েঙ্কা-বিড়লা-টাটাদের পদতলে আশ্রয় নিয়েছে তখন মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের নাম গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাদের নিজেদের মূর্তি-রক্ষার তাগিদে। এরাই কিছুদিন আগে জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণকে কলকাতার জন্মলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় এই শহরের ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব মহা ঘটা করে পালন করেছে। যে বণিকের মানদণ্ড শীঘ্রই এই উপমহাদেশে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল তার আবির্ভাবকে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সূচনাকে, গৌরবে ভূষিত করতে লজ্জাবোধ করল না। আপাতত আমরা মূর্তি নিয়ে এই জালিয়াতির প্রসঙ্গে যাব না।

১৯৭০-এর সংগ্রাম-মুখর দিনগুলিতে যুব-ছাত্ররা তাঁদের অভিযান পরিচালনা করে-ছিলেন। তখন দেশে বিপ্লবী-সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। নকশালবাড়ীর পর শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। ভিয়েতনাম প্রভৃতি নানাদেশে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে-আঘাতে বিপর্যস্ত করছে। চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির নতুন মূল্যায়ন করছে। আমাদের দেশের সংগ্রাম এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে যুব-ছাত্ররা শুরু করলেন নয়াগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন। রাজনীতি সংস্কৃতি জগতের নায়কদের বিচারে তাঁদের মাপকাঠি হল—এঁরা কোন পক্ষে ছিলেন : সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, না পক্ষে ? যাঁদের যুব-ছাত্ররা মনে করেছেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শিবিরভুক্ত লোক তাঁদের মূর্তি তারা ভেঙেছেন, তাঁদের ছবি তারা ছিঁড়েছেন বা পুড়িয়েছেন—মূর্তিভাঙার উৎসব করেছেন। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রথম ব্যাপক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যেহেতু মূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার প্রশ্ন, বিপ্লবী পথের প্রশ্ন, তাই অনেক মূর্তি অবশ্যই ভাঙতে হবে। ইঁট-কাঠ-পাথরের মূর্তি ভাঙা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে সুকৌশলে ও নানা মোহ দিয়ে ঘিরে যে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, তাকে ভাঙা, তাকে জনগণের মন থেকে উৎপাটিত করা, অত সহজ নয়। বলপ্রয়োগ করে তা সম্ভব নয়, দ্রুত তা সম্পন্ন হবে না। তার জন্য প্রয়োজন গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, যুক্তি ও আলোচনা, এবং তথ্য ও যুক্তি সমৃদ্ধ নিরন্তর প্রচার। মূল কথা, মিথ্যার রঙিন আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে মূর্তিগুলির আসল স্বরূপ নগ্ন করে

দেখানো। তবেই চেতনার মান উন্নীত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর হতে পারে। যে রাজনৈতিক নেতারা মুৎসুদ্দি বড় বুর্জোয়ার স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে এই উপমহাদেশ এবং বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করেছে, একাধিক কোটি মানুষকে ছিন্নমূল করেছে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বীভৎস মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে, তাদের স্বরূপ যখন উদ্ঘাটিত হবে তখন জনগণ শিউরে উঠবেন ও মূর্তি-গুলোকে মন থেকে উপড়ে ফেলে দেবেন বিনা দ্বিধায়।

গান্ধী-জওহরলালরা শুধু নয়, 'বাংলার নবজাগরণ' বলে যে গালভরা কথা প্রচলিত হয়েছিল তাকেও যুব-ছাত্রদের অভিযান রূঢ় আঘাত করে গেছে। ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী বন্দর কলকাতায় ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে শাসকদের পদলেহী দুই শ্রেণীর—নতুন জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীরা ইংরাজ-দের শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ রূপে গণ্য করত। যাদের স্বার্থ ছিল জনগণের স্বার্থবিরোধী সেই শ্রেণীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনগণের জীবনকে স্পর্শ করেনি, জাগরণ তো দূরের কথা। বিনয় ঘোষের মতো ব্যক্তি যিনি 'বাংলার নবজাগৃতি' নিয়ে তাঁর প্রায় সমগ্র গবেষক জীবন ব্যয় করে গেছেন তিনিও যুব-ছাত্রদের এই অভিযানের প্রেরণায় 'বাংলার নবজাগরণ' আন্দোলনকে শ্রেণীদৃষ্টিতে দেখে নতুন মূল্যায়ন শুরু করেছিলেন।

স্বল্প সময়ের মধ্যে যুব-ছাত্ররা বহু প্রশ্ন তুলেছিলেন, সব প্রশ্নের সমাধান তাঁরা দিতে পারেননি এবং দেওয়া সম্ভবও ছিল না। তাঁদের আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ও আক্রমণের কিছু-কিছু লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে—যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—সঙ্গত প্রশ্ন আছে।

কিন্তু রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি সমাজের উপরি-কাঠামোর প্রতি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের আন্দোলন shock therapy-র কাজ করে গেছে। তাঁরা সজোরে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রাম নিরপেক্ষ নয়; প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরা যেমন তাকে নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করে তেমনই প্রগতিশীল শ্রেণীদেরও তাকে ব্যবহার করতে হবে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিচার করে, পুনর্মূল্যায়ন করে; যা প্রতিক্রিয়াশীল তাকে নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে, মিথ্যার আবর্জনা সরিয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে হবে যে সংস্কৃতি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ও সমাজের অন্য প্রগতিশীল অংশের স্বার্থের অনুকূল হবে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্য করবে। এতেই মূর্তি ভাঙার অভিযানের স্থায়ী মূল্য।

সুনীতিকুমার ঘোষ

ভাঙা না-গড়া

৬৭-৬৮ সালে আমরা তখনও ছাত্রছাত্রী। স্বপ্ন দেখছি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য খুব বড় কিছু করবার। সবে বড় হয়ে উঠতে চারপাশে যে সমাজকে দেখছি তা নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং মিথ্যাপূর্ণ। ঘা খেয়ে বারেবারে বুঝছি সমাজের বড়রা যা আমাদের বলেছেন তা নিজেরা বিশ্বাস করেননি, যা নিজেরা করেছেন তা বলেননি, এমনকি, তাঁদের বলা কথা আমরা যখন বিশ্বাসে পালন করতে গেছি তখন বাধা পেয়েছি তাঁদেরই কাছ থেকে। 'জানো তো জর্জ ওয়াশিংটন একবার ছোটবেলায় কুড়ুল দিয়ে—' থেকে আরম্ভ করে।

আর তখনই, নতুন ভাবনাচিন্তার ঝড়ের বাতাসে এক-এক করে ভেঙে পড়ছে প্রাচীর। বিধিনিষেধের। বিচারবিহীন বাধ্যতার। 'সব কিছুকেই প্রশ্ন করো' এই ভাবনা সামনে উড়ছে পতাকার মতো। সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকা চিন্তার ওপর আছড়ে পড়ছে ঢেউ—'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যানধারণা হচ্ছে এক ক্ষয়িষ্ণুশ্রেণীর ধ্যানধারণা। তা বিপ্লবকে পিছিয়ে দেয়। মধ্যবিত্তের সমস্ত মূল্যবোধকে বিচার কর শ্রেণীসংগ্রামের কষ্টিপাথরে, কৃষকশ্রমিকের লড়াইয়ের মাপকাঠি দিয়ে। পুরনো যে সব ব্যক্তিত্বকে আমাদের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তারা শাসক ব্রিটিশরাজের পেটোয়া ছিল বলেই সামনে আসতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে আসলে শ্রমিক-কৃষকের রক্তে পালিত এক পরজীবী শ্রেণী। এদের মূর্তি ভেঙে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই পুরনো পচা সমাজের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম আঘাত হানব। এইসব মূর্তি যাদের তারা কেউ ভারতের শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু ছিল না। ভারতের শ্রমিক-কৃষকের তরফ থেকে নতুন ইতিহাস লেখা আরম্ভ হবে। পুরনো প্রতীককে আঘাত করাই তার প্রথম ধাপ। এইসব যুক্তি ও আবেগের মধ্য দিয়ে চিন্তা গড়ে ওঠে মূর্তিভাঙার স্বপক্ষে। যখন প্রশ্ন উঠল বিদ্যাসাগরের, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের, তখন মনের মধ্যে ক্ষণিক দ্বিধা এসেছিল। কেন বিদ্যাসাগরও? বিদ্যাসাগর তো ভালবাসতেন নিজের গ্রামের মানুষদের? সব দুঃখী অসহায় মানুষদের? তিনি তো চেয়েছিলেন মানুষকে শিক্ষিত করতে? কোনো ধার্মিকবাণী প্রচার না করা বিদ্যাজীবন এই লোকটি সম্পর্কে মনের মধ্যে কোথাও যেন এক ব্যক্তিগত ভালবাসা ছিল।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও যুক্তি ছিল যথেষ্ট—ভালবাসতেন গ্রামের মানুষদের? ভালবাসা বলে ওকে? ও হচ্ছে গরিব লোকদের প্রতি 'ভদ্রলোক'দের করুণাময় কম্বল বিতরণ। বিদ্যাসাগর যে 'দুঃখী অসহায়দের জন্য' সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন তারাও মধ্যবিত্তশ্রেণীরই লোকজন। বাঙালি ছেলেদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা তো ইংরেজের অফিসে কেরানি সরবরাহ করবার জন্য। বিদ্যাসাগরের জনদ্রোহিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—সিপাহীবিদ্রোহ দমনের জন্য যে ব্রিটিশ-অধীন সেনাবাহিনী আসে

তাদের অন্যতম আবাস হয়েছিল সংস্কৃত কলেজের বাড়ি, যে কলেজে বিদ্যাসাগর তখন প্রিন্সিপাল।

এইসব যুক্তি ছাড়াও সেই বিশেষ মূর্তিভাঙা বা অন্য কাজ সমর্থনের ক্ষেত্রে অন্য আরেকটা মানসিক কারণও ছিল, আজ যে কথা সমস্ত লজ্জা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতেই হবে, সেই কারণটি ব্যক্তিগত ভীরুতা। আমি জানি না, সেই সংকটে কি আমি একাই ছিলাম? সংগঠনের প্রতি, নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসায়-আগ্রহে আমি জোরের সঙ্গে প্রশ্ন তুলতে ভয় পেয়েছি। পাছে আমার দ্বিধা মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক ভীতু শ্রেণীচরিত্র হয়! এইসব ব্যক্তিগত ভালবাসা, ব্যক্তিগত দ্বিধা বা প্রশ্ন যদি বিপ্লববিমুখীনতার সূচক হয়!

তারপর দিন পার হয়েছে অনেক। ভেঙেছে আরও অনেক কিছু। ভিতরে এবং বাইরেও। আজও আমি মনে করি না মূলগতভাবে কোনো ভুল করেছিলাম আমরা। নিজেদের ছোটছোট স্বার্থবৃত্তকে না ভাঙলে কোনো আদর্শের দিকে যেতে পারে না মানুষ। নিজেদের ছোটছোট ব্যক্তিপরিচয়কে মানবজাতির প্রেক্ষাপটে স্থিত করে দেখতে না পারলে বোধ করা যায় না ইতিহাসের চলমান ধারাকে। আর, কোনো লোভ, স্বার্থচিন্তা ফাঁকি দেবার ইচ্ছা ছিল না। সেই কয়েকসহস্র সাহসী ছেলেমেয়ের মধ্যে যারা মানুষকে ভালবেসে, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যাবার শপথ নিয়ে এগিয়েছিল।

আজ যখন সেদিনের লড়াইয়ের ধরন কিংবা ধ্যানধারণা থেকে প্রায় কুড়ি বছরের দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছি তখন স্বভাবতই সেই আন্দোলনকে, বিক্ষোভের সেইসব প্রকাশকে দেখতে পাই আরও অনেক বড় প্রেক্ষাপটে, আরও অভিজ্ঞতা ও পরিণত চিন্তার আলোতে। এখানে আজ আর আমি যুক্ত নই কোনো সংঘে, হয়ত এসব আমার ব্যক্তিগত চিন্তা। যে জীবনের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছি, পেরিয়ে চলেছি যাকে, তাকে আমার নিজের মতো করে বোঝা। সেখানে মনে হয়েছে প্রত্যেক দেশেরই থাকে নিজস্ব ইতিহাস, তার বেড়ে উঠবার, গড়ে উঠবার নিজস্ব ধরন। উৎপাদন উপাদানের লভ্যতা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা সহ আরও বহু জিনিসের মিশ্র জটিল ক্রমপরিণতিই এক একটি দেশের ইতিহাসকে, সমাজ-কাঠামোকে গঠন করে। বাস্তবকে স্বীকার করে নিলে তাই দেখব প্রতিটি দেশের ইতিহাসই আলাদা-আলাদা। আলাদা উৎপাদন কাঠামো, আলাদা সামাজিক বুনন, রীতিনীতি আচার সংস্কৃতি—সব। তাই কোনো একদেশের সমাজ বা রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের কার্যক্রম অন্য দেশে টায়টায় বসে যাবে না। আমাদের সমাজকে পরিবর্তিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরই মেধা, চিন্তাশক্তি ও পরিশ্রম প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের বাস্তব ইতিহাসকে যথসাধ্য প্রামাণ্য নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্তভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব সময় ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। দেশের সাধারণ পরিশ্রমী মানুষজন যাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশের ইতিহাসকে গঠন ও বহন করেন, তাঁদের কাছ থেকে শেখবার জন্য সত্যিকারের

আগ্রহ ও সজাগতা থাকতে হবে। আগে আমরা ভাবতাম অন্তত আমার কাছে সেরকমই প্রতিভাত হয়েছিল, যে আমাদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষদের শেখানো বা বোঝানো। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন গণআন্দোলনের কাছ থেকে দেখে আমার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যাঁদের আমরা জনসাধারণ বলি তাঁরা নিজেদের সমস্যা ও তার উৎসগুলিকে প্রায়ই সঠিকভাবে জানেন। যদি কোনো বস্তু, সংগঠন বা ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক বা জনবিরোধী বলে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ মানুষের চিন্তা ও সমস্যাকেই সেক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যারা সচেতনে নিজেদের 'মধ্যবিত্তমানসিকতা'কে উপহাস করি অথচ মনের ভেতরে-ভেতরে নিজেদের চিন্তা ও বিচারকে প্রাধান্য দিই, তাদের ভাবনাকে নয়। বিধিলিঙে কথা বলবার অসুবিধা এই, সহজেই সরল বাক্যকে ডকট্রিনেশান মনে হতে পারে। যে সব কথা বলছি তা কোনো অনুশাসন নয়, আমার নিজের ভাবনার মধ্যে সমস্যাসমূহের ভাঙাগড়া এরকম চেহারা নিয়ে এসেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিদ্যাসাগর, হোসেন শাহ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, উইলিয়ম কেরি বা পঞ্চানন কর্মকার —এঁরা দেশের ইতিহাসের অংশ। কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করবার সময়ে তাঁর কাল, সে কালের সামাজিক অবস্থা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি নজর রাখতে হয়, একথা সকলেই জানেন।

মূর্তিভাঙার আন্দোলন ছিল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী আন্দোলন এবং তা ছিল সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরই ধরনে। অন্যায় ছিল না সেই মূল চিন্তায়। প্রশ্ন তোলা জরুরি ছিল, স্থিতাবস্থা ভাঙবার জন্য জোরে ধাক্কা দেওয়া জরুরি ছিল। এমনকি জোর আঘাত না এলে একথাও জানা যায় না কোনো বস্তুর সত্যতা বা স্থায়িত্ব প্রকৃতই ঘাতসহ। আমাদের সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপস্থিতি এক বাস্তব সত্য এবং আমাদের মতো দেশে যেখানে খুব কম মানুষই শিক্ষার সুযোগ পান, সেখানে সুস্থ চিন্তা অর্জন ও প্রচারের জন্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদি তার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করা হয়। আজ আমার মনে হয় বিশেষ কোনো মূর্তি ভেঙে ফেলবার মতো প্রতীকী কাজের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তোলা। নানাস্তরের যত বেশি সম্ভব মানুষকে জড়ানো হোক সেই বিতর্কে। এইসব বিতর্ককে যদি সত্যিই খোলাখুলি ও ব্যাপক করে তোলা যায় তাহলে কমে যাবে মূর্তি গড়ার প্রয়োজনীয়তা।

জয়া মিত্র

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মূর্তি ভাঙা

সাল সত্তর। সেইসময় আমি জেলে। জেলের ভেতরে বসে বাইরের আন্দোলনের খবর পাই। একদিন শুনলাম হাওড়ায় আমাদের পার্টি, সি. পি. আই. (এম-এল)-র ছেলেরা গান্ধীর মূর্তিতে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। তারপর কলকাতায় এবং অন্যান্য জেলায় একের পর এক মহাপুরুষদের (যাঁদের আমরা তাই জানতাম) মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ হচ্ছে। প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেছিলাম। কী-ই বা বয়স তখন আমার। সমাজের ভাল করব সমাজকে বদলাব এই সদিচ্ছা নিয়েই আন্দোলনে এসেছিলাম। বিপ্লব সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা—কিছুটা শুনে, কিছুটা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এক বিশাল প্রত্যাশা। সেই সময় যে দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে দেখেছি—সেই দুটি আমার চিন্তায় প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ। তাই সি. পি. আই. (এম-এল)-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। এই আনুগত্যের জন্যই মূর্তি ভাঙার কাজকে সমর্থন করলাম। কিন্তু মনে যে প্রশ্ন ছিল না তা নয়। ওখানে বসেই ভাবলাম মানুষজন আমাদের কাজকে ঠিকমতো নেবে তো ? গোপনে পার্টির যে কাগজপত্র দেখলাম, তাতে ছেলেদের কাজকে সমর্থন জানানো হয়েছে। পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সেই নেতৃত্ব যখন সমর্থন জানাচ্ছে তাহলে এই কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আর কোনো সংশয় রইল না।

আর কোনো মূর্তি ভাঙার সময় মন চঞ্চল হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেলায় স্বাভাবিক ভাবেই মনে হল এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো ? তখন পার্টির কাগজেই মূল্যায়ন দেখতে পেলাম। একটা ব্যাখ্যা পেলাম : উনি সংস্কৃত কলেজে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আসলে এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র। সেই অল্পবয়সে এটা মেনে নিয়ে সমর্থন জানালেও পরবর্তীতে বারবার মনে হয়েছে আমাদের অন্যায় না হলেও খুব ভুল হয়ে গেছে।
পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্যই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক কথাগুলো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও বলতে ভয় পেয়েছি। যে পার্টি সাধারণ মানুষের মঙ্গল করবে, যে পার্টির জন্য জেলজীবন, যে পার্টির জন্য আমার পাশের বন্ধুরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানাব এমন সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।

আজ যেমন অনায়াসেই বলতে পারি একটা মানুষকে তাঁর সময়ের নিরিখেই বিচার করতে হয়। ১৯৭০-এ বসে বিদ্যাসাগরের সময়টাকে বুঝতে হবে। বিদ্যাসাগরের সময়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট আধুনিকমনা ছিলেন। আমরা তাঁর অন্যান্য কাজকে না দেখে একটা কাজই দেখেছিলাম। এবং তাতেই তাঁকে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের দালাল বললাম। এই কলঙ্ক লেপনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মুখেই কলঙ্ক লেপন করা হল বলে আমার মনে হয়। এই ব্যাপারটা আমরা আরও যাঁদের মূর্তি ভেঙেছি সেইসব মনীষীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

আর একটা কথা আমার মনে হয়। সাধারণ মানুষের চিন্তাকে উন্নত না করে যে কোনো

সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভুল। কোনো মানুষ যদি সাধারণ মানুষের বিরোধীও হয় অর্থাৎ যার মূর্তি সত্যিই ভাঙা উচিত সেক্ষেত্রেও জনগণকে সচেতন করা দরকার।
এই কাজ না করার ফলে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা আমরা তাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি।
এসব সত্ত্বেও বলব এই মূর্তি ভাঙার রাজনীতি আমাদের অনেক অজানা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। পুরনো অনেক কিছুকে যাচাই করতে শিখিয়েছিল। যা কোনোদিন আলোচিত হয়নি এইরকম অনেক অজানা তথ্যকে সমাজের কাছে হাজির করতে পেরেছিলাম।

প্রদীপ ধর

নিজেদের মাথা-কাটা

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে একদঙ্গল তরতাজা ছেলেমেয়ে পথ খুঁজতে ঘর ছেড়েছিল। সাহস আর সদিচ্ছাটুকুই ছিল তাদের পাথেয়। সমাজকে বদলানোর জন্যই এই খোঁজা।
যেভাবে সমাজজীবন চলছে সেভাবে চলতে পারে না। পালটাতে হবে সবকিছু। কিন্তু কীভাবে? খুঁজতে-খুঁজতে একদিন হদিশ মিলবেই।
ঠিক এইরকম সময়েই কানে এসে পৌঁছুল চীনের সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের কথা। এই তো পাওয়া গেছে পথ। 'চীনের পথই আমাদের পথ'। সাংস্কৃতিক-বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের তাৎপর্যকে অনুধাবন না করে কয়েকটা কথা বা স্লোগানকে মূলমন্ত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়া হল। 'পুরনোকে না ভাঙলে নতুনকে জানা যাবে না'।
নতুন করে ভাবনা শুরু হল। এতকাল এই সমাজ আমাদের সামনে যে ইমেজ তৈরি করে এসেছে—সেই ইমেজ জনগণের পক্ষে নয়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেশাঁ। যেটা ছিল বাঙলারই রেনেশাঁ। কিন্তু সেই জাগরণ কাদের জাগরণ? একে কি মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণ বললে ভুল বলা হবে? সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বৌদ্ধিক মুক্তি চাই আমরা। ওই জাগরণ হাশেম শেখ বা রামা কৈবর্তের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকি কয়েকশো বছর ধরে পাশাপাশি থাকা মুসলিম সম্প্রদায়কে শামিল করতে পারেনি। আমরা ইতি-নেতি সব এক করে ফেললাম। আর এই একাকারের মধ্য দিয়ে 'কত মূর্তির মাথা পড়ল কাটা' আর আজ এটা ভাবলে আমাদের মাথা-কাটা।
কুশপুত্তলিকা দাহ আর মূর্তিভাঙার চিন্তার মধ্যে অনেক তফাত। কয়েকদিনের একটা আন্দোলন বা সাময়িক বিক্ষোভ থেকে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এবং এই ব্যাপারটা

বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এ ব্যাপারে দায়টা সামান্যই। কিন্তু যখন কোনো মূর্তি বা ইমারত ভাঙা হয় তার পেছনে থাকে চিন্তা। তার দায়ভার অনেক বেশি। যা আমরা আজও বহন করে চলেছি।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মধ্য দিয়ে একটা সময়ের ইমেজকে আমরা ভাঙতে চেয়েছি—একটা সময়কে নাড়া দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়-কালটাকে আমরা ধরতে পারিনি।

বিদ্যাসাগর দেশের সাধারণ মানুষের কথাই ভেবেছিলেন। আর যে সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না সেই সময় নারীদের ওইভাবে মর্যাদা দেওয়া কত সাহসের এবং শৌর্যের পরিচয় ভাবলে আধুনিকমনা মানুষজনকেও লজ্জায় অধোবদন হতে হয় (আমাদের ভালো-মন্দ বোধটা এত কম ছিল—মেয়েরাও এর প্রতিবাদ করিনি)। সৃষ্টি আর ধ্বংস। আমাদের শেষ শব্দটার প্রতিই ছিল বিশেষ অনুরাগ। ধ্বংস করতে-করতে আমরা নিজেদেরও ধ্বংস করেছি।

ঊনবিংশ শতকের রেনেশাঁর প্রতি আমাদের যে অভিযোগ ছিল সেটা আমাদের বেলায়ই বেশি প্রযোজ্য। আমরা যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলাম তাও ছিল একদঙ্গল নগর-জীবনের মধ্যবিত্তদেরই বিপ্লব। হাশেম শেখ-রামা কৈবর্তের ঘর আগুনের হল্কায় ঝলসে গেছে, জীবনধারণে একচুলও পরিবর্তন হয়নি।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মূর্তি গড়া-ভাঙার আলো-আঁধারে বিদ্যাসাগর

সবুজ সেন

মূর্তি গড়া—মূর্তি ভাঙা

মনুষ্যসমাজে মূর্তি নির্মাণ এক প্রাচীন প্রথা। যতদূর জানা যায়, আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মূর্তি নির্মাণের সূত্রপাত। সেযুগের 'ভেনাস', বিশেষত উইলেনডর্ফ এবং ব্র্যাসেম্পাউই (Brassempouy)-এর 'ভেনাস' মূর্তি তো জগদ্বিখ্যাত। তবে সেগুলো ছিল নিছকই প্রতীকধর্মী—উর্বরতার প্রতীক ; প্রজনন-অঙ্গগুলো মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃহৎ। সিন্ধু সভ্যতার যোগী মূর্তি ও মাতৃকা মূর্তিতে দেবত্বগুণ আরোপিত হলেও, সেগুলো অনেকাংশে প্রতীকধর্মী। মাতৃকা মূর্তির যোনিদেশ থেকে নির্গত তরুশাখা তো উর্বরতার চিহ্নই বহন করে। পার্বতীর যোনিদেশে স্থাপিত শিবলিঙ্গও উর্বরতার প্রতীক।

পরবর্তীকালে মূর্তি নির্মিত হতে থাকে দেবত্বকে কেন্দ্র করে। পৌত্তলিকরা যেমন দেব-দেবীর কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করতেন, তেমনই যেসব ব্যক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করা হত তাঁদের মূর্তিও নির্মিত হতো। শুধু ভারতের বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখের মূর্তিই নয়, এমনকি মেরি মাতার ক্রোড়ে যিশুর মূর্তি গীর্জায় স্থান পেত ; আজও আছে। সম্ভবত মধ্যযুগেই প্রথা হিসাবেই রাজা-রাজড়া প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মূর্তি নির্মিত হতে থাকে যা আধুনিক যুগে রীতিমতো রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

মানুষের মূর্তি মানুষই গড়ে, আবার মানুষই ভাঙে। সাম্প্রতিককালে মূর্তি ভাঙার সূত্রপাত ছয়ের দশকের চীনে। সাতের দশকে আমরাও প্রত্যক্ষ করলাম রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ 'প্রতিক্রিয়াবাদী'দের মূর্তি ভাঙার তাণ্ডব। সম্প্রতি পূর্বতন সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে শুরু হয়েছে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের মূর্তি ভাঙার রাজসূয় যজ্ঞ। এমনকি খোদ কলকাতার বুকেই লেনিনের মর্মর মূর্তি কালিমালিপ্ত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মূর্তি যাঁদের স্থাপিত হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকের, বিশেষত রাজনীতিকদের মূর্তি শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যে, প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া হয়। কিন্তু এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও বোধ করি সঙ্গত নয় যে, প্রত্যেক মূর্তির অধিকারীরা ছিলেন শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অনুচর। বরং এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয় যে, ব্যক্তি-বিশেষ স্বীয় প্রতিভাবলে নিজ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে এমন এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন যাকে অবজ্ঞা করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। সেইরূপ মৃত ব্যক্তিকে নিজ পক্ষপুটাশ্রয়ী প্রমাণ করার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী যে তাঁদের মূর্তি

নির্মাণে আগ্রহী হবে এতে আর আশ্চর্য কী! যেসব ব্যক্তি একদা ধনতন্ত্রের সমাধি রচনার জন্য জীবনপাত করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও ধনতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা যে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অর্পণ করেন তাও তো আমরা চোখের সামনেই দেখি!

শাসকশ্রেণীর ভূমিকা থাকুক বা না থাকুক একটা কথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। তা হল যেসব ব্যক্তির (বিদেশী, রাজপুরুষ ব্যতীত) মর্মর মূর্তি আমরা পথে-ঘাটে দেখি, যেভাবেই হোক না কেন তাঁদের একটা ভাবমূর্তি সমাজে গড়ে উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও আছে। আসলে মূর্তি নির্মাণ হল এই ভাবমূর্তিরই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এজাতীয় ব্যক্তিরা প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াপন্থী হলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পথ একটাই—তাঁদের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাঁদের প্রচারিত মতের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম।

আর যাঁরা এই মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে ভীত হন, যাঁদের কাছে মতাদর্শগত সংগ্রামের রসদ থাকে না, তাঁরাই ব্যক্তিবিশেষের ভাবমূর্তিকে আঘাত করার পরিবর্তে পরিকল্পিত-ভাবে আঘাত করেন তাঁদের অস্তিত্বের জড়চিহ্ন—মূর্তিকে। এক কথায় বলা যায় যে, একটি রণকৌশল হিসেবে মূর্তি ভাঙার মূল কারণ হল রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা।* আজ যে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের মূর্তি ভাঙার তাণ্ডব চলছে তাও উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার উলঙ্গ প্রকাশ মাত্র।

একশ দু' বছর আগে মৃত বিদ্যাসাগরের মূর্তি আজও যদি ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে তাহলে বুঝতে হয় যে এখনও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবমূর্তি বাংলায়—দুই বাংলায় —সমুজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁকে কেন্দ্র করে যত সত্য-মিথ্যা কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল তাতে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র-পুত্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' এবং বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিত 'ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক বিচারে অনেক বিষয়ই ধরা পড়ে। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই সমাজে যে তাঁর একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল—এগুলো তারই প্রমাণ। আসলে যেটা বিচার্য, তা হল এই ভাবমূর্তির ভিত্তি কতটা মেকি আর কতটা বাস্তব এবং আজও সমাজে বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের কোনো তাৎপর্য আছে কিনা।

□ ২ □

প্রেক্ষাপট

১৭৯৩—পশ্চিম ইওরোপের ল্যান্ড লর্ডসমূ-এর নিষ্ফল অনুকরণে কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। সৃষ্টি হল নতুন একদল পরগাছা জমিদারশ্রেণীর। এর সঙ্গে আছে ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি-ব্রিটিশ রাজপুরুষদের দেওয়ান। রাজশক্তির প্রযত্নে

*দ্রষ্টব্য—অমল ঘোষ ছদ্মনামে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত 'মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর'।

লালিত-পালিত এইসব নতুন ধনী সম্প্রদায়ের ধন-প্রাচুর্য, বিলাস-ব্যসনে, ইংরেজ-তোষণে উনিশ শতকের নতুন কলকাতা শহর মুখরিত। নতুন রাজা-মহারাজার উদ্ভব তখন প্রায় নিত্য ঘটনা। শোভাবাজারের রাজবাড়ির ভাগ্যোদয় এ বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশক, অবশ্য তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। গোবিন্দপুরে নতুন কেল্লা বানাবার সময় বাস্তুচ্যুত নবকৃষ্ণের পিতার স্থান মিলল সুতানুটির শোভাবাজারে। ক্লাইভের বেনিয়ান লক্ষ্মীকান্ত ধরের কাছে ভাল পারসি জানা নবকৃষ্ণের কেরানির চাকরি প্রাপ্তি। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময় নবকৃষ্ণ উন্নীত হলেন ইংরেজদের হিন্দু মুনশির পদে। আর পলাশির যুদ্ধ জয়ে পরিতৃপ্ত ক্লাইভের কাছ থেকে পারিতোষিক হিসেবে নবকৃষ্ণ প্রথম দফায় পেলেন দশ-হাজারি মনসবদারি এবং 'রাজা বাহাদুর' খেতাব, আর পরের বছর নতুন খেতাব—মহারাজা বাহাদুর। শুধু লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ নয়, ভ্যানসিটার্টের দেওয়ান রামচরণ রায়, ভেরেলস্ট্-এর দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, হেস্টিংস-এর দেওয়ান কান্তবাবু রায়রায়া, রাজা গুরুদাস এবং পরে মহারাজ রাজবল্লভ প্রমুখ প্রত্যেক নব্য ধনীদের ভাগ্যসূর্য একইভাবে উদিত হয়েছিল।

উনিশ শতক শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা বাদ দিলেও, দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ এবং ১৮২৪-এ এক ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা। পরে অবশ্য ১৮২৬-এ গোলদিঘির উত্তরে একই প্রাঙ্গণে দুই কলেজের নতুন বাড়ি। আরবি-ফারসি তখনো চুটিয়ে চলছে। ইংরেজ বণিকদের কাছে চাকরি করার জন্য কমপক্ষে 'ইয়েস স্যার' 'নো স্যার' জানা লোক চাই। আর তার জন্য ছিল বেশ কিছু পাঠশালা গোছের বিদ্যালয় যেখানে ইংরেজি শব্দ এবং সেগুলোর অর্থ মুখস্থ করানো হতো। এরই মধ্যে রামমোহন রায় ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক পত্রে দাবি করে বসলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের। সেই চিঠির প্রতিক্রিয়ায় নাকি অন্য কোনো মতলবে চালু হল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। তার কিছু যে ফল ফলল তার প্রমাণ হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাঁরা প্রত্যেকেই ১৮৩০-৪০-এর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সীমিতভাবে হলেও নতুন শিক্ষা চালু হল। বের হতে লাগল বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। পাঠকও জুটল। কিন্তু বিত্ত আর শিক্ষার পলেস্তারায় চাপা পড়ল না সনাতনী হিন্দু মন। অন্ধকারময়তা, সর্বপ্রকার কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করার নতুন মাত্রা পেল নবার্জিত বিত্তে। বিলাস, মহাসমারোহে পূজা, বুলবুলির লড়াই, বাইজিনাচ, মদ্যপান, বৌবাজারের রূপচাঁদ পক্ষীর গাঁজার আখড়ায় আটকা পড়ল নব্য বিত্তবানরা। যেসব বাংলা পত্র-পত্রিকার প্রকাশ পেতে লাগল সেগুলোতেও অশ্লীলতা ও বিকৃত রুচি পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠকদের মন জয় করার চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম গুরু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা সংকলন করতে গিয়ে লিখলেন, 'সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা

সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।)

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে উনিশ শতকের একটি পত্রিকা—'দুর্জনদমন মহানবমী'-র ১৮৪৭-এর একটি সংখ্যা থেকে একটি পদ্য উদ্ধার করেছেন, যেটির প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ নিয়মমাফিক সাজালে দাঁড়ায় : 'ঈশ্বর গুপ্ত তোর বাপের গালে হা…'।

রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডূকতা, শাস্ত্র নির্দেশিত মতের অলঙ্ঘনীয়তা, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি যেমন উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের একাংশকে গ্রাস করেছিল, তেমনই আবার এরই মধ্যে উত্থিত হল এক নব্য যুব সম্প্রদায়। আধুনিক ভারতের প্রথম আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও ১৮৩১-এ হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হলেও, ডিরোজিওপন্থীরা অতি অল্পকালের মধ্যেই বাংলায় এক ঝড় তুলতে সমর্থ হলেন। গড়ে উঠল 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন—প্রধানত ডিরোজিও-শিষ্য রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকদের একাংশ শামিল হলেন এই আন্দোলনে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-আদর্শ-যুক্তিবাদ—সবকিছুই তাঁদের ছিল। কিন্তু যা ছিল না তা হল সমাজকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই তাঁরা সমাজকে দেখলেন নিজেদের প্রতিবিম্বর মাধ্যমে। রাতারাতি সমাজের সংস্কার চাইলেন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে আঘাত করলেন সমাজকে, অনেকেরই স্বধর্ম ত্যাগ করাকেই সমাজ সংস্কারের পথ বলে ভ্রান্তি জন্মাল। ফলে ঝড় ক্রমশ মন্দীভূত হল—আর 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনকারীরা পরিণত হলেন একজন প্রতিভাবান কিন্তু শিকড়হীন প্রতিবাদীতে। ফলে, তাঁদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ প্রকাশিত অনেক যুক্তিনিষ্ঠ কথা, এমনকি বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও, মানুষ কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করলেন না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজ এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই চলেছে। রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে মানুষের সামনে হাজির হয়েছে—কাজিয়া হয়েছে। তবে ফল বিশেষ একটা কিছু হয়নি। আর এইসব লড়াই সীমাবদ্ধ থেকেছে মধ্যবিত্তের মধ্যে। তা যেমন স্পর্শ করেনি সাধারণ মানুষকে আবার তা সেই পর্যায়ে সম্ভবও ছিল না। আর এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের উদয়!

□ ৩ □

কোন পথে

ঈশ্বরচন্দ্র জমিদারতনয় বা ধনীর দুলাল ছিলেন না। দুর্জয় সাহসী স্পষ্টবক্তা পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সাংসারিক নীচতা সহ্য করতে না পেরে আদি বাসভূমি বনমালিপুর তথা সংসার পরিত্যাগ, অসহায় কিন্তু তেজস্বিনী পিতামহীর প্রথমে পিত্রালয়ে অবস্থান এবং পরে পৃথক কুটিরে প্রধানত স্বোপার্জিত অর্থে ঠাকুরদাসসহ অন্যান্য পুত্র-কন্যার লালন-পালন—ঈশ্বরচন্দ্রের বংশধারার চিত্র কিছুটা প্রকাশ করে। ১৮০৪-০৫ সালে অর্থাভাবে পেতলের থালা-ঘটি ও কিছু পয়সা সম্বল করে ১৪-১৫ বছরের কিশোর ঠাকুরদাসের কলকাতায় আগমন। পরাশ্রয়ে থেকে কিছুটা ইংরেজি শিক্ষা পরে মাসিক দুটাকা বেতনে চাকরিতে যোগদান। পরাশ্রয়ে থেকেই ঠাকুরদাসের মাস মাইনে দুটাকা থেকে শেষ পর্যন্ত দশটাকা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের ন' বছর বয়সে কলকাতায় পদার্পণ, ১৮২৯-এর ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি। এবং অবশেষে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে, গৃহস্থালী কাজকর্ম করে, চাকরিজনিত পরিশ্রমে বিধ্বস্ত ঠাকুরদাসের সাহায্যে ১৮৪১-এর ৪ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে পরিণত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন বাংলা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল'। প্রথমে ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', পরে ডিরোজিও-অনুগামীদের দ্বারা 'লিপি-লিখন সভা' এবং অবশেষে ১৮৩৮-এ 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব সভা-বিতর্ক-লিপি বিনিময়ের মাধ্যমে নব্য যুবকদের মনে জ্ঞানস্পৃহা, যুক্তিস্পৃহা এবং স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা জাগরিত হল। অবস্থাটা এমন এক জায়গায় গিয়ে পোঁছুল যে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন, 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না ; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল ; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।'

আবার যেবছর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন, ঠিক সেইবছরে—১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা রদ করা হল।

সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীনই একই চত্বরে অবস্থিত হিন্দু কলেজে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঈশ্বরচন্দ্র স্বচক্ষে দেখেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'ইয়ং-বেঙ্গল'-এর অনেক সদস্যদের আদব-কায়দা-রীতি-নীতি। তাঁদের জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা—

যুক্তিবাদের প্রতি অনুরাগ বিদ্যাসাগরকে নিশ্চয় আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু সে দলে তিনি যোগ দেননি। আবার অচলায়তন সমাজের রক্ষণশীলতাও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। পণ্ডিতকুলে তাঁর জন্ম। জন্মস্থান বীরসিংহ ও মার মামার বাড়ি পাতুল গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, দুলে-বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের বাল্যসাথীদের অশিক্ষা-জনিত আচরণ, বড়বাজারের দয়েহাটায় আশ্রয়দাতা ভাগবতচরণ সিংহের কন্যা রাইমণি দেবীর বৈধব্যজনিত কষ্ট এবং সর্বোপরি পারিবারিক দারিদ্র তাঁকে সমাজকে চিনতে সাহায্য করেছিল। দারিদ্র-অশিক্ষা-সংস্কার কাকে বলে তা কেতাব পড়ে তাঁকে জানতে হয়নি, নিজের জীবন দিয়েই তিনি জেনেছিলেন। এবং এটাও বুঝেছিলেন সমাজকে অন্ধ বিশ্বাস-কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষ মানুষের যোগ্য সমাদর পাবে না। কিন্তু পথ কোথায় ?

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে দুটি অভিজ্ঞতা খুব স্পষ্ট ছিল। প্রথমত রামমোহনের প্রচেষ্টা এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রকৃতি। ডিইস্ট মতবাদে বিশ্বাসী রামমোহন সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হিসেবে প্রথমে গড়ে তোলেন 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রহ্মসভা' (১৮২৮)। যদিও রামমোহন রচিত 'ট্রাস্টডিড'-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' শব্দটি কোথাও উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরই রামমোহন প্রবর্তিত হিন্দু ধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টা এক নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করে—'ব্রাহ্মধর্ম'। আর কীভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের অনুগামীরা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তা তো বিদ্যাসাগর স্বচক্ষেই দেখেছিলেন।

সেকারণে বিদ্যাসাগর বেছে নিলেন এক নতুন পথ—যে পথে তাঁর আগে আর কেউ হাঁটেননি, এমনকি রামমোহনও নয়। সে পথ হল একদিকে হিন্দু পণ্ডিতের সাজে সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখা, শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা এবং সমাজকে অন্ধতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা, অপরদিকে ধর্ম সম্পর্কে চরম ঔদাসিন্য। এই কারণে ধুতি-চাদর-তালতলার চটি পরিহিত হিন্দু পণ্ডিতের অনেক কথাই বেশ কিছু মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে বাধ্য হতেন। তাঁকে 'খেরেস্তান' বা 'বেম্ম' বলে উপেক্ষা করার রাস্তা তিনি রক্ষণশীলদের সামনে খুলে রাখেননি। এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের বাস্তবজ্ঞানের পরিচয়।

পণ্ডিত বংশের সন্তান ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিল বহুকষ্টে মানুষ করা ঈশ্বরচন্দ্র নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। তাহলে তাঁদের আর গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা হবে না। কিন্তু সমাজ বিকাশের ধারা নিয়ে চলল সম্পূর্ণ অন্য পথে। তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বোধ সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১-এ যোগ দিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে।

শিক্ষা—সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার

সমাজকে সর্বপ্রকার কূপমণ্ডুকতা, অন্ধকারময়তা থেকে উদ্ধার করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বেছে নিলেন শিক্ষাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঁচ বছর চাকরি করার সময় আয়ত্ত করে ফেললেন ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা। ১৮৪৬-এর এপ্রিল থেকে ১৮৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত—এক বছর তিন মাস সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে চাকরি করেই ইস্তফা। এরপর জানুয়ারি, ১৮৫১ থেকে অক্টোবর, ১৮৫৮ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থেকে আবার ইস্তফা। দু-দুবার ইস্তফা—দুবারই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে। আর এই মতানৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করলেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা প্রকাশ পায়।

সীমিত ক্ষমতার অধিকারী সহকারী সম্পাদক বেশি উদ্যোগী হয়ে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। হেতু—শিক্ষা প্রণালীর পুনর্বিন্যাসের জন্য সহকারী সম্পাদকের প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাসংসদে পেশ করার জন্য লিখিত সুপারিশ। কীভাবে হীনম্মন্য এবং অকর্মণ্য রসময়বাবু ঈশ্বরচন্দ্রের এই সুপারিশ শিক্ষাসংসদে পেশ করার ক্ষেত্রে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখানে সে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু দুটি বিষয়, লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের মত ছিল ব্যাকরণ আয়ত্ত করার জন্য দু বছরের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন, 'I have carefully studied the working of the system, and the suggestion made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the western world.'

এই উদ্ধৃতির শেষ কটি লাইন, বিশেষ করে 'such a training' থেকে 'western world'—এই বাক্যাংশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিদ্যাসাগরের মূল শিক্ষাচিন্তা। Vernacular dialects—মাতৃভাষায় শিক্ষাচর্চাই ছিল বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষার মূল কথা। কিন্তু সরাসরি মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার অবস্থা তো তখন ছিল না,—বাংলা ভাষায় বই নেই বললেই চলে, চলনসই গোছের গদ্য লেখার উপযুক্ত লেখক নেই, এমনকি বাংলা গদ্য লেখার রীতিটাই তখন অজ্ঞাত। রামমোহন সর্বপ্রথম অন্বয় প্রথার প্রচলন করলেও, বিদ্যাসাগরের আগে কেউ বাংলা গদ্যে যতিচিহ্ন—কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার করেননি। তাই বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু সেই সংস্কৃত টুলো-পণ্ডিতদের সংস্কৃত নয়, এমন সংস্কৃত যা সহজবোধ্য এবং সহজসাধ্য। সংস্কৃত ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্য ভাঙার জন্যই বিদাসাগরকে রচনা করতে হয়েছিল—'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। সে অবশ্য পরের কথা। এই সুপারিশে

লিপিবদ্ধ বিদ্যাসাগরের এই মতটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, মাতৃভাষাকে 'বিজ্ঞান এবং পশ্চিমী দুনিয়ার সভ্যতা'-র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শিক্ষক জীবনে তাঁকে ঘুরে ফিরে এই কথাগুলোয় বার-বার ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ বিদ্যাসাগর জানতেন যে, ইংরেজরা বিদেশি প্রভু হোক, দেশকে লুটেপুটে খাক, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো জাত নেই। বিষাক্ত পরিবেশে নিমজ্জমান মানুষকে উদ্ধারের জন্য চাই সতেজ বাতাস আর আলো। আর সেযুগে তা যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই বহন করতে পারত—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

১৮৫১-তে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলেন, তখন তিনি আরও পরিণত। কিন্তু শিক্ষাচিন্তার মূলগত কোনো পার্থক্য ঘটেনি। ১৮৫২-র ১২ এপ্রিল হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর প্রণয়ন করলেন 'Notes on the Sanskrit College'। উদ্দেশ্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার। এবারের সুপারিশ অবশ্য আরও সুচিন্তিত, আরও পরিণত। তৎকালীন বাংলায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রতিবেদনের প্রথমেই বললেন :

'The creation of an enlightened Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendance of Education in Bengal.'

আবার সেই মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা। যেকোনো ভাষায় বিদ্যাচর্চার তিনটি অপরিহার্য শর্ত হল—শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে উপযোগী করে তোলা। শিক্ষাদানের উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন। বিদ্যাসাগর আজীবন এই তিনটি শর্ত পূরণের চেষ্টা করেছেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩-তে লিখিত একটি পত্রে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা এফ. জে. ময়েটকে ঈশ্বরচন্দ্র জানান :

'What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of the country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanskrit College should be directed.'

তালতলার চটি-পরিহিত হিন্দু পণ্ডিতের কী দূরদৃষ্টি! সংস্কারমুক্ত এবং প্রাঞ্জল

বাংলা ভাষায় লেখার উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং নানারকম উপায় উদ্ভাবন। ছাত্রদের মন সংস্কারমুক্ত করার জন্য ২৫ জুলাই, ১৮৫১, তিনি প্রস্তাব করলেন প্রত্যেক অষ্টমী এবং প্রতিপদের ছুটি বাতিল করে কেবলমাত্র প্রতি রবিবার কলেজ বন্ধ রাখার জন্য। অবশ্য তারও আগে ওই বছরই ২৮ মার্চ তিনি তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তাকে জানালেন :

'I see no objection to the admission of other castes than Bramans and Vaidyas or, in other words, different orders of Shudras, to the Sanskrit College.' (*Unpublished Letters of Vidyasagar*, ed. Arabinda Guha, pp. 5-6)

অবশ্য তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন যেখানে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এক ঝটকায় সকল 'শূদ্র'-র জন্য দ্বার খুলে দিলে সমাজে তুমুল হৈ-চৈ বেধে যাবে। তাই তিনি বললেন—আপাতত শুধু কায়স্থদেরই নেওয়া হোক। তাতেই দেখা গেল কয়েকজন অধ্যাপক এই ব্যবস্থার লিখিত প্রতিবাদ করলেন। (ওই পৃ. ৭-১০)

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক কীভাবে গড়ে তোলা যাবে তার ছক বিদ্যাসাগরের প্রাগুক্ত 'নোটস'-এ আছে—২ থেকে ৫নং অনুচ্ছেদে। এগুলোর মূল কথা একটাই—সংস্কৃত ভাষা এবং ইওরোপীয় আকর থেকে আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুসমন্বয় ; মোদ্দা কথা আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা। তা নাহলে সংস্কৃতের মতোই শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় কুলপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আজকাল দেওয়াল-লিখন দেখা যায়—'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব'। বিপ্লবের ধারণা বিদ্যাসাগরের মনোজগতে কিঞ্চিৎ স্থানও দখল করেছিল—এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রত্যয় ছিল যে শিক্ষা চেতনা আনে এবং চেতনাই জনসাধারণকে সর্বপ্রকার অন্ধকারময়তা থেকে মুক্ত করতে পারে।

কর্মোদ্যোগী ঈশ্বরচন্দ্র কে কবে বাংলা ভাষায় বই লিখবে, তার জন্য বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তিনি নিজেই একাজে নেমে পড়লেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে তিনি খান দশেক পাঠ্যপুস্তক বাংলায় লিখে ফেললেন। লেখা হল পরিকল্পনামাফিক —বিদ্যার্থীর বয়স ও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'He is only a Primer maker'। যতই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করুন, কথাটা তো মিথ্যে নয়। সেসময় তো 'Primer maker' -এরই প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর একাজে হাত না দিলে, বাংলা ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব হতো ?

বিদ্যাসাগর যেসব পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন, সেগুলোর মূল্যায়ন নতুন করে না করে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মতামত উদ্ধৃত করাই বোধ করি যথেষ্ট :

'এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—তখনো আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান (পেডাগোজিকস)

গড়ে ওঠেনি ; শিক্ষামনোবিজ্ঞানও ছিল অজ্ঞাত। এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ চেয়েছিলেন দেশটাকে ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে ঐহিক পৃথিবীতে, বাস্তব জগতে দাঁড় করাতে। তিনি তাই অপার্থিব ও পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াও মাড়াননি—এমনকি, অনেকটা ঐ কারণেই 'আখ্যানমঞ্জরী'তে ভারতীয়দেরও কারও কথা নেই। এ অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু তখন যে প্রাণের দায়—স্বপ্ন দেখার, কল্পনাপ্রশ্রয়ের সময় তা নয়। ('প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর,' পৃ. ২৫)

'বোধোদয়'-এ (১৮৫১) বিদ্যাসাগর যেমন ঐহিক পদার্থসমূহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তেমনি 'চরিতাবলী'-র (১৮৫৬) চরিত্ররা হলেন সেইসব দরিদ্র পুরুষ যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে আত্মোন্নতি করেছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই—সাধারণ মানুষকে এইসব দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং মুক্তমনা করা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'Primer maker' কিছু সাহিত্যকর্মও করেছিলেন। সেগুলো অবশ্য মূলত হয় সংস্কৃত নয় ইংরেজি প্লটের অনুকরণে লিখিত। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু লেখায়ও একই ছাপ রয়েছে, তবুও তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহিত্যিকের মর্যাদা তো দেনই নি, উপরন্তু বিদ্যাসাগরীয় ভাষা সম্পর্কে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি। 'সীতার বনবাস' বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'কান্নার জোলাপ'। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সাহিত্যগুণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—উভয় লেখকের রচনাই প্রায় সমান দুর্বোধ্য। ভাষা সম্পর্কে এই দুই লেখকের মধ্যে মতানৈক্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'

মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান—বিদ্যালয় স্থাপন-এর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সাহায্য পেয়েছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু হ্যালিডের কাছ থেকে। ছোটলাট হবার আগে হ্যালিডে শিক্ষাসংসদে যে 'মিনিট' উপস্থাপিত করেন তা বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় রচিত। এবং হ্যালিডেও বিদ্যাসাগরকে দিয়ে বাংলাশিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা লিখিয়ে নেন। সেই পরিকল্পনা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, এটুকুই শুধু জানা থাক যে, হ্যালিডের বক্তব্যের শেষাংশে বলা হল :

'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা মোটামুটি অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক।'

'সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের সকলের মত এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ দক্ষিণা কিছু না থাকাই উচিত।' (বিনয় ঘোষ, পৃ. ২০১)

হ্যালিডে ছোটলাট হয়ে বিদ্যাসাগরকে বাংলাশিক্ষা পরিদর্শকের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাদের মধ্যে নানা চাপান-উতোরের পর, অবশেষে হ্যালিডের উদ্যোগেই

বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইনস্পেকটর (পরে নাম বদলে স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর)-এর পদে ১৮৫৫-এর ১ মে থেকে নিযুক্ত করা হল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব ; তাই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক—মাসিক দুশো টাকা।

বিদ্যাসাগর কর্মোদ্যোগী পুরুষ। দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য শিক্ষক তৈরির জন্য 'নর্মাল স্কুল'-এর কথা ভাবলেন—নামমাত্র খরচায় সংস্কৃত কলেজে প্রতিদিন সকালে দুঘণ্টা ক্লাস করে ছমাস অন্তর ষাটজন করে শিক্ষক তৈরির পরিকল্পনা। সরকার অনুমোদন করলে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছেয় অক্ষয়কুমার দত্তকে উচ্চশ্রেণীর ও মধুসূদন বাচস্পতিকে নিম্নশ্রেণীর দায়িত্ব দেওয়া হল। সতেরো বছর বয়সের কম এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি বয়সের ছাত্রদের 'নর্মাল স্কুল'-এ ভর্তি করা হতো না। আর ১৮৫৫-এর মে থেকে '৫৬-এর জানুয়ারির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র নিজ এলাকার প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করলেন। গ্রামে-গ্রামে অবস্থিত 'মডেল স্কুল'-গুলো গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করল এবং 'নর্মাল স্কুল'ও যোগ্য শিক্ষক সরবরাহ করতে লাগল।

এ স্কুলগুলো সবই ছিল ছেলেদের জন্য স্কুল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার কি হবে? ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন। রামমোহনও কথাটা তুলেছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্যোগে কিছু-কিছু বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। তবে সেগুলো সবই বিদেশীদের প্রচেষ্টায়। ১৮৪৭-এ বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তা হল প্রথম বাঙালিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত প্রকাশ্য মেয়েদের স্কুল। এর জন্য প্যারী সরকার, নবকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের সমাজচ্যুতও হতে হয়েছিল। আর বারাসাত বিদ্যালয়ের অনুকরণে বেথুনও কলকাতায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তী-কালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৫৬ থেকে বেশ কিছু দিন বিদ্যাসাগর এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

প্রথমদিকে ভারত সরকার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। পরবর্তীকালে, বিশেষত ১৮৫৪-এর 'উডস ডেসপ্যাচ'-পর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে ভারত সরকারের নিস্পৃহতা কিছুটা কাটে। বিশেষত বাংলায় সরকারের এ বিষয়ে মত অনুকূল—এটা ধারণা করে 'স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর' এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন মডেল স্কুলের মতো গ্রামে-গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে। ১৮৫৭ থেকে মাত্র সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়ায় মোট পঁয়ত্রিশটি স্কুল খোলেন। মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল—১৩০০! এবারেই শুরু ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সংঘাত। কারণ সরকার তখন আর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে রাজি নন। এমনকি শিক্ষকদের বকেয়া বেতনও নয়। স্বভাবতই ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এটা ছিল অমানবিক ও অনৈতিক কাজ। নিজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নও ছিল—বিশেষত শিক্ষকদের

বকেয়া বেতনের ব্যাপারে। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সরকারের যে সব চিঠি-চাপাটি চলে তাতে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে বিদেশি সরকার দেশে স্ত্রীশিক্ষা চান না। আর এই উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ৫ অগাস্ট, ১৮৫৮ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর'-এর পদ থেকে বিদ্যাসাগরের ইস্তফা—মাসিক পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি থেকে এক কথায় ইস্তফা!

২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ ভারত সরকার এক চিঠিতে জানান—ঈশ্বরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য যে তিন হাজার চারশ ঊনচল্লিশ টাকা তিন আনা পাঁচ পয়সা খরচ করেছেন তা সরকার দিয়ে দেবেন। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়গুলো চালানোর জন্য সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোনো অর্থ সাহায্য করলেন না। বিদ্যাসাগরও বসে থাকার লোক নন। স্কুলগুলো চালানোর জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে 'নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভাণ্ডার' খোলেন। এ সত্ত্বেও স্কুলগুলো বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আগ্রহটা দেখার মতো।

সরকারি সাহায্য বা অনুদান ছাড়াও বিদ্যাসাগর যে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা তো সকলেরই জানা, বিশেষত ভগবতী বিদ্যালয় এবং মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। আর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনকে কলেজে উন্নীত করা তো বিদ্যাসাগরের কাছে ইংরেজদের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ! বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যে যুগে শিক্ষাবিজ্ঞান অজ্ঞাত, মনোবিজ্ঞান অপরিস্ফুট, সেইযুগে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের সকলের সামনে অপমান বা দৈহিক শাস্তিদানের ঘোরতর বিরোধী। তাই বলে দুষ্কৃত ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে অন্যভাবে, এমনকি স্কুল থেকে বহিষ্কার করেও। একবার বাদুরবাগানের বাড়িতে বসে খবর পেলেন যে তাঁর স্কুলের শ্যামপুকুর শাখার একজন শিক্ষক একটি ছাত্রকে গুরুতর দৈহিক শাস্তিদান করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে হেঁটে স্কুল। আর এক কলমের খোঁচায় শিক্ষক মহাশয়টির চাকরি খতম। অনেকের কাছে বিষয়টা একটু বাড়াবাড়ি বা স্বৈরাচারী কাজের নমুনা হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এসব অভিযোগ কিছুটা সত্য বটে, কিন্তু যা ভেবে দেখার প্রয়োজন তা হল, যেখানে বাংলার নামি-নামি অনেক স্কুলে আজও 'দুষ্ট' ছাত্রদের জুতোসুদ্ধ পায়ে লাথি মারতে আধুনিক শিক্ষকদের বাধে না, সেখানে আজ থেকে প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে বিদ্যাসাগর যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তা যে যুগান্তকারী ছিল না তা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫-র মার্চ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ছিলেন কলকাতাস্থ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিশনের কয়েকজন পরিদর্শকের মধ্যে একজন। '৬৩-'৬৪ শিক্ষাবর্ষে এই শিক্ষায়তনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিদর্শকদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে অনৈক্যের কারণে বিদ্যাসাগর পৃথকভাবে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তার এক জায়গায় বলা হল, 'আমার মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না

কেন তার জন্য বালকদের কখনোই দৈহিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। আমি দণ্ডনীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, যে বালকদের দৈহিক, দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়।'

মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা প্রচলনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা কীরকম ছিল তা আমরা দেখলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আকুতিটা কত তীব্র তা তাঁর ৫ অগাস্ট, ১৮৫৮-য় লেখা পদত্যাগ পত্র পড়লেই বোঝা যায়। তিনি ওই চিঠির এক জায়গায় বলেছেন তাঁর বাকি জীবনটা বাংলা বই রচনা, সংকলন এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজেই কাটাবেন। তারপরই বললেন, 'এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে।'

সকলেই জানেন এই কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। এমনকি তিনি যে কুশলী বাংলা গদ্য লেখক অক্ষয় দত্তর সঙ্গে মিলেমিশে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার জন্য কাজ করেছেন যা 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত তাঁর রচনা—এ সবই তো শিক্ষা বিস্তারের অন্তর্ভুক্ত। তবে লোকশিক্ষা—মানুষকে জাগ্রত করার জন্য, মানুষকে মুক্তমনা-যুক্তিবাদী-হৃদয়বান করার জন্য লেখা। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি এত অনুরাগ, দেশের মানুষের প্রতি এত ভালোবাসার উৎস কি নির্ভেজাল দেশপ্রেম ছাড়া আর কিছু হতে পারে?

'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর একসময় অকর্মণ্য, হীনবুদ্ধি সহকর্মীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৬-এর একটি সভায় তাঁর ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কারণ সদস্যরা জানতে চাইলে, তিনি লিখিতভাবে সে কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে এক স্থানে বললেন, 'যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার প্রধান ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ;...' এই যে 'দেশের হিতসাধন'—এরই অপর নাম তো দেশপ্রেম! পরিতাপের বিষয়, বিদ্যাসাগরের জীবৎকালেই অনেকেই তাঁর 'দেশের হিতসাধন'-এর প্রচেষ্টা অনিষ্টসাধন বলে মনে করতেন, আর সম্ভবত আজও অনেকে তা মনে করেন। পার্থক্য শুধু সময়ের ; ঐক্য—মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির!

ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

বিদ্যাসাগর পোশাক-আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন হিন্দু পণ্ডিতরূপে জনসমক্ষে পরিচিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত রচনাগুলো লিখেছিলেন, সবগুলোতেই শাস্ত্রের দোহাই—শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কাৎ করা। এসব থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি গভীরভাবে হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর হল, তিনি না লিখলেন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে কোনো লেখা না বললেন নিজ ধর্মমতের কথা।

ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মমত একটা প্রহেলিকাই রয়ে গিয়েছে—সবই অনুমানসাপেক্ষ। তবে এ কথাটা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের করতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত সম্পর্কে নিশ্চুপ, বলা যায় নিরুদ্বিগ্নও। তাই কিছু গল্প বা তাঁর উক্তি থেকেই তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা করা যায়। তিনি যেমন খ্রীস্টানদের সঙ্গেও মিশতেন, ব্রাহ্মদের সঙ্গেও আবার হৃদ্যতা তাঁর কম নয়। ফলে দু-একটা টুকরো ঘটনা উদ্ধার করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের ধর্মমত বোঝার কোনো রাস্তাই নেই।

শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর পিতা মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। একবার তিনি কলকাতায় এলে, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি ইতিমধ্যে গাঁজা-টাজা খাওয়া শুরু করেছেন কিনা? এরকম প্রশ্নে যখন শিবনাথের পিতা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, 'এত সহজ ও সোজা সম্পর্কটা বুঝতে পারলে না? জান তো, লোকের বিশ্বাস কাশীতে যাঁর মৃত্যু হয় তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন পাঁড় গাঁজাখোর। কাশীতে মৃত্যুর পর যখন শিব হবে তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে? তাই বলছিলাম, মৃত্যুর আগেই যদি একটু প্র্যাকটিস করে রাখতে, তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হতো।'

এরকম অনেক গল্পই আছে। তবে প্রমাণাদি যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বিদ্যাসাগরের দেবমন্দিরে যাওয়ার কোনো অভ্যাস ছিল না আর পারত্রিক পুণ্যার্জনের জন্যও তিনি কোনো মন্দিরে টাকা দান করতেন না। কাশীতে থেকেও বিশ্বনাথ দর্শন করেননি। এমনকি কাশীর পাণ্ডাদেরও তিনি শুদ্ধহাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব দেখেই নানা মুণি নানা মত ব্যক্ত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে বিদ্যাসাগর ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। আবার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের দাবি—বিদ্যাসাগর নাস্তিক। কেউ-কেউ অবশ্য বিদ্যাসাগরকে আস্তিক বলতেও ছাড়েননি। তবে বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যি হলে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হয়। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকজন 'কৃতবিদ্য ভদ্রলোক' বিদ্যাসাগরকে একবার ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, 'ধর্ম্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।' এরপর বিদ্যাসাগর পরের জন্য বেত খাওয়া সম্পর্কে একটা গল্প বলার পর বললেন, 'পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক করে আসছে, অনন্তকাল তাই করবে, কোনদিন তার মীমাংসা হবে না। অতএব ধর্ম্মবিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি অনর্থক বেত খেতে পারব না।'

এটাই হল বিদ্যাসাগরের ধর্ম সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁকে নাস্তিকই বলা হোক আর অজ্ঞেয়বাদীই বলা হোক বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্পর্কে কোনোদিন মাথা ঘামাতে চাননি, আর মাথাও ঘামাননি। তাঁর কাছে নিজের বা ব্যক্তিবিশেষের পারত্রিক ব্যাপার-স্যাপার উপেক্ষণীয়, ঐহিক প্রশ্নই তাঁর কাছে শেষ কথা।

যদিও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তাও তিনি স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেননি। ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামতের মধ্যেই ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ মেলে, যদিও তা বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আর ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মমতটাও বোধ করি আরও কিছুটা স্বচ্ছ হয়।

*ডঃ জেমস আর ব্যালেনটাইন ছিলেন বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃতজ্ঞ। সরকারের অনুরোধে ডঃ ব্যালেনটাইন ১৮৫৩, জুলাই-অগাস্ট মাসে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেন। ব্যালেনটাইনের অন্যতম পরামর্শ ছিল দার্শনিক বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" (*Inquiry*) পুস্তকটি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কারণ এর দ্বারা ভারতীয় ছাত্ররা ভারতীয় দর্শন এবং ইওরোপীয় দর্শনের মধ্যে ঐক্যের ভাব লক্ষ করবে।

বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী হিন্দু দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য বিভাগ, বিশেষত বেদান্ত এবং সাংখ্য পড়ানোর ব্যবস্থা সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত ছিল। কিছু ইওরোপীয় দর্শনগুলির মধ্যে বার্কলের দর্শন পড়ানো হতো না। ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হলেন। পরিবর্তে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩, কাউন্সিল অব এডুকেশনের তৎকালীন সম্পাদক এফ. জে.ময়েটকে বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রের এক স্থানে তিনি লিখলেন, 'বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" সম্পর্কে আমি এই মতামত ব্যক্ত করতে চাই যে, পাঠ্যপুস্তকরূপে এই বইটির অন্তর্ভুক্তি সুবিধের থেকে অনিষ্টই বেশি করবে। কতকগুলি কারণে, যা এখানে বিবৃত করার প্রয়োজন নেই, আমরা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য পড়াতে বাধ্য হই। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধতা নেই। এই দর্শনগুলি ভ্রান্ত হলেও হিন্দুদের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা আদায় করে থাকে। সংকৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি পাঠক্রমে আমাদের সঠিক দর্শন দ্বারা এগুলির প্রভাব প্রতিরোধ করার এবং এগুলির বিরোধিতা করা আবশ্যক। বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" যা বেদান্ত বা সাংখ্যের সদৃশ বা একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং ইউরোপে যেটিকে এখন আর সঠিক দার্শনিক প্রণালী হিসাবে গণ্য করা হয় না, তা আমাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে না। অপরপক্ষে যখন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ছাত্ররা এই বই পাঠ করে দেখবে যে, বেদান্ত ও সাংখ্যে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহ একজন ইউরোপীয় দার্শনিক দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হচ্ছে, তখন এই দুই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিশপ বার্কলের এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সুপারিশের ক্ষেত্রে আমি ব্যালেনটাইনের সাথে একমত হতে

---

* ভারতীয় দর্শন সম্পর্কিত অংশটি বর্তমান লেখকের 'এক হিন্দু পণ্ডিত' (শারদীয়া চেতনা, ১৯৯২)-এর অংশ বিশেষ।

পারছি না বলে দুঃখিত।' (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২, পৃ. ৪৫৩ ; মূল ইংরিজি থেকে অনূদিত)।

বিদ্যাসাগর কী কারণে বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন আর কেনই বা বিশপ বার্কলের দর্শনকে 'সঠিক দর্শন' বলে গণ্য করেননি তা বিদ্যাসাগর রচনায় ব্যাখ্যাত হয়নি। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামতের মূল কারণ বোঝার জন্য বোধ হয় বেদান্ত বা সাংখ্যের সঙ্গে বার্কলের দর্শনের সাদৃশ্য কোথায় সেটি দেখার চেষ্টা করাই ভাল। তাই সংক্ষেপে একবার বিষয়টির ওপর চোখ বোলানো যেতে পারে।

আমরা ইংরেজি 'ফিলসফি' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহার করি। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের অভিমত, 'এস্থলে দৃশ্-ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়।' মহামহোপাধ্যায় আরও বলেন, 'অমরসিংহ বলিয়াছেন—মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ। মোক্ষ-বিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্রর নাম বিজ্ঞান। প্রকৃতস্থলে দৃশ্-ধাতুর জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ মোক্ষ বিষয়ক-জ্ঞানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। কেননা দর্শনশাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞানসামান্যের সাধন হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে।' (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আদি পর্বে উদ্ধৃত, পৃ. ৩-৪)।

'দর্শনশাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন'—মহামহোপাধ্যায় তর্কালংকারের এই ব্যাখ্যা বিদ্বানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মাত্রই 'মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন'—এটা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। কমপক্ষে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে যে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানচর্চা হয়নি তা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে যে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অপর একটি বিষয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্যে 'ফিলসফি' বা দর্শনশাস্ত্রের যেমন স্বাধীন বিকাশ ঘটেছিল, বেশির ভাগ ভারতীয় দর্শনের তা ঘটেনি। ভারতের বেশির ভাগ দর্শন ধর্মের সঙ্গে এবং কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। ফলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান শাখাগুলিতে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানচর্চা অনিবার্যভাবেই ঈশ্বর বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয়েছে।

বেদের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রসমূহকে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্বীকৃত বিভাগ অনুযায়ী বেদের প্রতি অনুগত অর্থাৎ আস্তিক দর্শনগুলি হল—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা বা মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। অপরদিকে নাস্তিক দর্শন হল লোকায়ত, জৈন এবং বৌদ্ধ। অবশ্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিদ্বান এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত এবং সুচিন্তিত আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি মনে করে থাকে, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মুখনিঃসৃত যে বাণী বেদে স্থান পেয়েছে সেগুলি ঈশ্বর প্রেরিত বাণী এবং এগুলি চিরন্তন ও

অপরিবর্তনীয় সত্য প্রকাশ করেছে। বেদান্ত যে সম্পূর্ণ বেদ অনুগত দর্শন সে বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সাংখ্য দর্শনকে সেইভাবে আস্তিক দর্শন বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সাংখ্য সম্পর্কে আলোচনার আগে বেদান্ত সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সকলেই অবগত আছেন যে, ঐতিহ্যের দিক থেকে বেদের দুটি অংশ—মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা যাগযজ্ঞ। ব্রাহ্মণ অংশের শেষে স্থান পেয়েছে আরণ্যক আর আরণ্যকের শেষে উপনিষদ। আরণ্যক ও উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা বা সমর্থন করাই হল উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য মূল দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দানের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় বাদরায়ন প্রণীত বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে। পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কাছে মূল দার্শনিক গ্রন্থ এই বেদান্তসূত্রই এবং তাঁরা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রন্থেরই নানা ভাষ্য রচনা করেছেন। বেদান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের দুটি উপসম্প্রদায়—অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত। অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাকার হলেন শঙ্করাচার্য। আর বিশিষ্টাদ্বৈত উপসম্প্রদায়ের প্রধান ভাষ্যকার হলেন রামানুজ (একাদশ শতাব্দী)। উভয় সম্প্রদায়ই ব্রহ্মার অস্তিত্বকে প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করেছেন এবং উভয়েরই মতে মোক্ষলাভই ব্যক্তি বিশেষের চরম লক্ষ্য। সামগ্রিকভাবে বেদান্ত দর্শনে আত্মা হল অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর। শঙ্করাচার্য একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে, সেইসব যুক্তি বা তর্কই গণ্য করা যেতে পারে যেগুলি 'শ্রুতি' থেকে স্বতন্ত্র নয়, বরং 'শ্রুতি'র পরিপূরক।

অবশ্য অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত—এই উভয় দর্শনের মধ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট। শঙ্করাচার্যের মতে 'ব্রহ্ম একাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্যক্তি এবং ব্রহ্ম অভিন্ন'। তাঁর আরও মত হল, ব্রহ্ম একান্তভাবেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাবয়ব, নিরুপাধিক (চূড়ান্ত) এবং নির্বিশেষ। তাই ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করার অর্থ হল অজ্ঞানতা। চিৎস্বরূপ আমিই একমাত্র সত্য। আবার জ্ঞানান্বেষণকারী নিজেই অজ্ঞেয়। ফলে পরিদৃশ্যমান সবকিছুই মায়া (*The Cultural Heritage*, The Ramkrishna **Mission Institute of Culture, Calcutta, Vol-III, p. 238-40)**।

অপরপক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নিগুর্ণরূপে চিহ্নিত করা হয়নি। এই সম্প্রদায়ের কাছে যদিও ব্রহ্মই চূড়ান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়, কিন্তু এক্ষেত্রে জড়জগৎ এবং জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করা হয়েছে। এই দর্শনে বেদান্তজ্ঞান অর্জনের জন্য তিনটি পরস্পর ঐক্যযুক্ত প্রণালী প্রদর্শন করা হয়েছে—তত্ত্ব, হিত এবং পুরুষার্থ। তত্ত্ব হল ব্রহ্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান। (*Cultural Heritage*, Vol-III, p. 300-01)

সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে অধ্যাপক হিরিয়ানা মন্তব্য করেছেন, 'এই দর্শনের উৎপত্তি এবং

এর মতাদর্শের যৌক্তিক সঙ্গতির বিষয়টি দীর্ঘদিনব্যাপী বিতর্কের বিষয়বস্তু ;' (*Cultural Heritage*, Vol-III, p. 41)। অধ্যাপক মূর্তির মতে কপিল, যিনি সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য হন, তিনি একজন পৌরাণিক চরিত্র (ওই, পৃ. ৩৩)। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'সুখের বিষয়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক গার্বে এবং অধ্যাপক জিমার প্রমুখ অন্যান্য আধুনিক বিদ্বানেরা নতুন করে প্রমাণ করেছেন, সাংখ্য দর্শন আদিতে অবধারিত ভাবেই বেদ-বিরুদ্ধ ছিল' (ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯)। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অন্য একটি মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য, 'সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নানা অবান্তর প্রতিপাদ্য বিচারমূলকভাবে বর্জন করলে দেখা যায় যে এই দুটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক সারাংশও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদেরই পরিচায়ক' (লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে যে দুটি উপসংহারে পৌঁছনো যায় তা হল—প্রথমত, আদিতে বেদবিরুদ্ধ থাকলেও সাংখ্য দর্শন পরবর্তীকালে আর বেদ বিরোধী থাকেনি ; দ্বিতীয়ত, 'নানা অবান্তর প্রতিপাদ্য বিষয় বিচারমূলকভাবে বর্জন' করার পরই সাংখ্যের বস্তুবাদী অন্তঃসার প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

সাংখ্যের মূল গ্রন্থ বলতে মাত্র ২২টি সূত্রযুক্ত 'তত্ত্ব-সমাস' নামের একটি সংগ্রহ পাওয়া গেছে। এছাড়া সাংখ্য দর্শনের প্রধান গ্রন্থ হল ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত 'সাংখ্য-কারিকা' এবং কপিল রচিত 'সাংখ্য-সূত্র'। সাংখ্য-কারিকাও একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ। সে তুলনায় সাংখ্য-সূত্র কিছুটা বৃহৎ। এবং এই সাংখ্য-সূত্রই সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর গার্বের মতে, সাংখ্য-সূত্র প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-মতে ভরপুর। অধ্যাপক সুরেন দাশগুপ্তের মতে এমনকি ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা, যা দ্বিতীয় বা মতান্তরে পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, তাতেও সাংখ্যের অবিকৃত ব্যাখ্যা নেই। সাংখ্য-কারিকার প্রধানতম ভাষ্যকার গৌড়পাদের রচনায় এবং অপর টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের টীকায় (সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী) যে বেদান্তমত প্রাধান্য পেয়েছে তা সকল বিদ্বানই স্বীকার করেছেন।

সুতরাং সাংখ্য দর্শনের নাস্তিক্যবাদ বা বস্তুবাদী চরিত্র অস্বীকার না করেও একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে আধুনিক গবেষকদের গবেষণার আগে পর্যন্ত সাংখ্যের বস্তুবাদী চরিত্র অজ্ঞাত ছিল এবং সাংখ্য দর্শনের বহুল প্রচারিত গ্রন্থগুলি—'সাংখ্য-সূত্র' এবং 'সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী' বেদান্ত মতে ভরপুর ছিল। এবং বিদ্যাসাগরের সময় সাংখ্য-দর্শনের যে দুটি বিষয় সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য ছিল, সে দুটি হল : কপিলের সাংখ্যসূত্র এবং কৌমুদী বা সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী। সুতরাং বিদ্যাসাগর যদি সাংখ্য দর্শনকে বেদান্ত-অনুগামী বলে মনে করে থাকেন, তাহলে তা তৎকালীন যুগের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে এবং পাঠ্য পুস্তকরূপে গণ্য গ্রন্থ দুটির বিচারে কোনো অন্যায় কাজ বলে গণ্য করা উচিত নয়।

এখন বিশপ বার্কলের দর্শনের অন্তঃসার ব্যক্ত করার আগে ইওরোপীয় দর্শন সম্পর্কে

দু-একটি জানা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। মধ্যযুগীয় ইওরোপে অন্যান্য জ্ঞান-মার্গের মতো দর্শন চর্চাও অধঃপতিত হয়েছিল এবং চার্চ ও ধর্ম জনজীবনে অবিসংবাদী প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। এবং এটাও ইতিহাসসিদ্ধ যে নবজাগরণ বা জাগৃতিকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো দর্শন চর্চাও বিকশিত হয়। এই পর্যায়েই ফ্রান্সিস বেকন, স্পিনোজা, দ্য কার্তে, হবস, লক, ভলতেয়ার প্রমুখ দার্শনিকগণ একদিকে আধুনিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অপরদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধকারময়তা থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টায় রত হন। বেকন, স্পিনোজা, দ্য কার্তে, হবস, লক প্রমুখ দার্শনিকগণ আধুনিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তিবাদও প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ফলে ধ্বনি ওঠে—অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছুই বিচার্য।

বেকন (১৫৬১-১৬২৬) ঘোষণা করলেন, তাঁর বিখ্যাত নোভাম ওরগানাম-এ 'Man, as the minister and interpreter of nature, does and understand as much as his obesrvations on the order of nature......permit him ; and neither knows nor is capable of more.' (*The story of Philosophy* Will Durant, 1957, p. 125) আর বেকনীয় দর্শনের অনুগামী জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বললেন, 'there is nothing in the mind except what was first in the senses.' এবং সিদ্ধান্ত করলেন, যেহেতু কেবলমাত্র জড়পদার্থ আমাদের অনুভূতিকে (senses) প্রভাবিত করতে পারে, সেহেতু আমরা বস্তু (matter) ছাড়া আর কিছুই জানি না, এবং আমাদের অবশ্যই বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে *(The story of Philosophy, p.* 256)।

এই পর্যায়েই জর্জ বিশপ বার্কলের (১৬৮৪-১৭৫৩) উত্থান। ১৭১০-এ প্রকাশিত দার্শনিক বিশপ বার্কলে তাঁর '*Treatise concerning the principles of human knowledge*' গ্রন্থে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিলেন বস্তুবাদীদের। তাঁর কাছে বস্তু হল কতকগুলি ধারণার সমাহার ('collection of ideas')। এবিষয়ে তাঁর একটি উদাহরণ হল, 'যে টেবিলে আমি লিখি, আমি বলি তার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ এটিকে আমি দেখি এবং অনুভব করি ; কিন্তু যদি আমি পাঠকক্ষের বাইরে চলে আসি, আমার বলা উচিত এটির অস্তিত্ব ছিল ; যার অর্থ হল 'পাঠকক্ষে থাকলে সেটি আমার কাছে পরিদৃশ্যমান হত...'। এই কারণে বার্কলে বললেন, 'আমি একথা ভাবতেই পারি না, যে বস্তুগুলি কেউ দেখছেন সেই পরিদৃশ্যমানতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে কী করে বস্তুর চূড়ান্ত অস্তিত্বের কথা বলা যেতে পারে। অস্তিত্ব থাকার অর্থই হল পরিদৃশ্যমান হওয়া।' বার্কলের এই সিদ্ধান্তের অন্তঃসার একটাই, তা হল চেতনাই প্রধান ; চেতনা আছে বলেই বস্তুর অস্তিত্ব আছে। চেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো অস্তিত্ব বস্তুর থাকতে পারে না। এই কারণেই বার্কলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'বস্তু

শব্দটা সেই অর্থেই ব্যবহার করা যেতে পারে যে অর্থে অন্য ব্যক্তিরা বলেন শূন্য (nothing)' (পৃ. ১৯৬-৯৭)।

এককথায় বিশপ বার্কলের দর্শন ভাববাদী দর্শন। আর এখানেই বার্কলের দর্শন, বেদান্তদর্শন এবং বেদান্তমতে ভরপুর সাংখ্য দর্শনের চিন্তার ঐক্য। এই তিনটি দর্শনের চেতনা মুখ্য, বস্তু বা জড় (matter) অপ্রধান। বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই ; চেতনা আছে বলেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। আর সকল ভাববাদী দর্শনই অবধারিতভাবে ঈশ্বর এবং ভাগ্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

একথা অনুমান করা অসংগত নয় যে, বিদ্যাসাগর এই ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতা করার জন্যই বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলেছিলেন এবং বার্কলের দর্শন পাঠ্য-সূচির অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ভারতীয় এবং আধুনিক ইওরোপীয় দর্শন সম্পর্কে চিন্তাধারা তাঁর 'Notes on the Sanskrit College' নামক প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'একথা ঠিকই যে হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।' (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১)

মানবতাবাদ ও অজেয় পৌরুষ

বিদ্যাসাগরের কাছে উপেক্ষণীয় ঈশ্বর-ধর্ম, মানুষ নয়। তাঁর চেতনা-রচনা-কর্ম পরিচালনার গোটা জায়গাটাই যা দখল করে বসে আছে তা মানুষ। পঙ্কে নিমজ্জিত স্থানু সমাজ, হিন্দু সমাজের মানুষকে কী করে জাগ্রত করা যায়, কী করে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষে পরিণত করা যায়—এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাই মানুষকে যে কোনো ধরনের অমঙ্গল থেকে রক্ষার প্রয়োজন হলেই বিদ্যাসাগরকে দেখা যেত সর্বাগ্রে—তা কলেরা রোগ থেকে মানুষকে বাঁচানোই হোক, আর নিরন্ন মানুষকে অন্ন-বস্ত্র দানই হোক। ছিল না জাতের বিচার, ছিল না ধর্মের আচার। আবার বলি, পুণ্যার্জনের হাতছানি তাঁকে এব্যাপারে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। মধুসূদন দত্তকে ধার করে বিদেশে দু খেপে আট হাজার টাকা পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল একটা বিপদগ্রস্ত পরিবারকে, একটা প্রতিভাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো।

তাঁর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজেরও মূল অনুপ্রেরণা ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা—নারী সমাজের প্রতি গভীর প্রেম, হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা। তিনি জানতেন যে নারী মুক্ত না হলে এ দেশের কিছু হবে না। এই উদ্দেশ্যেই বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন। বিদ্যাসাগরের উইলটা খুললেই দেখা যায় কত অজ্ঞাত রমণীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা। আর মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার প্রসারের মাধ্যমে তিনি সকল ধর্মাবলম্বী বঙ্গবাসীর জাগ্রত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরের মতো উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেও ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়েছিল। এক সময় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, আর বাৎসরিক সুদ পাঁচ হাজার টাকা। চেষ্টা করেছেন যেন অপাত্রে দান না হয়, তবুও বহু স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁকে প্রতারণা করেছে। যাঁরা বিধবাবিবাহের জন্য অর্থদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁরাও সুযোগ বুঝে সরে পড়েছেন। এমনকি সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি নিজে বিধবাবিবাহের জন্য অঙ্গীকৃত অর্থের অর্ধেক দিয়েছিলেন এবং মাসিক সাহায্যও বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তিনিও তাঁর কাছ থেকে ঋণ করা টাকা পরিশোধের জন্য বিদ্যাসাগরকে তাগাদা দিয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদন কবি। তাই তাঁর কবি-হৃদয় থেকে উৎসারিত নানা বিশেষণে তিনি বিদ্যাসাগরকে বিভূষিত করেছিলেন—'the first man among us', 'genius and wisdom of an ancient sage,' 'the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother', 'করুণাসাগর' ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো কল্পনাবিলাসী ছিলেন না ; ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তববাদী এবং বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। সমাজকে সবটা না হলেও অনেকটাই চিনতেন। তাই প্রথমবার সংস্কৃত কলেজ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরপরই ব্যবসা শুরু করেন। তিনি জানতেন, যে পথে তিনি এগুতে চাইছেন—তাতে সংঘাত অনিবার্য—নিজের সংস্থান নিজেরই করতে হবে। বই লিখেছেন, ছেপেছেন, নিজের এবং অন্যের বই বিক্রি করেছেন, দু হাতে উপার্জন করেছেন এবং অকাতরে বিলিয়েছেন। শেষমেশ নিজের ঋণ নিজেই শোধ করে গেছেন।

মানবতাবাদ, বৈষয়িক বুদ্ধি এবং পৌরুষের এমন বিচিত্র সমাহার খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়। মানবতাবাদ যদি তাঁর পথ হয়, তাহলে বৈষয়িক বুদ্ধি এবং পৌরুষ হল তাঁর পাথেয়। তবে বৈষয়িক বুদ্ধিকেও ছাপিয়ে গেছে তাঁর অসীম সাহস—অমিতবিক্রম তেজ। এই তেজের কাছে কে না পরাভূত হয়েছে? এই তেজের জোরেই না তিনি গোটা সমাজের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন? ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মিশেছেন—সমানে-সমানে। মতান্তর হলে প্রতিবাদ, চাকরিতে ইস্তফা। ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে চোগা-চাপকান পরতে হয়নি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁকে চটি পরে ঢুকতে দেয়নি, তাই কোনোদিনই ঢোকেননি। বর্ধমান মহারাজার ভূমিদানের ইচ্ছা তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন বিদ্যাসাগরের ঋণের বোঝায় বিচলিত হয়ে 'সোমপ্রকাশ' জনগণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করল, তারও তিনি প্রতিবাদ করলেন। ঋণের ভার তাঁর ওপর এতটাই চেপে বসেছিল

যে এক সময়ে বুড়ো বয়সে আবার সরকারি চাকরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের চাকরি যখন হব-হব তখন তিনি তাঁর শর্ত দিলেন—তাঁর মাসিক মাইনে যেন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের থেকে কম না হয়। কী প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ! ঋণে মাথা নুয়ে যেতে পারে, কিন্তু মর্যাদার বিনিময়ে মাথা নোয়ানো নৈব নৈব চ।

এই কারণেই তিনি পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আত্মীয়দের আপত্তির কথা অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছ থেকে শুনে শম্ভুচন্দ্রকে লিখলেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম...এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত যা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।' যে পুত্রের বিধবাবিবাহের জন্য তিনি সবকিছু ছাড়তে রাজি, আবার সেই পুত্র সম্পর্কেও তিনি তাঁর উইলে লেখেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য-অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি।'

শুধু পুত্র কেন? পিতা? পিতার প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা তো প্রবাদপ্রতিম! কিন্তু সেই পিতাকেও তিনি বলতে ছাড়েননি, 'আপনি ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট কিরূপে আপনাকে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন?' পিতা শ্রদ্ধেয় বলে তাঁর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করব না—বিদ্যাসাগরের অভিধানে এরকম কোনো কথা লেখা ছিল না।

বাঙালি তথা ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে একেবারে এই বেখাপ্পা বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় একজনই সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই বলতে শোনা যায়, 'আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

যে ব্যক্তি দেশাচারের দাস নন, যে ব্যক্তি অনায়াসে দেশাচারের নিগড়ের ওপর আক্রমণ হানতে পারেন তাঁর যদি 'অজেয় পৌরুষ' না থাকে তাহলে ওই কথাটাই তো অর্থহীন হয়ে যায়।

বর্তমান নিবন্ধটা (যদি একে আদৌ নিবন্ধ বলা চলে)-র আদ্যন্ত নানা বই থেকে স্রেফ টুকলি করা। অবশ্য একটু নিজের মতো করে সাজানো যাকে eclecticism বলা

যেতে পারে। আসলে বিনয় ঘোষ, ইন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিদ্বানগণ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা লিখে গিয়েছেন, তার বাইরে নতুন কথা বলতে গেলে যে বিদ্যে-বুদ্ধির প্রয়োজন তা বর্তমান কলমচির নেই। ভাল বিষয় অকেজো লোকের হাতে পড়লে যা হয়, বিদ্যাসাগরের দশাও এক্ষেত্রে সেইরকম। তবু শেষকালে নিজের কথা বলে দু' একটা শোনা কথা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছেটা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে বলে এই 'শেষের কথা'।

শেষ বিচারে, বিদ্যাসাগর ব্যর্থ—সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ—মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, আইনসিদ্ধ হলেও বিধবাবিবাহের বাস্তবে প্রচলনে ব্যর্থ, বাল্যবিবাহ রোধে বেশ কিছুটা ব্যর্থ, লোকশিক্ষায় ব্যর্থ, ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরিতে ব্যর্থ, আর নীতিনিষ্ঠ পৌরুষ সৃষ্টি—সে তো বাঙালির ধাতে সয় না! ওপরের এই ব্যর্থতার সত্যতা বিচারের জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয় না—বর্তমান সমাজই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রচিত নবম শ্রেণীর পাঠ্য 'Learning English, Step-III'-র ভূমিকায় লেখা হয়েছে 'The emphasis on reading and writing is deliberate. Our students will need to read, understand and write in English more and more as they grow older.'

অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যে অনেক ইংরেজি পড়তে হবে তা মানি। তা বলে সবাইকে? রামের মা, শ্যামের মা প্রভৃতি যাঁরা লোকের বাড়ি কাজ করে দিন গুজরান করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও? শ্রমিক-কৃষক সন্তানদেরও? অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদেরও? এ যদি বিদ্যাসাগরের মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা প্রসারের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা না হয় তো ব্যর্থতা কাকে বলব?

অবশ্য একটা ব্যাপারে বিদ্যাসাগর, বলা ভাল বিদ্যাসাগরের আদর্শ সফল—তা হল হিন্দুদের বহুবিবাহ বন্ধ করা। তাও অবশ্য বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় নয়, বর্তমান ভারত সরকার প্রণীত 'হিন্দু বিবাহ আইন'-এর কোঁৎকার চোটে। এখনও বহুবিবাহ হয় বটে, তবে তা কিছুটা লুকিয়ে-চুরিয়ে। অবশ্য আইন থাকলেও, কেবলমাত্র দরিদ্রশ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত কন্যাদেরও যে নির্ধারিত বয়সের আগেই বিবাহ দেওয়া হয়, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। আর 'জয় শ্রীরাম' রণধ্বনিতে মথিত ভারতের আসমুদ্র-হিমালয়ের একটু স্থানও যে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির থাকবে না—এটাই তো স্বাভাবিক! অবশ্য 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির আগেই পশ্চিমবঙ্গে রকমারি পুজোর ছটায় বিদ্যাসাগর-আদর্শ নির্বাপিত।

মধ্যবিত্ত-বিদ্যাসাগরের শ্রেণীবদ্ধতা প্রমাণে অনেকেই প্রয়াস পান—বলা যায় ফিল-হাল এটা একটা ফ্যাসনে পরিণত। আচ্ছা, বিদ্যাসাগর যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ছিলেন না বা স্বশ্রেণীর আঙিনার বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন—এমন দাবি কি কেউ করেছেন? মধ্যবিত্ত মানুষ—মধ্যবিত্তর দোষে-গুণে ভরা। এখন এইরকম একজন মধ্যবিত্ত মানুষের

কাজ তৎকালীন সমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণকর আর কতটা ক্ষতিকর, সেই কাজ কতটা আত্মস্বার্থবাহী আর কতটা নিস্বার্থ—এই বিচারটাই তো বেশি প্রয়োজনীয়। কেন জানি না এই সোজা পথটা গ্রহণে অনেকেই পরাঙ্মুখ।

একথা তো ঠিকই যে বিদ্যাসাগর প্রজাদের দুর্দশা সম্পর্কে নীরব ছিলেন, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে নিশ্চুপ। একথাও ঠিক যে, হরিশচন্দ্র মুখার্জি নীল বিদ্রোহের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এবং এটাও সত্য যে অক্ষয় দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে এবং প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। এ ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু এইসব লেখার জন্য কি উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন? আসলে আমরা একটা নির্দিষ্ট ছকে দেখতে মানুষকে পছন্দ করি। কিন্তু মানুষ তো ছক-বাঁধা প্রাণী নয়—তার ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। ঘটনাক্রমে প্রাগুক্ত চারজন ব্যক্তিই বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। অথচ তাঁরা ওইসব বিষয়ে লিখলেন, আর বিদ্যাসাগর নিশ্চুপ রইলেন। ওইসব লেখার পেছনে বিদ্যাসাগরের সায় ছিল কিনা তা জানার কোনো অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধির মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় স্থান পায়নি—এটাই সত্য। আর এই সত্য মেনে নিয়েই বিদ্যাসাগরের বিচার করা উচিত।

তবে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মানলে মনে হয় বিদ্যাসাগর কমপক্ষে মধ্যবিত্তদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'After a year's preparation the Indian Association was established on July 26, 1876... Pandit Iswar Chandra Vidyasagar and Mr. Justice Dwarka Nath Mitter, while still a member of the Bar, had formed the idea of organising a similar association which was to be the voice and the organ of the middle classes. The idea had to be given up as it did not at the time meet with much support.' *(A Nation In The Making)*

ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন যার বিকাশের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছিলেন অ্যালান অকটোভিয়ান হিউম। আর এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কিছুটা শারীরিক কারণ, হয়ত কিছুটা বা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতা (কারণ সুরেন্দ্রনাথ বেশি বেতনের জন্য মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ছেড়ে সিটি কলেজে যোগদান করেছিলেন), হয়ত বা অন্য কিছু কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করেননি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য যে, উদ্যোক্তারা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এবিষয়ে যথেষ্ট পরামর্শ পেয়েছিলেন।

কার্মাটাড়ের সাঁওতালদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর যে মনেপ্রাণে সুস্থ বোধ করতেন, সে কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার লিখেছেন, 'যদি বিদ্যাসাগর সেই দুমুখো

শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর উপর সুস্থ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ভর না করে সমাজের এই সাধারণ মানুষের উপর আস্থা নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন, বঞ্চিত মানুষের দুঃখকে একা দূর করবার স্বপ্ন না দেখে সেই বঞ্চিত সাধারণের উদ্যোগে তাদের বঞ্চনা অবসানের ব্রত গ্রহণ করতেন, তা হলে—একমাত্র তা হলেই তিনি তাঁর সমাজ সুনিশ্চিত আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে দিতে পারতেন ; আপন সাধনার সাফল্য লাভ করতেন।' (প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পৃ. ৯১)

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর মতের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করা ধৃষ্টতামাত্র। তবুও জিজ্ঞাসা করি—এটা কি মধ্যবিত্ত বিদ্যাসাগরকে টেনে প্রলেতারীয় করার চেষ্টা নয় ? সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করে, তাঁদের সংগঠিত করে বাংলা গদ্য কি এগুতো ? মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা কি হতো ? মধ্যবিত্ত মানুষ কি সংস্কারমুক্ত হতেন ? বিদ্বান শ্রীযুক্ত হালদারের কাছে বিনম্র চিত্তে নিবেদন—একবার স্মরণ করুন লেনিন 'What Is To Be Done'-এ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে কী লিখেছেন ? এমনকি তিনি তাঁর যুক্তির সপক্ষে কার্ল কাউৎস্কির একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছেন (Lenin, Volume-V, P.P. 383-84)। কাউৎস্কির উদ্ধৃতির এক জায়গায় আছে—'The Vehicle of science is not proletariat, but the bourgeois intelligentsia'। ঈশ্বরচন্দ্রের মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, আর লেনিনের রচনার তখন তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিদ্যাসাগর তো একটা কাজেই তন-মন-ধন সঁপে দিয়েছিলেন—সংস্কারমুক্ত, হৃদয়বান-বিজ্ঞানের বাহক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করা। এ তো একেবারে গোড়ার কাজ। এই কাজ না করে সাঁওতালদের বা নিরন্ন কৃষকদের সংগঠিত করলে বিদ্যাসাগরের দ্বারা সমাজ বেশি উপকৃত হতো—এমন তো মনে হয় না। তাই সর্বপ্রকার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ সমালোচনাও কম নয় যে তিনি মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। উৎস—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা প্রাগুক্ত চিঠির এক জায়গায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'

আগে চিঠিটির পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল—সাধারণ গালিগালাজ থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্তর ব্যঙ্গ কবিতা (বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১২২-২৫), এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপ। বহুবিবাহ রোধের প্রচেষ্টাও বঙ্গদর্শন সমালোচনাও করেছে। লোকে বিধবাবিবাহের নাম করে টাকা নিয়ে গিয়ে প্রতারণা করেছে। যাঁরা প্রথমে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তাঁরা একে-একে সরে পড়েছেন, অর্থ সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কথা রাখেননি। এইরকম একজন ঋণভারে জর্জরিত,

অপরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং প্রতারিত ব্যক্তির মুখ দিয়ে অনেক দুঃখে যে একথা বেরুতে পারে, সেটা কি অস্বাভাবিক ? বিশেষত কে তাঁকে ঋণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখছেন ? দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের যৌবনের সুহৃদ এবং যে দুর্গাচরণ নিজে বিধবাবিবাহের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ পুরোপুরি দেননি, তিনি যখন টাকার তাগাদা দেন, তখন বিদ্যাসাগরের এই আক্ষেপের কারণ একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মনে হয় কী ? বিশেষত, উপরোক্ত শব্দাবলী কতটা দুর্গাচরণকে কটাক্ষ করে আর কতটা সাধারণ মানুষের ওপর অবিশ্বাস থেকে তাও ভেবে দেখার মতো।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বিদ্যাসাগর সজ্ঞানে 'আমাদের দেশের লোক'-কে অসার ও অপদার্থ বলেছেন তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তাঁরা কোন লোক ? বিদ্যাসাগর যাঁদের দ্বারা বারবার প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে সমাজের কল্যাণের জন্য সৎ সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় তিনি দেখতে পাননি, তাঁরা তো সবাই মধ্যবিত্তশ্রেণীরই মানুষ। মানুষের ওপরই যদি বিশ্বাস হারাতেন তাঁকে কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হয় কেন ? কেন তিনি সেখানকার মানুষদের চিকিৎসা করে, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ দান করে, পড়িয়ে খাইয়ে তৃপ্ত হন ? না, তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি ; হারিয়েছিলেন স্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ওপর আস্থা। মানুষের ওপরে কী করে তিনি আস্থা হারাবেন ? তাঁর কাছে তো 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' !

শেষ বয়সে বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ। পুত্রের ব্যভিচারের জন্য তার মুখ দেখা বন্ধ, ব্যক্তিগত কারণে 'বাল্যের বারাণসী' বীরসিংহ দ্বারা পরিত্যক্ত, স্বশ্রেণীর-স্বগোত্রের সদস্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত ! একমাত্র ভরসাস্থল, শান্তির স্থান কার্মাটাড়ের সাঁওতাল সম্প্রদায়। কিন্তু কী কারণে অতগুণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নিজশ্রেণী দ্বারা পরিত্যক্ত ? একটা কারণ নিশ্চয়ই তাঁর সব ব্যাপারে একগুঁয়েমী, যাকে রামজয়ের কথা প্রতিধ্বনি করে ঠাকুরদাস বলতেন 'এঁড়েমি'। এটা ছিল তাঁর সহজাত প্রকৃতি যার জন্য তিনি অনেক সময়ই পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু যেটা অনেকেই উল্লেখ করেন না, তা হল তার এই 'এঁড়েমি' প্রশ্রয় পেয়েছিল মধ্যবিত্তজাত অহংবোধ দ্বারা। মধ্যবিত্ত মাত্রেই এই গুণটি আছে। কিন্তু প্রতিভাবান-কর্মঠ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই গুণটা যে মাত্রাতিরিক্তভাবেই ছিল তা ধরে নিলে বোধ হয় ভুল হয় না।

কিন্তু এটাই কি শুধু বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গতার কারণ ? না কি স্বার্থের সংঘাতও ছিল ? এবিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিহীন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি যা হয়ত এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। আগে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৮৩৫-এ তা বন্ধ হয়। সেকালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল একটি রক্ষণশীল পত্রিকা এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। ১৮৩৫-এ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ বলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখা হয়, 'সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।...

'এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম......আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভ অবধি রহিত কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহু সংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতকগুলিন ব্রাহ্মণদের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড, পৃ. ৪)।

এই 'না কেরাণি হইল না অধ্যাপক' আবার যজমানও হারালো—এটাই মোদ্দা কথা। যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজের কেরানি অথবা সরকারি কর্তাব্যক্তি হওয়ার জন্য আকুল, তখন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শেই কী লাভ আর সমাজ সংস্কারেই বা কী লাভ? আর যাই হোক বিধবাবিবাহ ঘটিয়ে না পাওয়া যাবে সরকারি চাকরি না খেতাব। শুধুই আত্মত্যাগ আর লাঞ্ছনা দিয়ে তো আর ঐচ্ছিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যাবে না! এখানেই ছিল মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংঘাতের কারণ নিহিত। তবুও সমাজের 'মূর্খ' লোকেরা যে মধ্যবিত্ত বিদ্যাসাগরের জন্য কোল পেতে দিয়েছিল তার প্রমাণ—'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে' পদ্য লেখা শান্তিপুরের তাঁতিদের তৈরি কাপড়! বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিন কলকাতার ছাত্রসমাজ পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে খালি পায়ে হেঁটেছিলেন এবং সারাদিন উপবাসে ছিলেন।

বিদ্যাসাগর সেকালেও ছিলেন নিঃসঙ্গ, একালেও। সমগ্র ভারতে, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে দু' লাইন স্থান পাওয়া ছাড়া, আজও তিনি অপরিচিত। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের শিক্ষিতজনের মধ্যে দু' চারজনই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন। দেশে কমপক্ষে আধ-ডজন সাম্যবাদী দল এবং অগুন্তি সাম্যবাদী গোষ্ঠী আছে। মুখে যাই বলুন, এইসব দল বা গোষ্ঠীর নেতারা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমান নিস্পৃহ। অবশ্য বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গতার কারণ সেকালেও যা ছিল, একালেও তাই আছে। বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তো সুবিধাবাদের স্থান নেই। ভাবতে অবাক লাগে, হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগে জন্মে যে ব্যক্তি ধর্মের প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখালেন এবং বেদান্ত সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন নামে অভিহিত করলেন, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রচারে সেই ব্যক্তির নাম ঘুণাক্ষরেও উচ্চারিত হয় না—হয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধর্মগুরুদের কথা! এ যুগে যাঁরা বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরসূরী হতে পারতেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। আর যাঁদের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদ্যাসাগরের শুধু অবয়বটাই প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর আজ তাঁদের হাতেই আটকা পড়ে আছেন। একেই বলে ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। □

□

With best compliments from :

The Pharma Stockist

QUINTON ROAD

SHILLONG

MEGHALAYA

□

মৃত একটি খাল ও সেই খালের ক্ষীণ স্রোতের
সমান্তরাল জীবনের তথ্যচিত্র :

সার্কুলার ক্যানেল

পরিচালক : অলোক দাস
গবেষণা থেকে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত
বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে : রানা সরকার, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ ঘোষ, সোমনাথ দে, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ ঘোষ, গৌতম চৌধুরী, সন্দীপ ঘোষ এবং রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিত্রগ্রহণ : অমিত সেন
সঙ্গীত : গৌতম ঘোষ
চিত্রনাট্য : অলোক দাস
চিত্রনাট্যে সহযোগিতা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
বিশেষ সহায়তা : পবিত্র দে, পরিতোষ দত্ত, মি. পারেক, মালা ঘোষ, সুমিতা দাস।
সম্পাদনা : সুদীপ্ত ভৌমিক, সুমিত ঘোষ।

□

OH, MEN PRODUCTIONS

PAKHIRA

(BIRDS)

47 mts/Col.

A FILM ON FREE THEATRE

Video Cassette is Available (Rs. 300/-)

6F, B. T. Road, Calcutta-700 002

With best compliments from :

LUMEN INDUSTRIES

Regd. Under SSI (Govt. of W.B.)

133 RAY BAHADUR ROAD

(ELYDE FAN BUILDING)

CALCUTTA-700 034

The Vital link in Your Life

Hindustan Cables Limited (HICAB) has been the undisputed leader in telecommunication cables production in the country.

HICAB has grown, over the last 40 years of its existence into a multi-Unit. multi-product company. From paper insulated Dry Core, Coaxial and jelly filled in the conventional range of under ground cables to the production of the State-of-Art Optical Fibre Cables, accessories and micro-processor Controlled testing equipments, and cables accessories.

In the fast changing scenario of technological upgradation in the field of Telecommunication HICAB has kept it self abreast of the frontier telecomtechnology, thereby meeting the vital needs of the nation both quantitatively and qualitatively.

HICAB with its strong R & D backing is constantly striving to serve the nation with improved and updated vital telecomcables and Turnky & consultancy services.

Hindustan Cables Limited

(A Govt. of India Undertaking)

Corporated Office : 9 Elgin Road, Calcutta-700 020

Factories at :

Rupnarainpur, Hyderabad, Naini (Allahabad)
Narendrapur (Calcutta)

Regional Offices :

CALCUTTA : NEW DELHI : MADRAS

□

॥ জেল জীবন অন্য চোখে, অন্য কলমে ॥

মীনাক্ষী সেন

জেলের ভেতর জেল

পাগলবাড়ি পর্ব

পঞ্চাশ টাকা ॥

স্পন্দন

৯, কালীবাড়ি লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩২

□

With best compliments from :

Universal Publicity Co.

Recognised Advertising Agents of
Newspaper, AIR, TV, etc.

169, B. B. Ganguly Street

Calcutta-700 012

Phone : 31-5202/31-4270

□

প্রবীর দত্ত স্মরণে ১৯৯৩

প্রকাশ্য দিবালোকে থিয়েটার ময়দান কার্জন পার্কে, পুলিশ নির্লজ্জভাবে পিটিয়ে হত্যা করল ২৩ বছরের যুবক প্রবীর দত্তকে। তার অপরাধ সে ছিল কার্জন পার্কের থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। দিনটি ছিল ২০শে জুলাই ১৯৭৪।

'৭৪ থেকে '৯৩ প্রতিবারই এই বিশেষ দিনটিকে আমরা কার্জন পার্কে প্রবীর-এর স্মরণে পালন করি। '৭৪-এ যা শুরু হয়েছিল তা আজও শেষ হয়নি, যদিও গত বিশ বছরে পাল্টে গেছে অনেক কিছু। অনেক উত্থান, পতন, প্রতিশ্রুতি, উঠে গেছে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা আইন। তবু একই ভাবে সফ্‌দার হাস্‌মি, রামবাহাদুর সিং খুন হন থিয়েটার করতে গিয়ে। অথচ বহু অপরাধীই বেঁচে আছে আইনী রক্ষাকবজের বিচিত্র প্রহসন। আর তাদের স্বার্থরক্ষায় তৈরী হয়েছে এক আধুনিক বাজার। যেখানে স্নেহ, ভালবাসা, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এমন কি কখনও কখনও থিয়েটারও পণ্য। তবু বিগত বিশ বছর ধরে খোলা ময়দানে যে নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করে চলেছে, অসংখ্য সাধারণ দর্শকের কাছে থিয়েটারকে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্যবহন করে নিয়ে চলেছে, তা আজও বাজারের পন্য হয়ে যায় নি। সে জন্যই হয়ত বলা যায় না, প্রবীর, সফ্‌দার, রামবাহাদুর,-এর পর আর কোন নাম সেখানে তালিকাভুক্ত হবে না।

কার্জন পার্ক নাট্যকর্মীবৃন্দ

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগর এবং বেসরকারি সমাজ

আমি জানি ইতিহাস টাইরেসিয়াস

আমার দু চোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল

বিষ্ণু দে

গোলাম মুরশিদ-সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর' বইটির খ্যাতি আছে। দেখলুম, ওই বইয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, '…বিধবাবিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি [বিদ্যাসাগর] প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষক সমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।'[১]

বদরুদ্দীন উমর নামজাদা বুদ্ধিজীবী। তাঁর এ সিদ্ধান্তে—যদি একে 'সিদ্ধান্ত' বলি—বিমূঢ় বোধ করছি। প্রথমতঃ, নিজের কথা, লেখা ও কর্মের 'মাধ্যমে' সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাটা ঠিক কী বস্তু, তা সহজে বোধগম্য নয়। তারপর, ব্যাকরণ না-হয় বাদই দিলুম, কিন্তু তথ্য ? তথ্য যে অন্য কথাই বলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার কিছু কাল পর থেকে আমাদের ভদ্রলোক-সম্প্রদায়ের অনেকেই কৃষকের কষ্টে গলদশ্রু ; কেউ-কেউ জমিদার-পরিবাদেও পঞ্চমুখ। কিন্তু এই কৃষকবাৎসল্য কখনও তাঁদের খাজনাভোগে বাদ সাধে নি। কৃষকশোষণের ব্যাপারে কথা আর কাজের মধ্যে ভদ্রলোকদের এই-যে পুরুষাণুক্রমিক কারচুপি, এইটে থেকে বিদ্যাসাগর মুক্ত। এক্ষেত্রে তাঁর আচরণ একেবারে নজিরবিহীন। একদা ওপরপড়া হয়ে বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রামের পত্তনিতালুক দিতে চেয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। সে দান নেন নি বিদ্যাসাগর। বলেছিলেন, ওঁর যখন এমন অবস্থা হবে যে সমস্ত প্রজার খাজনা উনি নিজেই চুকিয়ে দিতে পারবেন, তখন নেবেন ওই পত্তনিতালুক। যেযুগে প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই কোনো-না-কোনোভাবে, স্বনামে বা বেনামে, খাজনাজীবী, সেযুগে পত্তনিদারির এমন সুযোগ, এভাবে, এত স্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যানের নজির আর কই ? নীতির কথাটা আরও স্পষ্ট হবে, যদি ঠাকুরদা রামজয়ের কতকটা এই ধরণের একরোখা প্রত্যাখ্যানের একটি ঘটনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই পত্তনিবর্জনের তুলনা করি। বাস্তবিক, রামজয়ের সঙ্গে ওঁর চারিত্রিক মিল তো আছেই ; আশ্চর্যরকমের মিল আছে এই দুজনের জীবনচরিতেও। এরকম একটি সমান্তরাল আখ্যান হল : বীরসিংহ গ্রামে রামজয়ের বাস্তুভূমিটুকু ওঁকে জমিদার মশাই চিরকালের জন্যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করে দেবার প্রস্তাব দিলে, সেই দান এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়ে দেন। এ ঘটনার যে-বিবরণ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, তা পড়ে মনে হয়, এই ভূমিদান গ্রহণ করতে রামজয়ের আত্মসম্ভ্রমে বেধেছিল। অন্য পক্ষে, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা শুধুই আত্মসম্ভ্রমের নয়। বিদ্যাসাগর 'না' বলছেন, অন্য ধরণের এক তীক্ষ্ণ নীতির ওপর দাঁড়িয়ে : তিনি

খাজনাজীবী হতে নারাজ ; তিনি চান, চাষীর জমি নিষ্কর হোক। এই একই নীতি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদকীয়তে। একটু পরেই আমি 'সোমপ্রকাশ'-এর একটি মন্তব্য (২৪ জুলাই ১৮৮২) তুলব, যেখানে সম্পাদক সরাসরি চাইছেন 'প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক'। নীতির, এবং যা আরও বড়ো—আচরণের—প্রশ্ন জড়িত বলেই বিদ্যাসাগরের এই সচেতন প্রত্যাখ্যান আমাদের সামাজিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় তথ্য।

'সম্পূর্ণ উদাসীন' ? কথাতেও ? কিন্তু প্রিয়জন-পরিজনের কাছে তিনি যে-সমস্ত উক্তি করেন তাতে তো 'নিম্নশ্রেণী'র প্রতি ঔদাসীন্য নয়, উদ্বেগময় লিপ্ততাই ফুটে ওঠে। যেমন : 'নব্য ভারত'-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে বিদ্যাসাগর বলেন, 'বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর আবার উন্নতি হইবে ? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি,—স্বার্থ সাধনের উপায় সরূপ [স্বরূপ] মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে ? সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি ! ! হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান ; দেশের শক্তি যাহারা, আশা ভরসা স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন।'[২] দুটি কারণে এই উক্তি গুরুত্বময় : এক. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এই কথাগুলি ছাপেন ১২৯১ সালে চৈত্র মাসের 'নব্য ভারত'-এ, যখন বিদ্যাসাগর জীবিত। সুতরাং এই উক্তির প্রামাণিকতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। দুই. পরে দেখব, চাষীদের প্রতি 'সোমপ্রকাশ'-এর মনোভাবও অনেকটা এইরকম ছিল ; বস্তুতঃ এই মিলটুকু এত বেশি যে লক্ষ না করে পারা যায় না। বিদ্যাসাগরের আরেকটি উক্তি মনে পড়ছে। মৃত্যুর আগে, শেষ রোগশয্যার সূচনায়, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে তিনি বলেছিলেন, 'বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহার দিকে কেহই দেখিতেছে না।'[৩]

আর কাজে ? ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড বা ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারী শুরু হলে হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মধ্যে তাঁর সেবাকর্ম অথবা কর্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের[৪] পরমাত্মীয় করে নেওয়ার খবর তো সকলেই জানে। তবে এরকম উল্টো কথা উমর সায়েব বলছেন কীসের ভিত্তিতে ? কেন ? লোকে তো বরং জানে যে ভদ্রলোকদের সঙ্গেই তাঁর একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায় ; যে-কারণে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক'।[৫] একবার ইংরেজিওয়ালা তার্কিক বাবুদের ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠেন : 'ছেলেপুলেকে আর-যা করি, ইংরেজি তো কখনও শেখাব না, অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নেই।'[৬] শেষ বয়সে, মৃত্যুর বছর সাতেক আগে, আরেকবার উঁচু সমাজের মুরুব্বিদের ধিক্কার দিয়ে ভাষায় রাজা লিয়র-এর সেই আকাশফাটানো বজ্রাগ্নির ঝলক এনে লিখেছিলেন, 'এ দেশের মুখে ছাই ; এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজের মুখে

ছাই…'।[৭] বিদ্যাসাগর-জীবনীর এসব সর্বজনজ্ঞাত, প্রাথমিক তথ্য কি বদরুদ্দীন উমর জানেন না? না, বেয়াড়া তথ্যের ওপর ধামা চাপা দিয়ে ঝোঁকের মাথায় তাত্ত্বিক ছক বানানোর রোগ তাঁকেও পেয়ে বসেছে? তাহলে ভয়েরই কথা। কারণ, কী শিল্পসাহিত্যে, কী রাজনীতিতে, এই বাবুবিকারের প্রকোপ আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

'সাধারণী'-র ফাইলে আমি একটা খবর পেয়েছি, যা উমর সায়েবের 'সিদ্ধান্ত' সম্পর্কে আরও সংশয় জাগায়। খবরটা এই: একবার জনরব রটেছিল, বিদ্যাসাগর মশাই এমন একটা কৃষকসভা বানাতে চান, যেখানে জমিদাররা ঢুকতে পারবে না। এই খবর, আর তা পেশ করার ধরণ, আজকের পাঠকদের উপাদেয় লাগবে বলে, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৮০ সালের 'সাধারণী' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আমি সবিস্তারে তুলে দিচ্ছি:

'আমরা অদ্য বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর প্রজাদিগের প্রতি একটি বিশেষ কর্ত্তব্যকর্ম্মের উল্লেখ করিব।… ইহাদিগের শোণিতশোষী অনেকগুলি জলৌকা আছে। জমীদারের পর, পত্তনীদার দরপত্তনীদার নায়েব গোমস্তা প্রভৃতিতে ইহাদিগকে অনেক সময়ে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে।… গোলযোগের আশঙ্কায় ইহারা আপনাদিগের পিতল কাঁসা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া থাকে। এইপ্রকার তপস্বীদিগের প্রতি কি কেহই মনোযোগ বিধান করিবেন না? যাহারা অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে; যাহারা সকলকে জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে, তাহারা চিরকালই এইরূপ পদদলিত হইতে থাকিবে?…

'ব্রিটীশ ইন্ডিয়ান সভা জমীদারদিগের। জমীদারগণ, হয়ত স্বার্থহানির আশঙ্কায়, প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা গবর্ণমেন্টে জ্ঞাপন করেন না। অধিক কি, ভারতবর্ষীয় সভার একজন প্রধান সভ্য ও একজন প্রধান জমীদারের এলাকাস্থ প্রজার প্রতি অত্যাচার কোন সম্বাদপত্রে আন্দোলিত হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত সভাতে যাহাতে স্বার্থপর জমীদারদিগের কোনরূপ সংস্রব না থাকে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

'একবার জনরব উঠিয়াছিল, প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় এইরূপ একটি সভা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।' ('বঙ্গদেশের প্রজার জন্য কি কর্ত্তব্য')

তারিখটা লক্ষ করুন: ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৮০, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর তখন বেঁচে আছেন— প্রবল দাপটে বিরাজ করছেন, বলা উচিত। অথচ এ খবরের কোনও প্রতিবাদ 'সাধারণী'র পাতায় বেরোয় নি। 'সাধারণী'র চোদ্দ-পনের মাস আগে (১৫ ভাদ্র ১২৭৯, ৩০ অগস্ট ১৮৭২) 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ'[৮] অনেকটা একই রিপোর্ট ছাপে। আর তারও কোনও প্রতিবাদ 'এডুকেশন গেজেট'-এ বেরোয়নি। প্রতিবাদ তো কোথাও পাচ্ছি না বটেই, বরং 'সাধারণী'র ওই প্রবন্ধের মাসতিনেক আগে, ২৪ ভাদ্র ১২৮০, 'সোমপ্রকাশ' যা লেখে তাতে 'এডুকেশন গেজেট' আর 'সাধারণী'র এই খবরের তির্যক সমর্থনই হয়তো পেয়ে যাচ্ছি:

'আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে

তাহাতে তাহারা যে ত্বরায় আপনাদের কষ্ট গবর্ণমেন্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটী সভা করিয়া সর্ব্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই।...শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্তমাংসে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অধর্ম্মাচরণ প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।' ('উভয় সঙ্কট')

অতএব, এই 'জনরব'-কে নেহাৎ ভিত্তিহীন রটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসমীচীন। উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না আরও এই কারণে যে কৃষকদের সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর পাতায় আরও বহু লেখা বেরিয়েছিল ; পরের উদ্ধৃতিগুচ্ছেও সেই আহ্বানের কিছু প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। আসলে, চাষী-মজুরের প্রতি বিদ্যাসাগরের মনোভাব কী ছিল, তা নির্ণয়ের একটা পরোক্ষ উপকরণই হচ্ছে 'সোমপ্রকাশ'।

বিদ্যাসাগর ছিলেন ' "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার আদি-পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা'।[৯] 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর জবানবন্দি অনুযায়ী, 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রথম সংখ্যা স্বয়ং বিদ্যাসাগরেরই লেখা (এই সংখ্যাটি কোনোদিন পাওয়া গেলে তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতের প্রত্যক্ষ দলিল আমাদের হাতে আসবে)। তাছাড়া তিনি পরামর্শ দিয়ে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনায় বিদ্যাভূষণ মশাইকে বিশেষ সাহায্য করতেন।[১০] শুধু তা-ই নয়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পরেও, বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। অতএব, এ-অনুমান যুক্তিসংগত : এই পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে তিনি মোটামুটি একমত ছিলেন। অন্ততঃ বিদ্যাসাগরের মেজাজ বা চারিত্র যতটা জানি, 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে তাঁর খুব গুরুতর মতান্তর ঘটলে, তিনি নিশ্চিত এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতেন। নানান সামাজিক প্রশ্নে কী ছিল 'সোমপ্রকাশ-এর অভিমত ? এ-পত্রিকা কি চাষী-মজুরের স্বার্থের প্রতি 'উদাসীন' ছিল ? 'সোমপ্রকাশ' শ্রেণীগত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বা বিভ্রমের বাইরে যেতে পারে নি ঠিকই ; তবে এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে সেযুগে কৃষক-শ্রমিক-কুলিদের বড়ো বন্ধু ছিল এই পত্রিকা। দেশী জমিদার আর বিদেশী নীলকর ও চা-করদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'সোমপ্রকাশ'-এর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ-সব বিষয়ে কী ধরণের মতামত 'সোমপ্রকাশ'-এ ব্যক্ত হত, তার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া যাক :

১. ' "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি" এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দগুলি নিরন্তর আমাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এ-দেশীয়দিগের বিশেষতঃ কৃষক ও মজুর-দিগের স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার সহায় না হইয়া প্রত্যুত তাহাদিগকে দাসবৎ নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহারা ভারতবর্ষের কি প্রকার বন্ধু ? কোন্ ব্যক্তি তাহাদের নিকট এ দেশের যথার্থ স্বাধীনতা, সৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা করেন ?...
'নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের রাজনীতি ও স্বাভাবিক স্বত্বের জ্ঞান জন্মিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহ ও তদ্ঘটিত জাতিবৈর নিবন্ধন বঙ্গদেশ, উত্তম-পশ্চিম অঞ্চল, বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া ক্রমশ একতায় উন্মুখ হইতেছেন। এইরূপে ইঁহারা অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে রিডসডেল [প্ল্যান্টার সায়েব] প্রভৃতি দুরাত্মার দৌরাত্ম্য নিবারণ কি দুরূহ হইবে ?' ('আসামে চা-কর, হিন্দু পেট্রিয়ট ও ফিনিক্স', ২৫ কার্তিক ১২৬৯)

২. 'সম্প্রতি এদেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতীকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগের দেশের জমীদার-দিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে একপ্রকার আচ্ছন্ন হইয়া আছে।...অত্রত্য অসৎ ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে-ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ ! এরূপ অনুমান করিবেন না যে, এ-দেশের পুরাণ পাপীরা (জমীদারেরা) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।
'...দশ আইনে আছে, জমীদারেরা প্রজাগণকে আপন গৃহে ধরিয়া আনিয়া খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অনেক জমীদার আছেন, তাঁহারা এই আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রজাগণকে স্বগৃহে ধরিয়া আনিয়া যার পর নাই পীড়ন করিয়া থাকেন।...
'জমীদারেরা কি চিরকাল অবিরোধিত রূপে এইরূপ অত্যাচার করিবেন ? ইহার কি নিবারণের উপায় নাই ?...রোমীয় পেট্রিসীয়দিগের গর্ব কিরূপে চূর্ণ হইয়াছিল ? ফরাসী জমীদারেরা কৃষকাদির নিকটে পরাস্ত হইয়াছিল কেন ? কৃষকাদির অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই কি তাহার কারণ নহে ?' ('অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমীদারেরাও বড় কম নন', ২০ শ্রাবণ ১২৬৯)

৩. 'সর হিউ রোজ যথার্থই সৈন্য ও অফিসারদের অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা একদিনের বেতন আলবর্ট [মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী] স্মরণীয় ফন্ডের জন্য দেন। এ অনুরোধ করা অন্যায়, যদিও করা হইয়াছে, মাঞ্চেস্টরের মজুরদিগের নিমিত্ত করিলে ভাল হইত'। (৩ আষাঢ় ১২৬৯)

৪. '...আমাদের একান্ত অভিলাষ, রুশ গবর্ণমেন্ট যেমন জমিদারদিগকে ভূমির মূল্য

দিয়া প্রজার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও ভারতবর্ষে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেক ভূস্বামিকে তাঁহার জমিদারীর মূল্যস্বরূপ লাভের বিশ গুণ পণ প্রদত্ত হউক। ঐ পণের অর্দ্ধেক প্রজাগণ দিবে অর্দ্ধেক গবর্ণমেন্ট দিউন। প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক। ইহাতে মহোপকার সাধিত হইবে। কৃষকগণের গৃহে অর্থ সঞ্চিত হইবে, কদাচিৎ দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইবে না। তাহারা ক্রমে উন্নত হইয়া সমাজের পদস্থ লোক হইয়া উঠিবে। যে সমাজে অধিকসংখ্যক সচ্ছল লোকের বাস না থাকে, সে সমাজ উন্নত হয় না। এ দিকে জমিদারের হস্তে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাঁহারা নানা প্রকারে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। গবর্ণমেন্টেরও রাজস্বের বিন্দু-পরিমিত ক্ষতি হইবে না, নির্দ্ধারিত কর দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। অধিকন্তু একটী মহৎ পক্ষপাতও দেশ হইতে এককালে নিরাকৃত হইবে। কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়া বহুবিধ করভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, কদাচিৎ তাঁহাদিগকে যৎসামান্য কর দিতে হয়। এই কুপ্রথাটী কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ ইহাতে লোকের আশ্চর্য বোধ হয় না, নচেৎ এবম্বিধ নিন্দনীয় কুরীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকে, ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।' ('ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম', ৯ শ্রাবণ ১২৮৯)

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'-এর চতুর্থ খণ্ডে 'সোমপ্রকাশ'-এর অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ে এর মোট ৫৫টি রচনার মধ্যে ২২টি কৃষক সম্পর্কিত আর ৮টির বিষয়বস্তু শ্রমিক ও কুলিদের সমস্যা। 'সোমপ্রকাশ'-এ কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের ওপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হত তার একটা মোটামুটি ধারণা এই হিশেব থেকে পাওয়া যাবে। অবশ্য এ হিশেব আংশিক ; কারণ, 'সোমপ্রকাশ'-এর অর্থনীতি-বিষয়ক যত লেখা এখনও পাওয়া যায়, তার সবগুলি বিনয়বাবুর এই বইয়ে নেওয়া হয় নি। যেমন, ওপরে উদ্ধৃত চারটি রচনার মধ্যে প্রথম, তৃতীয় আর চতুর্থটি স্থান পায় নি এ-সংকলনে।*

---

* আর চাষীরা কী চোখে দেখত 'সোমপ্রকাশ'কে? ওরা যে 'সোমপ্রকাশ'-এর ওপর কতটা ভরসা করত, তার একটি বিবরণ নথিবদ্ধ হয়ে আছে বাসুদেবপুর গ্রামের ছজন সদ্গোপ চাষীর একটি চিঠিতে। সেই চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলছি। এ চিঠিখানি বেরোয় ২৯ পৌষ ১২৭৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশ'-এ :

'আজি আমাদের ধান্য ক্রোক হইয়া বাড়ী লুট কেসাৎ হইয়া গেল ; আজি আমারদের জমির কৃত্রিম বিক্রয় কবলা প্রস্তুত হইয়া গেল ; আজি আমারদের নামে মিথ্যা কর্জ্জের খত প্রস্তুত হইল ; আজি শুনিলাম সমন আসিয়াছে। আজি শুনিলাম ডিক্রিজারি হইয়াছে, ক্ষণেক পরেই আমারদিগের বাটী (এই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর) ছাড়া হইতে হইল!!! সম্পাদক মহাশয়! আমরা দীন হীন আমাদের সকল দিকেই বিপদ। ইহার কি উপায়ান্তর নাই? আমরা নিতান্ত দুঃখী আমাদের অর্থ নাই, লোকবল নাই, ভরসাও নাই, তবে দেখিতেছি যে মহাশয় একমাত্র ভরসাস্বরূপ।'

দুই

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,'…"হিন্দু পেট্রিয়ট"-এর মতো "সোমপ্রকাশ" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না'।[১১] এই ধরণের মন্তব্য তিনি ঘুরে ফিরে এতবার করে ফেলেন যে বিলক্ষণ বোঝা যায় : একেবারে গোড়ায় গলদ ! আসলে, হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আর বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'—দুটো কাগজেরই—বিষয়ে ওঁর ধারণা বড়োই ঝাপসা ! নীলকরদের বিরুদ্ধে হরিশ মুখুজ্জে (১৮২৪-১৮৬১) 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ যেভাবে কলম ধরেন, তার জন্যে তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ; চাষীর, বিশেষতঃ নীলচাষীর প্রতি তাঁর উদ্যোগী দরদও নিশ্চয় চিরকাল স্মরণযোগ্য ; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের দাবি তিনি আবার তুললেন কবে ? কেউ নীলপ্রথার বৈরী হলে, তিনি সে জমিদারিপ্রথারও বৈরী হবেন, এইটে মোটেই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এমনকি এইটেও স্বতঃসিদ্ধ নয় : কেউ জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরলে (হরিশ যেমন ধরেছিলেন) তিনি জমিদারপ্রথারও বৈরী হবেন।[১২]

নানান ধরণের মানুষ এসে জড়ো হলেও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (প্রতিষ্ঠা কাল : অক্টোবর ১৮৫১) ছিল আদতে জমিদারসভা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৫৩) ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় তার মুখপত্র। হরিশ মুখুজ্জে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন ১৮৫২ সালে। নীলমণি মুখোপাধ্যায় তো লিখেছেন—কথাটা তাঁর আগে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও বলে গেছেন—কার্যতঃ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল হরিশের 'এম্প্লয়্যার' অর্থাৎ মনিব।[১৩] ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের সঙ্গে হরিশ কতটা জড়িত ছিলেন, সে বিষয়ে, কপালগুণে, আমরা একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর এজাহার পেয়ে যাচ্ছি। তিনি দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬২ সালের ২৬ জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এক স্মৃতিসভায় দীনবন্ধু বলেন, 'কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে' ('সোমপ্রকাশ', ১১ অগস্ট ১৮৬২, পৃ. ৪৭১)। নীলকরদের সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক যতই আদায় কাঁচকলায় হোক না কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংকীর্তন গাইতে এই জমিদারসভা কখনও পিছ-পা হয় নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর নীতিও ছিল মোটামুটি এই সুরেই বাঁধা। সেই কারণে 'সোমপ্রকাশ' লেখে, '…ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদার-দিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত…' এই মন্তব্য 'সোমপ্রকাশ' করে ১৮৭৩ সালে। তার ঢের আগেও—খোদ হরিশ মুখুজ্জের আমলেও (১৮৫৩-৬১)[১৪]—'হিন্দু পেট্রিয়ট' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবিরত সমর্থন জানায়। এখানে তার গোটা কয়েক উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'উচ্ছেদের প্রশ্নে' 'উৎসাহী' হওয়া তো দূরে থাক, এই বন্দোবস্ত তুলে

দেবার তত্ত্বগত জল্পনাকেও ১৮৫৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, 'অ্যাবসার্ড'। অর্থাৎ আজগুবি। প্রবন্ধটির নাম : 'ইংলিশ স্ট্রাইক্স অ্যান্ড বেঙ্গলি ধর্মঘট্স'। লেখাটি সেকালে খুবই খ্যাতি লাভ করে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ তো লেখকের নাম থাকত না। তবে, ১৮৮৭ সালে জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল মশাই বলে গেছেন, এ প্রবন্ধটির লেখক হচ্ছেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।[১৫] লেখার ভিতরকার নানান খুঁটিনাটি প্রমাণ থেকেও মনে হয়, এইটে খুব সম্ভব হরিশেরই লেখা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মূল মনোভাব সূত্রবদ্ধ হয়ে আছে পয়লা জুন ১৮৫৪ সালের একটি প্রবন্ধের এই বয়ানে : 'এই মহৎ বন্দোবস্ত ['গ্রেট সেটলমেন্ট']…ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে দেয় স্থিতি আর দেশকে দেয় শান্তি।' এই মূল ভাবনা পূর্ণতর রূপ নেয় 'পারমানেন্ট সেটলমেন্ট' শিরোনামায় মুদ্রিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। সে লেখাটি বেরোয় সিপাহি বিদ্রোহের আগুন নেবার পরে, ১৮৫৮ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠায়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এ প্রবন্ধের লেখক হিশেবে হরিশকেই শনাক্ত করে গেছেন ; লেখাটি নিয়েওছেন হরিশের রচনাবলির সংকলনে। সমস্ত সম্পাদকীয় ওজন দিয়ে এই প্রবন্ধে বলা হল : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যা-ই দোষত্রুটি থাক-না-কেন, কথাটা তো স্পষ্ট যে, এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী একমাত্র ভূমিব্যবস্থা। এরই আওতায় জনগণ প্রগতি আর সমৃদ্ধির মুখ দেখবে—তাদের সভ্যতা দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব নেবে ; কায়েমি রাজশক্তির সঙ্গে তাদের হৃদ্যতাও দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে উঠবে। [চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত]…জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষাকে লালনও করবে, চরিতার্থও করবে। প্রমাণিত হয়েছে : এই ভূমিব্যবস্থাই গবর্নমেন্টের সবচেয়ে বড়ো শক্তির উৎস এবং হিন্দুস্তানকে ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার দৃঢ়তম বাঁধন। এই সত্যিটা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করল সিপাহি বিদ্রোহ।…চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না-থাকলে, গোটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিই ইংল্যান্ডের হাতছাড়া হয়ে যেত।'

আসলে, ভূমিসম্পর্ক নিয়ে কোনও নতুন আইনের প্রস্তাব উঠলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তার বিচার করত একটাই নিরিখে : প্রস্তাবিত ঐ আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কিছুমাত্র বদলায় কি না। সেই 'মহৎ বন্দোবস্ত'-এর গায়ে আঁচড়টি কাটার জো নেই : যা কিছু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকূল, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তার পরিপন্থী। এই কারণে, কী ১৮৫৪ সালে, কী ১৮৫৭ সালে, সেল ল'-এর অদলবদল ঘটানোর কথা উঠলে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আবার, জমিদারদের ওপর যখনই প্রত্যক্ষ কর আরোপের প্রস্তাব আসে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তখনই তারস্বরে প্রতিবাদ জানায় এই যুক্তিতে যে ঐ কর বসানোর মানেই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে অস্ত্রাঘাত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একচুল হেরফের বরদাস্ত করতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট একেবারেই নারাজ। তার কারণ হিশেবে সে বারবার জোর গলায় বলে,—যেমন, ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'আন্ডারটেনিওরস' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত তো শুধু এক রাজস্ব-ব্যবস্থাই নয়, এ হল একটি রাজনৈতিক চুক্তি। সুতরাং সেই কর্নওয়ালিসি বন্দোবস্তের একতিল নড়চড়, আদতে, চুক্তিভঙ্গেরই অপরাধ। শুধু চুক্তিই নয়, হয়তো আরও বেশি। তাই, একটু পরে, ওই একই প্রবন্ধে আরও এক ধাপ এগিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দাবি করল : জনকয়েক উন্মাদ ছাড়া আর সকলেই মানে— চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালির স্বাধিকারের রক্ষাকবচ। একই স্বরে ১৮৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আবার লেখে : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলা দেশকে দিয়েছে একটি ম্যাগনা কার্টা।'

এ তো গেল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর কথা। এবার 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রসঙ্গে আসি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ'-এর মনোভাব আরও অনেক জটিল। আরও জটিল, কারণ, প্রথমতঃ, এ বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর মত এক বিন্দুতে স্থির থাকেনি ; কালক্রমে বদলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নানান সময়ে ভূমিসম্পর্ক নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' যা যা বলল, তাতে কয়েক জায়গায় অসংগতিও দেখতে পাই। আসলে, এক মৌলিক অসংগতি ছিল সমাজের বাস্তবে—মূল উৎপাদন-সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রে। এ-গোষ্ঠী বা ও-গোষ্ঠী নয়, বাঙালি সমাজের কল্যাণকে সমগ্রতঃ—সব সময়—চোখের সামনে রাখব, এইটেই ছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর দায়। স্বেচ্ছায় বেছে-নেওয়া এক আম্‌পায়্যার বা মধ্যস্থের ভূমিকা! কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে—বিশেষতঃ খাজনাবৃদ্ধি আর জমির মালিকানার প্রশ্নে—একদিকে ভূমিস্বত্বজীবীর, অন্যদিকে চাষীর, যে-মূল অবস্থান, সেটা এতই আড়াআড়ির, যে, তার মধ্যে কোনও মোলায়েম সমন্বয়-তৈরির আর বড়ো-একটা জায়গা ছিল না। মুখোমুখি দুই বৈরী শিবির : আর, এই আপসনিষ্পত্তিহীন দ্বন্দ্বক্ষেত্রে এক মধ্যস্থের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে 'সোমপ্রকাশ' যতই সালিশরফার চেষ্টা করছে, কেন্দ্রীয় উৎপাদন-সম্পর্কের সেই মূলগত অসংগতি ততই ফেটে ফেটে বেরুচ্ছে। প্রায়-অনিবার্যতঃ 'সোমপ্রকাশ'-এর মতামতেও বারবার দেখা দিচ্ছে বিপরীত চাপ, টানাপোড়েন, অসংগতি। এখানে তার একটাই উদাহরণ দেব। একই বাঙলা সালের—১২৭৮ বঙ্গাব্দের—দুটো প্রবন্ধ। ১২ বৈশাখ ১২৭৮ সালের সম্পাদকীয়টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে লেখা। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে গজিয়ে-ওঠা 'প্রজা ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী পত্তনিদার, দরপত্তনিদার মোকররিদার আয়মাদার' ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীর স্তুতিকীর্তন করছে 'সোমপ্রকাশ' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং বৃটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ')। আবার ঐ বছরেরই শেষের দিকে, ৯ই মাঘের, সম্পাদকীয়তে এই সব মধ্যস্বত্বজীবী জমির জোঁকের উচ্ছেদ চেয়ে 'সোমপ্রকাশ' লিখছে : 'অনেকবার এই সোমপ্রকাশে এগুলি রহিত করিবার এক বিধি-বিধানের অনুরোধ করা হইয়াছে' ('দুরাত্মা জমিদারদিগের হস্ত রোধ করিবার একটি উপায় করা আবশ্যক')।

'সোমপ্রকাশ'-এর এই দৃষ্টিবিভ্রম আর অসংগতি তো নিরেট সত্যি ; সেটা না-মানার জো নেই। এই সত্যিটুকু পুরোপুরি কবুল করে নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিদ্যা-

ভূষণের কতকগুলি মূল বক্তব্য এবং তার কালক্রমিক বিবর্তন 'সোমপ্রকাশ'-এর ফাইল থেকে হয়তো ছেঁকে বার করে আনা যায়।

প্রথম কথাটা এই যে, সন্দেহ নেই, 'সোমপ্রকাশ' বহুদিন অবধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে মেনে নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে দেশের 'সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৮ অগস্ট ১৮৬২, পৃ. ৪৮০-৪৮১) হচ্ছে এবং হবে, এরকম জয়ধ্বনিও 'সোমপ্রকাশ' মাঝে মাঝে দিচ্ছে। এমনকি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে কখনও-বা বলে উঠছে, জমিদারের ওপর শিক্ষা-কর, রাস্তা-কর বসানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ; সুতরাং সেটা ইংরেজের পক্ষে কথার খেলাপ। অর্থাৎ সেই আদিম চুক্তিভঙ্গের অপরাধ ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং বৃটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ', 'সোমপ্রকাশ', ১২ বৈশাখ ১২৭৮)! তবু তলিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারি, একথাও সত্যি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে গ্রহণের পাশাপাশি একটি সমালোচনাও গড়ে তুলছিল 'সোমপ্রকাশ'* ; অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে এই সমর্থন মোটেই অকুণ্ঠও নয়, নিঃশর্তও নয়। প্রথম সমালোচনা বা শর্তটা কী ? 'সোমপ্রকাশ'-এর নিজের বয়ান তুলেই জবাব দেব : 'আমরা চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সপক্ষতা করিতেছি বটে, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের বন্দোবস্তের সপক্ষ নহি। এবন্দোবস্তের একটি মহান দোষ আছে। এতদ্বারা জমীদারদিগেরই হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কৃষকদিগের স্বত্ব ও অধিকারের বিষয়ে তাদৃশ যত্ন করা হয় নাই' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'সোমপ্রকাশ', ১৮ অগস্ট ১৮৬২)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 'সোমপ্রকাশ' সমর্থন করেছিল আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়ে : জমিদার যা রাজস্ব দেবে, সেটা যেমন গবর্নমেন্ট চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, জমিদারকে চাষী যে-খাজনা দেবে, সেটাও তেমন সর্বকালের জন্যে বেঁধে দেওয়া হোক। একেই বিদ্যাভূষণ স্লোগানের মতন করে বলতেন : 'প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত!' সেই ১৮৬২ সাল থেকে ভূমিসম্পর্ক নিয়ে এই এক মূল নীতি বরাবর প্রচার করে

* অনেক আগে, ১৮৩৮ সালে, 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের যে-মনোভাব পাচ্ছি, তার সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এর এই মনোভাবের খানিকটা মিল আছে। রাজস্ব বেঁধে দেওয়ার জন্যে দেশের মঙ্গল হয়েছে, এই কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করলেও, বিদ্যাসাগর তার দুটো খুঁত দেখাচ্ছেন : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ না হইয়া, যদি পূর্ব্বের ন্যায় রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে ; প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা আবাদ করিয়া, চির কাল, ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূম্যধিকারীদিগের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চবিংশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ. ১২৩-২৪।

গেছে 'সোমপ্রকাশ' ; কখনও সে-নীতি থেকে একচুল নড়ে নি। 'প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ঠিক এই নামেই এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'সোমপ্রকাশ' (১৫ জুলাই ১৮৭৮) লেখে : '...আমরা...জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বহুদিন অবধি প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। ...আমাদিগের অভিমত স্থায়ী বন্দোবস্ত। আমাদিগের মতে সেই বন্দোবস্ত এরূপে হওয়া উচিত যে সেই বন্দোবস্তের ভূমি সকল দান বা বিক্রয়াদির দ্বারা প্রজারা কোনরূপে হস্তান্তর করিতে না পারে। জমিদার সেই ভূমির উপস্বত্ব হইতে আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিবেন কিন্তু জমী কোন ক্রমে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। মহাজনের দেনায়ও উহা বিক্রয় হইবে না। কেবল দখলী স্বত্ববান প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আমাদিগের অভিমত নহে। যাবতীয় ঠিকা প্রজা ও যাহাদিগের জমি সম্পর্ক নাই তাহারা যদি জমী গ্রহণার্থী হয় সেই সমুদয় প্রজাকে লইয়া এই বন্দোবস্ত করা আমাদিগের অভিপ্রেত। তাহা হইলেই আমরা যে উদ্দেশে এই স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহা প্রকৃত রূপে সুসিদ্ধ হইবে' ('প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৫ জুলাই ১৮৭৮)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরও একটা সমালোচনা থেকে 'সোমপ্রকাশ' এক পা সরে নি : লর্ড কর্নওয়ালিস জমির মালিক ঠিক করতে গিয়ে বেবাক ভুল করে বসেন। 'সোমপ্রকাশ' বলে : 'উক্ত লার্ড [অর্থাৎ কর্নওয়ালিস] কৃষকদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি জমীদার-দিগের হস্তে সর্ব্বস্ব প্রভুতা প্রদান না করিতেন, তিনি ভূমির প্রকৃত স্বামীর আবিষ্করণে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতাম' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৮ অগস্ট ১৮৬২)। জমির মালিক কে ? এ প্রশ্নে 'সোমপ্রকাশ'-এর বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব ছিল না। সে নির্দ্বিধায় একবাক্যে রায় দিয়েছে : 'কৃষকেরাই ভূমির যথার্থ অধিকারী' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৮ অগস্ট ১৮৬২)। নিঃসংশয়ে, শাদা কথায় জানিয়েছে : 'আমরা জমীদারকে প্রকৃত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করি না' ('প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৫ জুলাই ১৮৭৮)। ঠিক এখানেই হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে তার মৌলিক তফাৎ। একেবারে এর বিপরীত মেরুতে খাড়া দাঁড়িয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জোর গলায় হরদম বলে গেছে : কোনও প্রশ্নই নেই, চাষী নয় ; জমির একচ্ছত্র মালিক হচ্ছে জমিদার।[১৬]

চাষীই জমির মালিক—এই প্রতিপাদ্যকে যুক্তিতথ্যের মারফৎ ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশ' বলল : 'কৃষকদিগের ভূমিতে আপনার বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে যে, কি মহা লাভ হয়, তাহা আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডের যে যে প্রদেশে কৃষকদিগের স্থায়ী স্বত্ব ও কৃষকাধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের কৃষিকার্য্যের উন্নতি দর্শন করিলেই বিদিত হইবে' ('জমীদার ও কৃষকের খাজনা ঘটিত বিবাদের মূল উৎপাটন করিবার উপায় কি ?' ১৪ মার্চ ১৮৮১)। কম্‌বর্‌ল্যান্ড, ওয়েস্টমরল্যান্ড, সুইজার-ল্যান্ড, নরওয়ে, ইংলিশ চ্যানেল-এর গারন্সি দ্বীপ—এইরকম আরও নানান অঞ্চলের,

পর-পর দৃষ্টান্ত দিয়ে 'সোমপ্রকাশ' তন্ন তন্ন করে দেখাল : যেখানেই জমির মালিক চাষী, সেখানেই জমির ফলনও বেশি, চাষীও স্বচ্ছল।

দেখলুম : বহু দিন অবধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 'সোমপ্রকাশ' সমর্থন জুগিয়েছে ঠিকই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সমালোচনাও রচনা করে চলেছে। যার প্রধান কথা হচ্ছে : প্রথমতঃ, বাঙলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে-আকারে চালু হল তার মস্ত দোষ এই যে সেখানে চাষীর অধিকার আর স্বত্বের ওপর নজরই পড়ল না। দ্বিতীয়তঃ, 'সোমপ্রকাশ' দাবি তুলল : চাষীর সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। তৃতীয়তঃ, 'সোমপ্রকাশ' বলল : জমিদারকে জমির মালিকানা দিয়ে লর্ড কর্নওয়ালিস গোড়ায় গলদ করে বসেছেন ; জমির আসল মালিক হচ্ছে চাষী। এই-যে তিনটে মূল বক্তব্য, এদের একটি সুতোর মতন গেঁথে রেখেছে একটি বোধ : চাষীকে সম্মান-দেওয়ার ইমান। আর এই অবস্থান থেকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে, শেষ অবধি, একটা সময়ে এসে 'সোম-প্রকাশ' চাইল : ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুলে দাও ঐ জমিদারি-প্রথা ! চাষীকেই দাও জমির মালিকানা ! এই ভাবনার একটি স্পষ্ট বয়ান পেয়ে যাচ্ছি বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর চার বছর আগে—১৮৮২ সালের ২৪ জুলাই তারিখে—মুদ্রিত তাঁর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। তার নাম : 'ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম'। যেখানে বিদ্যাভূষণ সোজাসুজি বলছেন : 'কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়া বহুবিধ করভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, কচিৎ তাঁহা-দিগকে যৎসামান্য কর দিতে হয়। এই কুপ্রথাটি কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ ইহাতে লোকের আশ্চর্য্য বোধ হয় না, নচেৎ এবম্বিধ নিন্দনীয় কুরীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকে, ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।' আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে বিদ্যাভূষণের এই সম্পাদকীয় বিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য। সংগত ভূমিনীতির স্পষ্ট বয়ানের দিকে এ লেখাটি এক জোরাল পদক্ষেপ। এ লেখাতেই 'সোমপ্রকাশ' দাবি তুলল : 'প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক' ! বিদ্যাসাগর যে - নীতির ওপর, শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে, বর্ধমান-মহারাজের দেওয়া বীরসিংহের সেই পত্তনি প্রত্যাখ্যান করেন, তার সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এর এই সুতীক্ষ্ণ দাবির অন্তর্যোগ তো আমি এ আলোচনার শুরুতেই দেখিয়েছি।

তিন

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, '"হিন্দু পেট্রিয়ট"-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র যেভাবে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কোনদিন চিন্তাও করেন-নি।'[১৭] চিন্তাও করেন নি কোনও দিন ? ঐতিহাসিক তথ্য কিন্তু অন্যরকম। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালানোর ভার বিদ্যাসাগরের হাতে আসে। সম্পাদকের কাজে তিনিই কৃষ্ণদাস পালকে বহাল করেছিলেন ; কৃষ্ণদাসকে দিয়ে পছন্দমাফিক প্রবন্ধও লিখিয়ে নিতেন তিনি। বিদ্যাসাগরের 'হিন্দ পেট্রিয়ট' নীলু-

বাঁদরদের চাবকাতে কিছুমাত্র কসুর করেনি। ১৮৬১ সালের ২ ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ এই বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল যে অতঃপর সমস্ত রচনা বিদ্যাসাগরের বা সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। আর ঐ তারিখের কাগজেই সম্পাদকীয় নীতিঘোষণার সূত্রে যা বলা হল তার সারাংশ এই : 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কোটি কোটি জনগণের মুখপত্র হিশেবে কাজ করে যাবে ; ব্যক্ত করবে, কায়েম করবে দেশবাসীর স্বার্থ আর অধিকার। আর অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে এই পত্রিকা হরিশ্চন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।* নীতির এই বয়ান যদিবা স্বয়ং বিদ্যাসাগরের না-ও হয়, তাঁর নির্দেশে, অনুমোদনে লেখা—একথা নিশ্চিত।

অমল হোমের 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ'-এর আদলে কৃষক বিদ্যাসাগরের চোখ-ঝলসানো নতুন প্রতিমা খাড়া করবার বাসনা আমার নেই, কৃষি-বিপ্লবের নবী রূপে তাঁকে হাজির করা তো দূরস্থান। আমার প্রতিপাদ্য শুধু এইটুকু : বিদ্যাসাগর কৃষকসমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি 'সম্পূর্ণ উদাসীন' ছিলেন, এই পাইকারি ফতোয়ার পেছনে না-আছে যুক্তি, না-আছে তথ্য। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, সংসারটা নাকি আদৌ জমিতে বদ্ধমূল নয়, শূন্যে দুল্যমান। বদরুদ্দীন উমরের মতন মার্ক্সবাদী লেখকের হাতে ইতিহাসবিদ্যাটা যদি এরকম মেটাফিজিক্যাল অর্থাৎ ঊর্ধ্বমূল অবাক্শাখ হয়ে ওঠে, তবে, অন্যে পরে কা কথা!

চার

শুধু ইতিহাস নয়, তাঁর মার্ক্সবাদ প্রয়োগের ধরণটাও মেটাফিজিক্যাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর কেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামেন নি, এটাই হয়তো বদরুদ্দীন উমরের আসল অভিযোগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন মাও হলেন না—এ আক্ষেপ অবান্তর।

কথাটা কাণ্ডজ্ঞানের : সমস্ত মানুষকে কি একই কাঁটায় ওজন করা যায়? ইতিহাসের ব্যক্তিবিশেষকে বিচারের আগে তো তাঁকে বোঝা চাই? কী করে সেই ব্যক্তিকে বুঝব, যদি-না তলিয়ে দেখি : ওঁর কাজের সেই বিশেষ ক্ষেত্রটা কী?

মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকে কয়েকটি পৃথক এলাকায়, স্তরে, ভাগ করে দেখতে পারি। তার একটি হল সরকারি সমাজ, রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র। অন্য এক এলাকাকে মার্ক্স বলতেন 'গেমাইন্শাফ্ট'। সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষায় একে বলে 'কমিউনিটি'। এর তর্জমা করতে পারি 'কৌম'। আবার—একটু ব্যাপক হলেও—

* 'A word about our policy. We will unflinchingly assert native rights and advocate native interests, and so far we will continue [as] a party organ, that is, an organ of the millions, a privilege, however, which under ordinary circumstances seldom falls to the lot of a journalist. In all other respects, we will endeavour to tread in the footsteps of the illustrious dead, who founded and wielded with such great mastery and honour this new power in the realm...'

বাঙলায় এর আর-একটা নামও দেওয়া যায় : 'রাষ্ট্রেতর সমাজ' বা 'বেসরকারি সমাজ'।[১৮] প্রথম এলাকাটি আমলাসংকুল, ফৌজ-পুলিশের দাঁতে-নখে সাজানো শাসনিক ইস্পাত-যন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত। দ্বিতীয় এলাকায় পড়ে সরকারবাহাদুর নামক ঐ মহাকায় যন্ত্রের চৌহদ্দির বাইরেকার এক আবহমানের সাধারণ্য, কৃষকসমাজ যার অন্তঃসার। এই দ্বিতীয় এলাকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের অনেকটা মিল আছে। তাঁর আত্মশক্তি চর্চার কর্মসূচি বা স্বদেশী সমাজের কার্যক্রমের তাৎপর্য বুঝতে এই বেসরকারি সমাজের ধারণা আমাদের সাহায্য করবে। সরকারি সমাজ আর বেসরকারি সমাজ—এই দুই এলাকার সম্পর্ক কীরকম পিঠোপিঠি তা বোঝানো যায় একটি উপমা দিয়ে। ধুতি-শাড়ির বাইরের পিঠকে বলে সদর; মফস্বল বলে অন্তরঙ্গ ভিতরের পিঠকে। এ উপমার ভাষায় সমাজের ওই প্রথম এলাকাটিকে যদি তার সদর বলি, দ্বিতীয় এলাকাটিকে বলব তার মফস্বল। বিদ্যাসাগরের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ছিল রাজনৈতিক বা সরকারি সমাজ নয়; ওই বেসরকারি সমাজ। সমাজের সদর নয়; মফস্বল। অতএব বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর এই স্বক্ষেত্রে; বাইরের কোনও দেশকাল-বিবিক্ত প্রতিমান-প্রয়োগ শুধু অবান্তর নয়, সেও এক ধরণের মেটাফিজিক্স বিলাস।

এইটে একটা প্যারাডক্স : যে-বিদ্যাসাগর এনলাইটেনমেন্ট-এর ভাবধারায় এত সম্পৃক্ত আর সিভিল সোসাইটি বা পৌর সমাজের চৌহদ্দিতেও যিনি এত কিছু করেছেন, সেই মানুষেরই কৌমের এলাকায় কাজ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অর্থে, হয়তো সবচেয়ে তাৎপর্যময়। এখন এই প্যারাডক্সের নিহিত সত্যিটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

শুধু পৌর সমাজের সঙ্গেই বা কেন, খাশ সরকারি সমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগের কথা এই সূত্রে তো উঠতেই পারে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদারিকে হিশেবের মধ্যে ধরলে বিদ্যাসাগর মোট সতের বছর সরকারি চাকরি করেছেন, ঠিকই; বিধবাবিবাহের বা শিক্ষাবিস্তারের মতন আর-পাঁচটা কাজের গরজে তিনি যে সরকারি সাহায্য নিয়েছেন, এইটেও তথ্য হিশেবে ঠিক। কিন্তু তাঁর সমস্ত উদ্যোগের কেন্দ্র ছিল ঐ বেসরকারি সমাজ, ঐ কৌম। শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে বুনে বুনে লিখতেন, 'বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছ রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে'। ঐ আশীর্বাদের ভাষা একটু বদল করে বলা যায় : বিদ্যাসাগর সদরে রিপোর্ট করেছেন বারবার; কিন্তু করেছেন মফস্বলের হয়ে।

যুক্তিটা আরও খুলে বলার জন্যে, যেসব তথ্য একটু আগে পেশ করেছি, তার সারমর্ম এখানে, আরেকবার, ঝালিয়ে নেওয়া ভালো।

বিদ্যাসাগর এবং চাষী : এই সম্বন্ধপাত, বোধ করি, ঈষৎ অতর্কিত। কী সেই সম্বন্ধ? উনিশ শতকের উপন্যাসে যেমন, বিদ্যাসাগরের চরিতকথাতেও তেমন, চাষী কি সেই ফেরারি প্রোটাগনিস্ট? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গোড়াতে তর্কবিচার-কণ্টকিত এক প্রস্থ পথ পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলুম। বিদ্যাসাগর আর বিদ্যাভূষণ—এঁরা একে অন্যের প্রতিবিম্ব নন; কিন্তু আমরণ এক ধরণের সাযুজ্য ছিল এঁদের দুজনের ভুবনে।

'সোমপ্রকাশ'-এর প্রকল্প বলতে বুঝি : এক বেসরকারি অথচ সাধারণ্যের ফোরাম, যেখানে একটি সমগ্র কৌমের মধ্যে, ওরই ঘরোয়া সমস্যা আর দাবিদাওয়া নিয়ে, যুক্তি তথ্য বোধ দিয়ে—মাতৃভাষায়—মত দেওয়া-নেওয়া চলবে ; চলবে এক অবিচ্ছিন্ন সংলাপ। যে-আত্মীয় সমাজের নাম কৌম, সেটি না-থাকলে এইরকমের সংলাপ জমে না ; আবার, এইরকম সংলাপ না-জমে উঠলে, কৌমের ঐ মৌচাকও বাঁধা যায় না। আর এখানেই হরিশের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এর আরেক তফাৎ। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কখনো তর্ক, কখনো আর্জি পেশ করত মূলতঃ সরকারি সমাজের সায়েবসুবোর কাছে। অন্য পক্ষে 'সোমপ্রকাশ'-এর যত কথা আর বার্তা, সবই, মূলতঃ নিজের কৌমের সঙ্গে। পত্রিকাটি বেরুতও সদর নয়, চাঙড়িপোতার সেই মফস্বল থেকে। যাকে একালের কথাশিল্পী বলেন 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', সেটা অনেকখানি জায়গাও জুড়ে নেয় 'সোমপ্রকাশ'-এর পাতায়। আর, 'সোমপ্রকাশ'কে ধারণ করে রেখেছিল : চাষীকে সম্মান-দেওয়ার ইমান। কর্মাটাঁড়ে সাঁওতাল চাষীদের মধ্যে জীবনের শেষ পর্বে বিদ্যাসাগরের বাসা-বাঁধার যে-আখ্যানকে বিষ্ণু দে বলেছিলেন 'ঐতিহাসিক রূপক', তাকে যদি এই 'সোমপ্রকাশ'-প্রকল্পের ঠিক পাশাপাশি রাখি, তাহলে, অনিবার্যভাবে এক নিগূঢ় দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই আমরা : বিদ্যাসাগরের ভুবনে চাষী গায়েব এবং হাজির ; অথবা, সেই ভুবনে চাষী হাজির এবং গায়েব।

কৃষকশোষণের মূল্যে খাজনাজীবী পত্তনিদার হতে সটান নারাজ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি দুর্ভিক্ষে মহামারীতে চাষীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর, এই 'জনরব'টিও ইঙ্গিতময় : কত আগে, চাষীদের নিজস্ব সংগঠন গড়তে চেয়েছিলেন তিনি! এসব হল ওই কৌম, ওই বেসরকারি সমাজের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্যবোধের একটা দিক।

এরই আর-এক দিক : মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, মেয়েদের প্রতি তাঁর মনোভাব।* কৌমের অন্তঃসার যেমন চাষী ; তার স্নায়ুকেন্দ্র তেমন নারীসমাজ। মেয়েদের ওপর কোনও মার, তাই গোটা কৌমেরই স্নায়ুমূলে গিয়ে ঘা মারে। ব্রত পালপার্বণ রূপকথা ছড়া প্রবাদপ্রবচনের মধ্যে কৌমমনের যে-প্রবাহ লক্ষ করি, তাকে তো ধারণ করে রাখে মেয়েরাই।

এদেশের নারীসমাজের যে-তিন প্রতিনিধির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্তরতম সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তাঁরা হলেন : ভগবতী, রাইমণি আর প্রভাবতী। মায়ের সঙ্গে, ভগবতীর সঙ্গে, তাঁর সম্বন্ধের কাহিনী তো আজ বাঙালির আধুনিক পুরাণের শামিল হতে চলেছে। রাইমণির প্রসঙ্গে তিনি নিজেই আত্মচরিতে লিখেছেন : 'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের

* চাষী আর নারী - সমাজ মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী, লাঙল আবিষ্কারের আগে মেয়েরাই ছিল আদিম চাষী।

ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'[১৯] যাকে বিদ্যাসাগর এখানে মিতভাষণে 'পক্ষপাত' বলছেন, তাকেই আমি বলব : ঐকাত্ম্য। (এই সত্যিটুকু লক্ষ করেছিলেন মাইকেল, যেজন্যে তিনি এই একই কথা একটু অন্য ভাষায় বলেছিলেন—বিদ্যাসাগরের হৃদয়টা ছিল 'বাঙালি মায়ের'।) না, শুধু 'পক্ষপাতী' নয় ; মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন এক-হৃদয়। তাই মেয়েদের যন্ত্রণা আদপে সইতেই পারতেন না তিনি ; তাঁর প্রতিক্রিয়া হত শারীরিক।

এবার, প্রভাবতীর প্রসঙ্গে আসি। সে ওঁর বন্ধুর মেয়ে। ওঁর চোখের মণি। মাত্র তিন বছর বয়সে সে মারা যায়। তার উদ্দেশে 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'[২০] নামে শ্বাসরোধক শোক-থেকে-উৎসারিত এক স্বগত সংলাপ লেখেন বিদ্যাসাগর।

'স্বগত' না বলে, 'নিঃসঙ্গ সংলাপ' বলাই, বোধহয়, আরও নির্ভুল। কারণ তিনি তো নিজের সঙ্গে কথা বলছেন না এখানে ; বলছেন এমন একজনের সঙ্গে, যে আর নেই ; যে উত্তরও দেবে না কোনও দিন। এ যেন নিরুত্তর ও অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গে কথা-বলা। গোল্ডমান লিখেছেন, এই-যে নিঃসঙ্গ সংলাপ, এইটে ট্র্যাজিক মানুষের নিয়তি।[২১]

সেই তীব্র, একান্ত ব্যক্তিগত গদ্য ছাপা হয় তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৮৯২ সালে। শুধু এই 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' পড়লেই বুঝতে পারি, কী নিখাদ ঐকাত্ম্যে, কত কান পেতে তিনি মেয়েদের মুখের ভাষা শুনেছিলেন !

গদ্যরীতিতে সংস্কৃত ঝোঁকের মস্ত নায়ক হিশেবে বিদ্যাসাগরকে শনাক্ত করার ঢালাও এক রেওয়াজ আছে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে। আজ বলার সময় এল : বিদ্যাসাগরের এই পরিচয় বড়ো জোর অর্ধেক সত্যি। কোনও সন্দেহ নেই, মেয়েদের মুখের ভাষা আর ছন্দ ওঁর গদ্যের একটি প্রধান শিকড়।* এমন নয় যে সেই শিকড় থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর রসদ শুষে নিয়েছিলেন শুধুই সজ্ঞানে, সচেতন প্রক্রিয়ায়। চৈতন্যের সঙ্গে ভাষার সংযোগের কথা তো আমরা বহু দিন থেকেই জানি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখাল, ভাষার সঙ্গে অচেতনের যোগ কত গহন আর গভীর। হতেই পারে, মেয়েদের ভাষা আর ছন্দ চারিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনের অন্তস্তলে, অচেতন স্তরে।

মেয়েদের ভাষা তিনি যে শুধু নিয়েছিলেন, তা-ই নয় ; স্বভাষা হয়তো আবার ফিরে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন মেয়েদের মহলে। হয়তো এইভাবে মেয়ে-সমাজের সঙ্গে ভাষা নেওয়া-দেওয়ার একটি বৃত্ত তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। তার এক ধরণের সাক্ষ্য রয়ে গেছে আমাদের সাহিত্যে। যেমন, 'নীলদর্পণ'-এর এই সংলাপ : 'ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের "বেতাল" শুন্‌বো।'[২৩]

বিদ্যাসাগরের প্রথম বই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বেরোয় ১৮৪৭ সালে আর দীনবন্ধুর 'নীল-

---

* পরে আরও উদাহরণ দেব। এখানে একটিই নমুনা তুলছি 'ভ্রান্তিবিলাস' থেকে : 'তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্দ্ধা দেখ না,...'[২২]

২

দর্পণ' বেরুনোর তারিখ হল ১৮৬০। ইন্দ্রমিত্রের ভাষায় বলতে পারি, ওপরের এই সংলাপ থেকে এ 'ধারণা প্রশ্রয়'[২৪] পায় : ছেপে বেরুনোর তের বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল' হয়তো গ্রামের মেয়েমহলেও পেঁাছে গিয়েছিল।

ভাষার মারফৎ গ্রামের মেয়ে - সমাজের সঙ্গে তাঁর এই সংযোগ-বৃত্তের কিছু সাক্ষ্য, কিছু প্রমাণ, সেকালের খবরের কাগজেও ছড়িয়ে আছে। যেমন, ২৪ মার্চ ১৮৫৫ তারিখের দৈনিক 'সিটিজেন'-এর পাতায় একটি উত্তেজক বিবরণ পেয়ে যাচ্ছি। পত্র-লেখক জানাচ্ছেন : বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রথম বইটির খানকয়েক কপি এক তরুণ যেই তার গ্রামে নিয়ে যায়, তক্ষুনি, ছোটো-বড়ো নানান বয়সের একদল মেয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধ'রে ব্যাকুল অনুরোধ করে, পড়ে শোনাও বিদ্যাসাগরের বই! কত মন দিয়ে তারা সেই পাঠ শোনে, আর কী জ্বলন্ত উৎসাহে তাদের মতামত জানায়—একেবারে অনর্গল, অকুণ্ঠিত, তাৎক্ষণিক—তারও একটি উপাদেয় ছবি ঐ পত্রলেখক দিচ্ছেন।[২৫]

নারীসমাজের জন্যে তাঁর যা কিছু উদ্যোগ, তা সরাসরি কৌমের এক্তিয়ারে বর্তায় তো বটেই। ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর যে-কাজ, সেটাও পড়ে সমাজের ওই দ্বিতীয় এলাকায়, কৌমের এলাকায়। কারণ, ভাষা তো কৌমেরই অঙ্গ ; তার রক্তস্রোত। বর্ণপরিচয় লিখে, ভাষার অন্তঃশীল ছন্দঃস্রোত খুঁজে বার করে—গদ্যকে ছিরিছাঁদ দিয়ে—তিনি বাঙালির এই কৌমসত্তারই প্রকাশক্ষমতা আর সংবিৎ বাড়িয়ে গেছেন।

পাঁচ

এই যে-বাক্‌স্পন্দ তাঁর গদ্যকে প্রাণিত করল, অবয়ব দিল, সেটা কি ওঁর ব্যক্তিগত শ্বাসক্ষেপের প্যাটার্ন? না, সেটা বাঙলা ভাষার মূল গঠনতন্ত্রেরই অঙ্গ?

সমস্যাটা বুঝতে সুবিধে হয়, আধুনিক ভাষাতত্ত্বে সোস্যুর 'লাঙ্গ' আর 'পারোল'-এর যে-ভাগ করেন, সেখান থেকে যদি এগোই। 'লাঙ্গ'-এর বাঙলা করা যেতে পারে : ভাষা। আর 'পারোল'-এর : বাচন। 'লাঙ্গ' বলতে বোঝায় একটি ভাষার ব্যবস্থাতন্ত্র ; যা ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টি করতে পারে না। আর, 'পারোল' হল ব্যক্তি-কর্তৃক ঐ কৌমগত ভাষাতন্ত্রের ব্যবহার, বাস্তবায়ন। সোস্যুর বলেন, ভাষা থেকে বাচনের তফাৎ করতে গিয়ে আমরা একই সঙ্গে যা-সামাজিক আর যা-ব্যক্তিগত, এই দুইয়ের, তফাৎ করছি।[২৬] প্রথমে ভলোশিনভ,[২৭] তারপরে, রোলাঁ বার্ত[২৮]-এর মতন কোনো কোনো ভাবুক এই ভাষা আর বাচনের সম্পর্ককে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। ওঁরা বলেন : ভাষা আর বাচন দুটো বিচ্ছিন্ন মহল নয় ; ওদের মধ্যে নিরন্তর কাজ করছে একটি ডায়ালেকটিক। ভাষাহীন বাচন নেই ; বাচনহীন ভাষাও নেই। 'লাঙ্গ' আর 'পারোল'-এর এই-যে ঐক্য, বিনিময় ; এই-যে মুহূর্তের মুহূর্তের মিলনবিন্দু—এইটেই মানুষের ভাষার সঞ্চারক্ষেত্র।

গদ্যের ছন্দকেও হয়তো এইভাবে দেখতে পারি। বিদ্যাসাগরের গদ্যে যে-ছন্দঃস্পন্দ

শুনতে পাই, তা হল ওই 'লাঙগ' আর 'পারোল'-এর সংযোগ-তরঙ্গ : একাধারে, বাঙালি কৌমের বাক্‌স্পন্দ আর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত শ্বাসক্ষেপের সারি সারি ছেদবিন্দুর সমবায়ে এক স্পন্দমান সঞ্চরণরেখা। সামাজিক ফ্রন্টে দিন-রাতের অবিরাম সংঘর্ষের মারফৎ কৌম আর ব্যক্তিস্বরূপের যে-ডায়ালেকটিক মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর গদ্যের স্পন্দনেও তারই সমান্তরাল একটি গ্রাফ জেগে ওঠে।

ওপরে যা বললুম, তা স্পষ্ট করবার জন্যে পর পর দুটো উদাহরণ দেব। দুটোতেই বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক স্পন্দ, চাল, নির্ভুল ধরা পড়েছে। প্রথমটি তো খুবই সরল ; মাত্র দুই বাক্যের একটি ছোটো অনুচ্ছেদ ধরে রাখছে এই তীব্র একোক্তিকে :

'হা ধর্ম্ম ! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।'[২৯]

বিদ্যাসাগর এখানে তুলে আনছেন অবিকল মুখের ভাষার ছাঁদ ! নিশ্বাসের লয়ে-তালে শব্দ-উচ্চারণের এই ওঠানামার বিন্যাসে এখানে পাচ্ছি কৌমগত আর ব্যক্তিগতের সচল সংগতি। যতিচিহ্ন শুধু, স্বরলিপির মতো, ওঁর অভিপ্রেত শ্বাসক্ষেপ, গতি আর বিরামের সঙ্কেতগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে—এই মাত্র। আর, অবশ্যই, ভাষার এই বাঁধুনিতে স্পন্দিত হচ্ছে ওঁর ব্যক্তিগত আবেগ, বিবেকবোধ।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

'কিছুকাল পূর্ব্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

'এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, "যে নারী পর পুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধ দেশ অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে ; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্ব্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়। তাহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায় ; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে ; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই

সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পর পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে” ইত্যাদি।

‘ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, “যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই ; অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষে উপগতা হইব না”। সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ব্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্য্যা করিলেন ; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

‘শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎ ক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন ; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্ব্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, “প্রভো ! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি ; আপনকার চরণ-সেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি”।

‘সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, “আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা, পূর্ব্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমুল গাছ, পূর্ব্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে ; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন আলিঙ্গন করিলে, সর্ব্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়”। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্ব্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ব্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।’[৩০]

দ্বিতীয় উদাহরণটিতেও ওই কৌমগত আর ব্যক্তিগত বাক্‌স্পন্দের টানাপোড়েন ফুটে উঠছে ; তবে আরও জটিল নকশায়। কারণ, বিদ্যাসাগর এখানে ওঁর উক্তিকে এমন অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে গড়ছেন যাদের বুনান জটিলতর। ভলোশিনভ বলেন, অনুচ্ছেদ হল প্রতিহত সংলাপ।[৩১] এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বিদ্যাসাগর তাঁর একোক্তির স্রোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন আরও অনেকের উক্তি, তাদের বাক্‌-ভঙ্গি সমেত। ফলে, আমরা এখানে, এই অনুচ্ছেদমালায় পেয়ে যাচ্ছি : প্রায়-অপ্রতিহত, বহুস্বর সংলাপ। কথকঠাকুর আর সেবাদাসীর ঐ দুই পৃথক বাক্‌-ভঙ্গি, স্বর, বিভিন্ন স্পন্দের এক মিশ্র প্যাটার্ন তৈরি করছে। কথকঠাকুরের বলার ধরণ যখন বিদ্যাসাগর নকল করছেন, তখন আনছেন, চাপা শ্লেষের ধাঁচ (‘সিমুল গাছ তেল হইয়া গেছে’)। সেবাদাসীর সংলাপে ফোটাচ্ছেন মেয়েলি ছাঁদ, স্বর। আর লেখকের আইরনি-মেশানো স্বরভঙ্গি (‘এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে’) এই প্যাটার্নকে বিচিত্রতর করে তুলছে।

ছয়

'বিদ্যাসাগরী ভাষা' নামক সংস্কৃত-সমাকীর্ণ এক অনড় রীতিবিশেষের ধারণাটা এই মুহূর্তে ফেলে দেওয়া দরকার। আসলে তো কাকে বলছেন আর কী বলছেন, সেই নিরিখ অনুযায়ী তাঁর রীতি বদলায় ক্রমাগত। বাস্তবিক, পাঠকের প্রতিক্রিয়া আর সক্রিয় বোধকে এতটা দাম সেযুগে আর ক'জন গদ্যলিখিয়ে দিয়েছিলেন ? তাই সংস্করণে সংস্করণে পালটে যায় তাঁর পদবিন্যাস আর যতিচিহ্ন। বিদ্যাসাগরের সব লেখায়—এমনকি 'বর্ণপরিচয়'-এও—পাঠক সগৌরবে উপস্থিত। উপস্থিত বলেই 'সীতার বনবাস' আর 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এর ছাঁদ আলাদা। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'-এর চাল, স্বরভঙ্গি, তো আরও অন্যরকম। একই কারণে একটা বই থেকে অন্য বইয়ে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী শব্দের অনুপাত বদলে বদলে যায়। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বা 'সীতার বনবাস'-এ যত তৎসম শব্দ ভিড় করে আসে, 'আবার অতি অল্প হইল'-তে ততটা নয়। 'আবার অতি অল্প হইল'-তে আরবি-ফারসি শব্দ দেদার পেয়ে যাচ্ছি ; অথচ 'সীতার বনবাস'-এ তার প্রয়োগ দুর্লভ।

আরবি-ফারসির প্রসঙ্গ যখন উঠে পড়ল, তখন বলি : ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) বইয়ে এ-ধরণের শব্দকে শুধু লেখারই নয়, কথা-বলার ভাষাতেও অচ্ছুত গণ্য করা হয়েছে। ভাষার ভাঁড়ারের কিছু শব্দ যেন গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া আর বাদ বাকি অপবিত্র ! এই শুচিবায়ুর পেছনে হয়তো-বা সাম্প্রদায়িক মেজাজের কিছু জেরও ছিল ; কারণ আরবি-ফারসি শব্দকে 'কলিকাতা কমলালয়' বলছে : 'যাবনিক' আর তৎসমকে : 'স্বজাতীয়'।[৩২] এই সাম্প্রদায়িক শুচিবায়ু বিদ্যাসাগরকে পেয়ে বসে নি। কলকাতার ভদ্রলোকের ভাষায় ব্যবহৃত কম, কলম, কসম, কবুল—এইরকম ১৮২টি 'যাবনিক' শব্দের একটি ফর্দ ভবানীচরণ করেছিলেন।[৩৩] বিদ্যাসাগর তাঁর 'খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ'-এর তালিকায় এই ১৮২টির মধ্যে ১৪৩টি শব্দই নিয়েছেন, বেকসুর ![৩৪]

বিদ্যাসাগরের ওই 'শব্দ-সংগ্রহ' ভাষা সম্পর্কে ওঁর ধ্যানধারণা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় এই 'শব্দ-সংগ্রহ' ছাপার সময়ে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন : 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎ-সঙ্কলিত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।'[৩৫]

খুব সম্ভব তা-ই। নয়তো এত যত্ন আর ধৈর্য নিয়ে মোট সাত হাজার আশিটি (৭০৮০) চলতি বাঙলা শব্দ খুঁজে, বেছে, জড়ো ক'রে, তারপর আবার সেগুলোকে বর্ণানুক্রমে সাজাতে যাবেন কেন বিদ্যাসাগর ? কী সংকলনের রীতি, কী বানান পদ্ধতি খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায়, পণ্ডিতি বাই তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। বাঙলায় তো অন্তঃস্থ

ব নেই ; তাই এ তালিকার বর্ণবিন্যাসে ব একটি ; সব বকারাদি শব্দ বর্গীয় ব-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। এমন কোনও শব্দ তাঁর তালিকায় জায়গা পায় নি যার আদ্যক্ষর : ঈ ঊ ঋ য ষ। কেন? সম্ভবতঃ ওঁর বিবেচনায় ঐ সব বর্ণ চলতি বাঙলায় উচ্চার্য নয়। অতৎসম শব্দের বানানে তিনি যে সংস্কৃতবিধি মোটেও মানতেন না, নীচের বানানগুলো লক্ষ করলে তা বোঝা যাবে :

উজ্জাপন উজ্জোগ কুমির জাঁতা তাঁতিনি দাবি দিঘি ধোপানি ননদিনি নানি নেকি পাখি বাঘিনি বাঙালি বুড়ি মানিক রাখি সেকরানি।

'পদবি' বানান করেছেন তিনি 'ই' দিয়ে ; অথচ 'চলন্তিকা'তেও (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৩) আছে 'পদবী'। হ্রস্ব 'ই' দিয়ে 'পদবি' বানান শুদ্ধ বটে ; তবে এমন নয় যে তৎসম শব্দের বানানে তিনি সর্বদা সংস্কৃত নিয়ম মেনে চলতেন। এই তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তাঁর পাণ্ডিতিয়ানা-মুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির একটি গল্প বলি : একবার অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে বলেন, ' "যাবদীয়" বানানটাই ব্যাকরণসংগত, তবে আপনি "যাবতীয়" লেখেন কেন ?' বিদ্যাসাগর জবাব দেন, ' "যাবদীয়" কথাটাই ঠিক জানি ; কিন্তু "যাবতীয়" কথাটা বাঙলা ভাষায় অনেক দিন চলে আসছে ; আমি ও বদলাতে পারব না।'৩৬

সাত

এতক্ষণ যেভাবে যুক্তিবিস্তার করেছি, তার প্রতিপাদ্য এই : বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ কৃষক-আন্দোলন না-করলেও চাষী-সাঁওতাল বিষয়ে মূল্যবোধ তাঁর চারিত্রলক্ষণ ছিল। ভাষাচর্চায় আর নারীসমাজের জন্যে তাঁর কর্মকাণ্ডকে যদি এই মূল্যবোধের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে দেখি, তাহলে টের পাই, তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যময় কাজের জায়গা হচ্ছে : বেসরকারি সমাজ।

বাস্তবিক, উপনিবেশের শাসনে-শোষণে নিষ্পিষ্ট ভারতবর্ষে সমাজের ওই দ্বিতীয় এলাকার বিবর্ধনে, সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ* বা গান্ধির মতন বিদ্যাসাগরেরও ভূমিকাবিচার আমাদের একটা বড়ো কাজ।

বড়ো কেন? উনিশ শতক থেকে শুরু করে আজ অবধি বাঙালি মধ্যবিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক সম্মোহ, যাকে আমি বলব : রাষ্ট্ররীতি। সাম্রাজ্যের আওতায় যে-রাষ্ট্রযন্ত্র গজিয়ে ওঠে তার সুখদা-বরদা শক্তির বিষয়ে এই সম্মোহ লালন করেছিল আমাদের গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ মোহে স্বয়ং বিদ্যাসাগর আবিষ্ট ছিলেন ; অথচ সেকালে তাঁর মতন

* এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগসূত্র অনেকটা প্রত্যক্ষ। দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে (নভেম্বর ১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'নূতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি-চর্চ্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্ত্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশী ভাবে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী।'৩৭

স্বাবলম্বন-চর্চা আর কেউ করে নি—এখানে তাঁর স্ববিরোধ এবং গুরুত্ব। মশনদে এখন আর ইংরেজ নেই। কিন্তু দুর্মর সে রাষ্ট্ররীতি ইদানীং বেড়েছে বৈ কমে নি। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে—বাড়ছে—রাষ্ট্রের এক্তিয়ার। সরকারি সমাজের দাপট যত বাড়ছে, তত গুরুত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে তার প্রতিস্পর্ধী এলাকা : বেসরকারি সমাজ। তাই এদেশের এই বেসরকারি সমাজের আলোচনা এবং তার শক্তি-বাড়ানোয় বিদ্যাসাগরের ভূমিকাবিচার আজ এতটাই বড়ো কাজ হয়ে উঠল। কাজটা শুধু বড়ো নয়, খুবই জরুরি ; আমাদের গোটা সমাজ-কাঠামোর স্পন্দ, জটিলতা, জোর বোঝার জন্যেই এই কৌমকে চেনা আর জানা দরকার। সমাজের এই মফস্বল এদেশের সমস্ত ইতিহাসের উৎসভূমি।

যার মৃত্যু ঘটে, দুর্ভোগটা তো তার নয় ; দুর্ভোগ পোয়াতে হয় তাকে, যে বেঁচে-বর্তে রইল। বিদ্যাসাগর তো মরে বেঁচেছেন। আপাততঃ আমরা বেঁচে মরে থাকব, না, তরে যাব, তা অনেকটা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। বিদ্যাসাগরের পুনর্বিচারে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কতটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছেন সেটা ওঁদের আত্মসচেতনতারও নিরিখ। মনে পড়ছে, বিদ্যাসাগরের চারিত্রকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাণ্ডজ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।'[৩৮]

আট

বামুন, নৈয়ায়িকের কথা আলাদা ; সাধারণ্যের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। যারা আর দশজনের সঙ্গে নিজেদের কৌলীন্য উৎকট আতিশয্যে জাহির করতে উদ্‌গ্রীব, তাদের মধ্যেই কাণ্ডজ্ঞানের অসাধারণ খামতি লক্ষ করি। অন্য পক্ষে, গায়ে-গতরে খেটে যাদের পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জোগাড় করতে হয়, কাণ্ডজ্ঞান ছাড়লে তাদের তো চলবেই না। স্বভাবতঃই প্রবাদে-প্রবচনে যে-কৌমমনের পরিচয় পাই, তাতে কৃষকশোভন এই টনটনে কাণ্ডজ্ঞানের ছাপ খুবই স্পষ্ট। এই কাণ্ডজ্ঞানের সূত্র দিয়ে কৌমের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক আরেক দিক থেকে বুঝে নিতে পারি।

বিদ্যাসাগর-চারিত্রের অনন্যতন্ত্রতার ওপর রবীন্দ্রনাথ ঝোঁক দিয়েছেন।[৩৯] এক হিশেবে কথাটা তো ঠিকই। আসলে, তাঁর চারিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়তো এই যে একদিকে তিনি অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অন্যদিকে সাধারণ্যের সঙ্গে তাঁর সহজ ঐকাত্ম্য ছিল। গোটা কৌমকে নিয়ে তিনি চলার চেষ্টা করেছেন অথচ কৌমের সমালোচনাও করেছেন। তাঁর জীবনচরিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের সাধারণ্যের ক্রমান্বয় সম্বন্ধ-তৈরির ইতিবৃত্ত। সে ইতিহাসে ভাঙাগড়াও আছে, চাপও আছে ; কিন্তু অন্বয়-তৈরির সেই চেষ্টা দুর্মর। যে-সাধারণ্যকে 'কৌম' বলছি, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বড়ো যোগসূত্র ছিল তাঁর ওই প্রখর কাণ্ডজ্ঞান।

এই কাণ্ডজ্ঞান হয়তো বিদ্যাসাগরের স্বভাবগত ছিল ; কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হল : তিনি

মননগত স্তরেও তার অনুশীলন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে স্কটল্যান্ডে কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি দার্শনিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নামই 'কমনসেন্স ফিলসফি'। সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সংগ্রহে দেখেছি, এই দর্শনের মূল বইগুলির প্রায় সব কয়টিই সেখানে রয়েছে। বিশেষতঃ কাণ্ডজ্ঞানের দর্শনের মূল প্রবক্তা টমাস রীড-এর (১৭১০-১৭৯৬) আর সে দর্শনের প্রভাবশালী ভাষ্যকার ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট-এর (১৭৫৩-১৮২৮) সমগ্র রচনাবলি বিদ্যাসাগর সংগ্রহ করেছিলেন।[৪০] ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের যশ এতই ব্যাপ্ত ছিল যে শুধুই স্কটল্যান্ড আর ইংল্যান্ড থেকেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, উত্তর জার্মানি আর ইওরোপের নানান অঞ্চল থেকেও তরুণ ছাত্ররা তাঁর দর্শনের ক্লাসে ভিড় করে আসত। রীড আর স্টুয়ার্ট-এর প্রভাব পশ্চিম জগৎ পেরিয়ে কলকাতার তরুণ মনেও ছড়িয়ে পড়ে। ডিরোজিও স্বয়ং ১৮৩১ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে রীড-স্টুয়ার্ট-এর দর্শন নিয়ে চর্চা করতেন।[৪১] বিদ্যাসাগর যে ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের বইপত্র খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, এই অনুমানের পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, স্টুয়ার্টের 'এলিমেন্টস অফ দ্য ফিলসফি অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড' বইয়ের (১৮৫৪ সংস্করণ)সাত জায়গায় আর 'লেকচারস অন পলিটিক্যাল ইকনমি'-র (১৮৫৫ সংস্করণ) চার জায়গায় মার্জিনে পেনসিলের দাগ দেখেছি। এইভাবে পেনসিলের দাগ দিয়ে পড়া বিদ্যাসাগরের অভ্যাস ছিল।[৪২] দ্বিতীয়তঃ, চিহ্নিত জায়গাগুলোয় বিদ্যাসাগরের অভ্যস্ত মতের সমর্থন বা অনুরণন পেয়ে যাচ্ছি। উদাহরণতঃ স্টুয়ার্টের 'এলিমেন্টস অফ দ্য ফিলসফি অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড'-এর প্রথম খণ্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় সেই চিহ্নিত অংশের উল্লেখ করা যায় যেখানে এই স্কটিশ দার্শনিক বলছেন : 'আইন-প্রণয়নের রীতি এখন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। জনমতের সম্ভাব্য গতি কোন্ দিকে, তা এখন আন্দাজ করা অনেকটা সহজতর। একজন বিচক্ষণ আইনপ্রণেতা কোন্ লক্ষ্যের দিকে এগোবেন, সে বিষয়ে নিজের কাছে স্পষ্ট ও স্থির ধারণা গড়ে তোলা এখন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে [আগেকার দিনের তুলনায়] সহজ হয়ে উঠল।' এই সূত্রে ওই বইয়ের ৩১৬, ৩১৭ পৃষ্ঠার সেই চিহ্নিত জায়গাগুলোও মনে পড়েছে, যেখানে স্টুয়ার্ট ঘুরে ঘুরে বলছেন : নিজের নিজের ধর্মের সঙ্গে জড়ানো যে-সব রীতিনীতি আচার বা সংস্কারের মধ্যে মানুষ আবাল্য বড়ো হয়ে ওঠে সেগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায় তার মজ্জায় মজ্জায়।

'কমন সেন্স'-এর আক্ষরিক তর্জমা করা যেতে পারে : সাধারণ বুদ্ধি। লোকায়ত সাধারণ বুদ্ধির কাছে এই দার্শনিক আন্দোলনের আবেদন। দর্শনের কূটকচাল নিয়ে যাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, সেই প্রাকৃত জনের ধ্যানজ্ঞানকে পরিগ্রহণ করে তাকে উত্তরণ করতে চেয়েছেন এই দার্শনিকেরা। ওঁদের লক্ষ্য ছিল : দর্শনচর্চার সঙ্গে ওঁদের মননজীবনের সাধারণ মানবিক উপাদানের সংগতি সাধন।

টমাস রীড তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানকে স্থাপন করেছিলেন বেকন-এর 'নোবুম

ওরগানুম' (*Novum Organum*)-এর পদ্ধতির ওপর। ওঁর বিবেচনায় নিউটন-এর পদার্থবিদ্যাও ওই একই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত। রীড বলছেন, 'বেকনের দর্শনবিধি (*Regulae Philosophandi)* আসলে সাধারণ বুদ্ধিরই নীতিসূত্র। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিনে ঐ নীতিগুলির প্রয়োগ হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। যিনি অন্য নিয়ম মেনে কী বস্তুবিশ্ব নিয়ে, কী মন নিয়ে দর্শন চর্চা করেন, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট।'[৪৩] যে-সত্য সর্বমানবের সুখের সঙ্গে জড়িত তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল রীডের অভিপ্রায়।

শুধু বার্কলে-র প্রতি বিরাগ এবং *বেকন-নিউটনের প্রতি অনুরাগই যে এই স্কটিশ দার্শনিকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতৈক্য তৈরি করে, তা নয়। এই দর্শনের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড়ো ঐক্য, বোধ করি, কাণ্ডজ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধিকে ফার্স্ট প্রিন্সিপল্—মূল তত্ত্ব—হিশেবে গ্রাহ্য করায়। বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব তো তাঁর সমস্ত লেখায় আর কাজকর্মে জ্বলজ্বল করছে। তবে তাঁর বিচারপুস্তিকা 'রত্নপরীক্ষা'-র উপসংহারে একটি গল্পে এইটে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কমনসেন্স ফিলসফির সঙ্গে তাঁর মেজাজের মিল দেখানোর জন্যে সেই গল্পটি এখানে তুলছি:

'কোনও গ্রামে, এক বিদ্যাবাগীশপরিবার ছিলেন। বিদ্যাবাগীশেরা চারি সহোদর। চারি সহোদরই বিদকুটে নৈয়ায়িক। জ্যেষ্ঠের স্বগ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল; মধ্যম, তৃতীয়, ও কনিষ্ঠ, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী গ্রামত্রয়ে, অধ্যাপনা করিতেন। তদীয় বাসগ্রামের সন্নিকটে, একটি ফৌজদারী আদালত ছিল। আদালতের সেরেস্তাদার ঐ গ্রামে বাসা করিয়া থাকিতেন, এবং বিদ্যাবাগীশদের বাটীর সম্মুখে যে গ্রাম্য রাস্তা ছিল, প্রায় প্রত্যহ, ঐ রাস্তা দিয়া, আদালতে যাতায়াত করিতেন।

'এক দিন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন, সেই সময়ে সেরেস্তাদার, আদালতের উপযোগী বেশে, কর্ম্মস্থানে যাইতেছেন। ঈদৃশ বেশধারী পুরুষ, ইতঃপূর্ব্বে, কখনও, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশের নয়নগোচর হয় নাই; সুতরাং, তদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সেই দিন, অপরাহ্ণেও, বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে

* বিশপ বার্কলে-র 'ভ্রান্ত দর্শন' বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বিরাগের কথা জানতে পাচ্ছি ব্যালেনটাইন রিপোর্ট নিয়ে তাঁর সুপরিচিত মন্তব্য থেকে। কোপার্নিকস, গালিলেও ইত্যাদি বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিউটন-এর জীবনীও তিনি সংকলন করেছিলেন 'জীবনচরিত'-এ (১৮৪৯)। ঐ ব্যালেনটাইন রিপোর্ট প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যে যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই, তার সঙ্গে বেকনের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য তো খুবই স্পষ্ট। বেকনের প্রতি ওঁর আগ্রহ অনুরাগের আরও নিদর্শন পাওয়া যায় সাহিত্য পরিষদে ওঁর নিজস্ব বইয়ের সংগ্রহ থেকে। বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে বেকনের এই বইগুলি আছে:

1. *The Essays*, S. W. Singer, ed., London 1857.
2. *Bacon's Essays*, Edwin A. Abbott, ed., 2 vols., London, 1886.
3. *The Essays of Lord Bacon*, John Hunter, ed., London, 1886.
4. *Novum Organum*, Andrew Johnson, tr., London, 1859.
5. *Of the Proficience and Advancement of Learning*, G. W. Kitchin, ed., London, 1861.

দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে, সেরেস্তাদার, আদালত হইতে, বাসায় প্রতিগমন করিতেছেন।

'এইরূপে, ক্রমাগত তিন দিন, সেরেস্তাদারকে, তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া, যাতায়াত করিতে দেখিয়া, বিদ্যাবাগীশের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, অঙ্গবস্ত্র অঙ্গে, উষ্ণীশ মস্তকে, চর্ম্মপাদুকা চরণে, ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির, অস্মদ্ভবনের সম্মুখ দিয়া, প্রত্যহ গতাগত, ইহার অভিসন্ধি কি। নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশদিগের উদর তর্কশক্তিতে পরিপূর্ণ ; তর্কশক্তিবলে, বিদ্যাবাগীশ সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈদৃশ মনোহর বেশে, প্রত্যহ গতাগত করিবার অভিসন্ধি **লাম্পট্য**। তৎপরে, এই লাম্পট্যের স্থল কোথায়, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, অপ্রতিহত তর্কশক্তিপ্রভাবে, অস্মদ্ভবনই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের স্থল, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। পরিশেষে, কোন ব্যক্তি ইহার লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বিদ্যাবাগীশ এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠা বধূ বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না ; মধ্যমা তথৈব চ, তিনিও লক্ষ্য নহেন ; তৃতীয়া রূপলাবণ্যশালিনী বটে, কিন্তু দুটি কন্যা ও একটি পুত্র প্রসব করিয়া, গলিতযৌবনা হইয়াছেন ; সুতরাং, তিনিও ঈদৃশ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না ; অবশেষে, কনিষ্ঠা পূর্ণযৌবনা ও বিলক্ষণ রূপলাবণ্যশালিনী ; অতএব, তিনিই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

'অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় সহোদরদিগকে, এখানে ঘোর বিপদ উপস্থিত, তোমরা পত্র পাঠ বাটীতে আসিবে, কোনও মতে অন্যথাচরণ করিবে না, এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বাটীতে উপস্থিত হইলে, চারি জনে কমিটি করিতে বসিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ও স্বকৃত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুজদিগের গোচর করিলেন। অনুজেরা জ্যেষ্ঠকৃত সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি, বল। কনিষ্ঠ, কোপে কম্পিত কলেবর হইয়া, রোষরক্ত নয়নে, উদ্ধত বচনে কহিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য **প্রহার**। জ্যেষ্ঠেরা, তথাস্তু বলিয়া, তদীয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুমোদন করিলেন।

---

6. *New Atlantis*, London, 1850.

7. রামকমল ভট্টাচার্য, 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ', কলকাতা, ১৮৬১.

রামকমল - অনূদিত বেকনের প্রবন্ধ-সংকলনটি বিদ্যাসাগর দাগ দিয়ে পড়েছিলেন। 'ব্যয়', 'ভব্যতা ও শিষ্টাচার', 'পর্য্যটন', 'শাস্ত্রচর্চ্চা', এই চারটি প্রবন্ধের শিরোনামে টিক (✓) চিহ্ন দিয়েছিলেন তিনি। আর গোটা বইয়ের পনেরটি (১৫) শব্দ আণ্ডারলাইন করেন। শুধু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, প্রাত্যহিক জীপনযাপনের নীতিতেও বেকনের সঙ্গে তিনি কতটা একমত ছিলেন, 'ব্যয়' প্রবন্ধের এইসব উক্তি থেকে তা বোঝা যাবে :

'স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত।...

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে।' রামকমল ভট্টাচার্য, 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ', কলকাতা, ১৮৬১, পৃ. ৯-১০।

'পর দিন, চারি সহোদর, বদ্ধপরিকর হইয়া, সেরেস্তাদারের আগমন প্রতীক্ষায়, যষ্টি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি যথাকালে উপস্থিত হইবামাত্র, আঃ! দুরাত্মন্, তোমার যদ্রূপ আচরণ, তদুপযুক্ত ফলভোগ কর, এই বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, চারি সহোদরেই, নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে, তাঁহার উপর, অবিশ্রান্ত, যষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ঘটনাক্রমে, কতকগুলি ভদ্র লোক ঐস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্যাবাগীশদিগকে প্রহারক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, সেরেস্তাদার, নিঃসন্দেহ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

'এইরূপে নিস্তার পাইয়া, সেরেস্তাদার, হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি, বিদ্যাবাগীশদিগকে আদালতে হাজির করিবার নিমিত্ত, দারোগাকে পাঠাইয়া দিলেন। দারোগা বিদ্যাবাগীশদিগকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সেরেস্তাদারকে প্রহার করিলেন কেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, ঐ দুরাত্মা অস্মদ্ভবনে লাম্পট্য করিয়াছে; সে জন্য প্রহার করিয়াছি। হাকিম শুনিয়া, সন্দিহান হইয়া, সেরেস্তাদারকে বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। সেরেস্তাদার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমি ধর্ম্ম-প্রমাণ বলিতেছি, আমি, কস্মিন্ কালেও, উঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করি নাই; গ্রামের যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কিরূপ চরিত্রের লোক, জানিতে পারিবেন। হাকিম উপস্থিত গ্রামস্থ লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা সেরেস্তাদার মহাশয়কে সবিশেষ জানি, উনি সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ চরিত্রের লোক নহেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা উঁহার উপর ওরূপ দোষারোপ করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি উঁহাদের এ কথায়, কোনও মতে, বিশ্বাস করিবেন না।

'এই সকল কথা শুনিয়া, হাকিম বিদ্যাবাগীশদিগকে বলিলেন, সেরেস্তাদার আপনাদের বাটীতে লাম্পট্য করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করুন; নতুবা, কেবল আপনাদের কথায়, আমি উঁহাকে দোষী স্থির করিতে পারিব না। তখন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, যে অদ্ভুত তর্কপরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হাকিমের গোচর করিলেন। হাকিম শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে কি না; যে প্রমাণ দেখাইলেন, উহা দ্বারা, আপনাদের বাটীতে, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহাতেও যদি লাম্পট্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত; ঐ সকল পুস্তকের আর কোনও প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, চারি সহোদরে, ক্রোধভরে, কম্পিতকলেবরে,

আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন। হাকিম প্রভৃতি আদালতস্থ সমস্ত লোক, উচ্চৈঃ স্বরে, হাস্য করিতে লাগিলেন।'[৪৪]

এতক্ষণ 'সাধারণ বুদ্ধি' আর 'কাণ্ডজ্ঞান'কে একই অর্থে ব্যবহার করছিলুম। চারুচন্দ্র গুহর অভিধানের নজির দেখিয়ে বলতে পারি : ইংরেজি 'কমন সেন্স'-এর বাঙলা অনুবাদ হিশেবে এই দুই শব্দের চলও আছে। কিন্তু এইবার, আরও বিশ্লেষণের জন্যে, গ্রাম্‌শির অনুসরণে 'সাধারণ বুদ্ধি' আর 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর মধ্যে একটা তফাৎ করব।[৪৫] 'সাধারণ বুদ্ধি' বলতে বুঝব : ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বে জগৎকে দেখার, বোঝার যে-মনোভঙ্গি 'সাধারণ' হয়ে উঠেছে। এই মনোভঙ্গি খুব সংবদ্ধও নয়, পুরোপুরি সচেতনও নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক সামাজিক স্তরের নিজস্ব 'সাধারণ বুদ্ধি' এবং তার ইতিহাস থাকে। অন্য পক্ষে, 'কাণ্ডজ্ঞান' হচ্ছে ব্যাবহারিক বোধ। এইটে যুক্তিবাদী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনিবার্যতঃ অভিন্ন না-হতে পারে, কিন্তু গ্রাম্‌শির ভাষায় এ হল সাধারণ বুদ্ধির 'সুস্থ নিউক্লিয়স'। তাই 'কাণ্ডজ্ঞান' বোঝাতে তিনি 'সুবুদ্ধি' কথাটা ব্যবহার করতেন।

কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির এই তফাৎটা করলে বিদ্যাসাগর যে সমাজ-সংস্কারের গরজে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার একটা তাৎপর্য বোঝা যায়। এ ব্যাপারে শাস্ত্রের দোহাই পাড়া নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে এযুগেও আপত্তি উঠেছে, সেযুগেও আপত্তি ছিল। যেমন, সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিক্ষেপ করতে গিয়ে শাস্ত্রবচন তোলা নিষ্ফল।[৪৬] ১৮৫০ সালে সমাজসংস্কার বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ' লেখার সময়ে বিদ্যাসাগর নিজেও তো কোথাও শাস্ত্রের দ্বারস্থ হন নি। কিন্তু পরে, বিধবাবিবাহের পক্ষে আর বহুবিবাহের বিপক্ষে যখন আন্দোলনে নামলেন, তিনি তখন শাস্ত্র মন্থনও করলেন, বিচারও করলেন। কেন ? এ বিষয়ে তাঁর নিজের যুক্তিটা কী, সেটা আগে দেখা যাক।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে তিনি লিখছেন : '…বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।'[৪৭]

আর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বলছেন : 'এ দেশে সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধর্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত ; আর শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।'[৪৮]

এইসব বিবৃতি পড়লে বুঝতে পারি: সমাজের একটি বিশেষ পরিমণ্ডলীকে বোঝানো এবং সমাজসংস্কারের পক্ষে তার সম্মতি আদায় বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। তিনি জানেন, ওঁরা শুধু শাস্ত্রের যুক্তিই মানবেন; সেই কারণে তিনি শাস্ত্র ধরে আলোচনা করছেন। এই পরিমণ্ডলীর সঙ্গে সংলাপ-তৈরির অন্য উপায় নেই।

শাস্ত্র চারিয়ে যায় সাধারণ বুদ্ধিতে। যাকে বিদ্যাসাগর 'দেশাচার' বলতেন, তারও পেছনে যে-মনোভঙ্গি নিহিত থাকে, সেটাও সাধারণ বুদ্ধির অংশ। তাঁর লেখা খুঁটিয়ে পড়লে বুঝতে পারি: বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচার, আসলে, কাণ্ডজ্ঞানের আলোয় সাধারণ বুদ্ধির বিচার। তাঁর দেশাচার-সমালোচনা, মূলতঃ, কাণ্ডজ্ঞানের মানদণ্ডে সাধারণ বুদ্ধির সমালোচনা। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা—এবং তাঁর আবিষ্কৃত শাস্ত্রবচন—ক্রমে ক্রমে সেই পরিমণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়বে, সাধারণ বুদ্ধির অংশ হয়ে উঠবে। এইজন্যে তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতন সংস্কৃতে শাস্ত্রবিচার করেননি, করেছিলেন বাঙলায়।

নয়

যখন বলছি, রাজনৈতিক সমাজ বিদ্যাসাগরের মূল কর্মক্ষেত্র নয়, তখন, স্পষ্টতঃই 'রাজনীতি' শব্দটা সংকীর্ণ অর্থে—রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে—ব্যবহার করছি। কিন্তু রাজনীতির তো একটা ব্যাপক অর্থও আছে; সুতরাং, বেসরকারি সমাজেরও রাজনীতি আছে। সেই অর্থে, বিদ্যাসাগরেরও রাজনীতি ছিল।

সরাসরি রাজনীতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের লেখাপত্র এখন অবধি পাওয়া যায় নি। একবার, বিরল মুহূর্তে, রাজনীতির যা সারাৎসার সেই ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি একটি ছোটো মন্তব্য করেন। ইংরেজ সরকারের সাহায্য নিয়ে বহুবিবাহের মতো সামাজিক দোষের সংশোধন কাম্য নয়—প্রতিপক্ষের এই যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি লেখেন: 'আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়।'[৪৯]

ঈষৎ আক্ষেপের সুরে এই-যে কথাটা উনি বলছেন, এতে ধাঁধা লাগে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের হাতে যদি ক্ষমতাই না-থাকবে, তাহলে তিনি এত যুঝলেন কার সঙ্গে? রাষ্ট্রিক ক্ষমতাই কি একমাত্র ক্ষমতা? ক্ষমতার তো বহুরূপ। তার জালও তো বহুদূর অবধি ছড়ানো। রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে পাশে ওপরে নীচে—আরও ঢের সূক্ষ্মস্তরে—ক্ষমতা কি ক্রিয়াশীল নয়? কৌমের ক্ষমতা নেই? দ্বিতীয়তঃ, 'ক্ষমতা' বলতে যদি-বা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতাই বুঝি, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে: ঐ ক্ষমতা কি কোনও পরাধীন জাতির হাতে কোনও এক শুভলগ্নে দৈবাৎ এসে যায়? এ কি অর্জন করতে হয় না?

বিদ্যাসাগরের এই রাজনীতিবোধে নানান মাত্রাও আছে, অন্তর্বিরোধও আছে। সে রাজনীতির একটি মাত্রা, অবশ্যই, ইংরেজ শাসন দেশের পক্ষে শুভজনক, এই ভরসা।[৫০]

ইতিহাসের নিঃস্পৃহ বিচারে সে ভরসাকে তাঁর বোধের ভুল হিশেবে মানতেই হয়। তাঁর রাজনীতির এই দিকটি নিয়ে হালে অনেকেই বিচারবিশ্লেষণ করেছেন ; আমি আর ও-প্রসঙ্গে যাব না। আমি তাঁর রাজনীতিবোধের অন্য-এক জটিল দিকের কথা তুলতে চাই। এই জটিল দিকটি যথাসম্ভব গোটাভাবে হাজির করার জন্যে পর-পর তিনটে গল্প বলব।

প্রথম গল্পটি বলে গেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : 'একবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা গবর্নমেন্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল ; বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— "ওহে, আজকে *political world*-এ যে বড়ই *gloom* দেখে এলুম।" এই *gloom* কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল।'[৫১]

দ্বিতীয় গল্পটি লিখেছেন ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি : কলকাতায় ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। ক্ষিতীশপ্রসাদ লিখছেন : 'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ যোগ দেবার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সোজাসুজি প্রশ্ন করেন যে, "দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?" তাঁর এই প্রশ্নে, যাঁরা এসেছিলেন, বিব্রত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা এই কাজে এগোও"।'[৫২]

এতক্ষণ যে-দুটো গল্প বললুম, তাতে ভদ্রলোকের রাজনীতি নিয়ে—বিরহ ছলে মিলন আনার কলাবিধি নিয়ে—বিদ্যাসাগরের বিরাগ শুধু ব্যঞ্জনায় নয়, খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। এবার তৃতীয় গল্পে আসা যাক। এ হল বিদ্যাসাগরের একটি না-বলা গল্প। টমাস জেমস-এর সংকলন থেকে 'কথামালা'য় তিনি ঈসপ-এর সবশুদ্ধ ৮৫টি গল্প তর্জমা করেছিলেন। কিন্তু এ গল্পটি বাদ দেন তিনি। অথচ, এইটে হয়তো ঈসপের সবচেয়ে রাজনৈতিক উপকথা : এই গল্পের প্রজ্ঞা, গূঢ়ার্থ আর তীক্ষ্ণ আইরনি ব্রেশট-এর মেজাজের যোগ্য।

জগৎ আর জগদীশ্বর বিষয়ে বহু মৌলিক প্রশ্নে যিনি এক বাচাল শতাব্দীর নির্বাক্‌তম মানুষ, তাঁকে বুঝব কী করে? এমন মানুষের মন যদি সত্যিই বুঝতে চাই, তাহলে, তিনি কী বলছেন, তা উৎকর্ণ হয়ে শোনা যত জরুরি, তিনি কী বলছেন না, সেইটে লক্ষ করাও, ঠিক ততটা জরুরি। এইজন্যে বিদ্যাসাগরের সেই না-বলা গল্পটি এখন শোনাচ্ছি। কেন এ গল্পটি বাদ দিলেন তিনি—এ প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। সঙ্গে সঙ্গে এইটেও ভাবতে হয় : যা ওঁর অকথিত, তা ওঁর অকথ্যও কি না?

সেই সব ব্যাঙ যারা রাজা চায়

এক ঝাঁক ব্যাঙের মনে ভারি ক্ষোভ, হায়! ওদের রাজা নেই। ওরা তাই জিউস-এর কাছে জনকয়েক প্রতিনিধি মারফৎ আর্জি পাঠাল : রাজা চাই! এই আহম্মুকি দেখে

জিউস আকাশ থেকে ওদের পুকুরে একটা কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিলেন। যেই-না ঝপাস করে গুঁড়িটা পড়ল, সেই শব্দে, মহাভয় পেয়ে, ব্যাঙের দল ঝুপঝাপ জলে ঝাঁপ দিয়ে, সেঁধিয়ে গেল পুকুরের একেবারে তলায়। আস্তে আস্তে ওই কাঠের গুঁড়িটা স্থিতু হল। ওরাও তখন গুটি গুটি উঠে এল, পুকুরের তলা থেকে। তারপর ওই গুঁড়িটাকে আর কিছুমাত্র তোয়াক্কা না-ক'রে, ওরা তারই মাথায় চড়ে বসল। এমনতর রাজা পেয়ে ওরা এতই বেজার হয়ে উঠল যে আবার জিউসের কাছে গিয়ে দাবি করল, এ রাজাটা বড়োই নিরেট ; রাজা বদলে দাও ! জিউস তখন রাগ করে পাঠিয়ে দিলেন একটা জলের সাপ। যত ব্যাঙ ওখানে ছিল, ওই সাপটা ওদের ধরল আর বেবাক গিলে ফেলল।[৫৩] □

টীকাটিপ্পনী

১. বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর', প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৫। বদরুদ্দীন উমরের বিদ্যাসাগর বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয় গোলাম মুরশিদের এই সংকলনে। 'পরিচয়'-এ (অক্টোবর ১৯৭২) আমি সে লেখাটি নিয়ে আলোচনা করি। বদরুদ্দীন উমর 'পরিচয়'-এ তার যে-জবাব দেন, সেটা পরে স্থান পায় ওঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (ঢাকা, ১৯৭৪) নামক বইয়ে। আমার এই লেখায় ওঁর ঐ দুটি প্রবন্ধেরই উল্লেখ আছে।

২. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'আমাদের নিম্নশ্রেণী ও দুর্ভিক্ষ', 'নব্যভারত', চৈত্র ১২৯১, পৃ. ৫৪৭।

৩. শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ', কলকাতা, ১৩০৫, পৃ. ৯২-৯৩।

৪. সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়তার একটি দলিল-ছবি পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই লেখায়, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি হিশেবে যার দাম অসামান্য। শাস্ত্রী মশাইয়ের এই অভিজ্ঞতা ঘটে কর্মাটাঁড়ে, ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে :

'রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না ; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা ; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম— বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য্য ! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই

দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। 'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।...

'ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম—নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই-যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন। বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুক্‌না পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়;—ভারী ফুর্ত্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধহয় আর দেখিতে পাইব না।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা 'ভূমিকা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৩৩৮ [১৯৩১], পৃ. ৯-১২।

সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়তার আরেকটি বিবরণ:

'তাঁহার স্বর্গারোহনের কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার শেষ পীড়ার প্রথম সূচনা হয়।

একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন, বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, আমি গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ আপনি কেমন আছেন। তিনি বলিলেন, ভাল নয়। ক্রমেই অসুখ বাড়িতেছে। তাহার উপর এখানে পরিশ্রমের ত্রুটি নাই, কাজেই সুস্থ হইবার উপায় নাই। আমি বলিলাম আপনি কর্ম্মাটাড়ে যাইলে থাকেন ভাল, আর সেখানে যাইলে অনেকটা বিশ্রামও হয়। কিছুদিনের জন্য তাহাই করুন না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড় ভাল থাকি না। এই কথা বলিয়া ক্ষণিক চুপ করিয়া পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বাপু সেখানে যাইলে থাকি ভাল বটে, কিন্তু আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিত তাহা হইলে সেখানে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম, মনও ঠাণ্ডা থাকিত, শরীরও সুস্থ হইত। আমার সে অদৃষ্ট কৈ? আমার সে ক্ষমতা কৈ? আমি সেখানে গিয়া দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিব, আর আমার চারি পার্শ্বে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা অনাহারে মারা যাইতেছে দেখিব। এটা কি প্রাণে সয়? এই বলিয়া তিনি তথাকার লোকের দারিদ্র্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিরূপে যে ব্যক্তি একসের চাউলের অন্ন, আধসের অরহরের ডাল আধসের আলু ও একসের মাংস অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইয়া স্বভাবের অনিবার্য্য নিয়মে অল্পদিন মধ্যেই কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। যখন তিনি এই সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাঁহার দুই নেত্র হইতে অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। ক্রমে স্বর বিকৃত হইয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।' শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ,' পৃ. ৯০-৯২।

৫. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৪৪৮।

৬. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭।

৭. 'ব্রজবিলাস', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস - সম্পাদিত, 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ৫৪২। (এর পর থেকে 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' নামে উল্লেখিত।)

৮. 'আমরা শুনিয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রজাসাধারণ সভা নামে (জমিদারদিগের ব্রিটিস ইন্ডিয়ান এসোসিএসানের ন্যায়) এক সভা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। উক্ত সভার দ্বারা সাধারণের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি, এই জনরব সত্য হইবে। সা, স।' 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ', ১৫ ভাদ্র ১২৭৯, ৩০-৮-১৮৭২, পৃ. ৩২৯। 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত এই খবরের উল্লেখ প্রথম পাই স্বপন বসুর এই বইয়ে : 'সমকালে বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৯৩। 'এডুকেশন গেজেট'-এর ফাইল দেখেছি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে।

৯. 'The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him.' *Hindoo Patriot*, 9 January 1865. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৭৯, পৃ. ১৫৮-তে উদ্ধৃত।

সেই ইতিহাস খোদ 'সোমপ্রকাশ' যেভাবে লিখেছিল, সেটাই তুলে দিচ্ছি : 'সারদাপ্রসাদ নামক জনৈক বধির ছাত্রের ভরণ পোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন, সারদাপ্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে একটি কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশ প্রকাশের কল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে কেবল সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা নামক দুইখানি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। তখন এই দুই খানি পত্রেরই অবস্থা অতি হীন ছিল। কোন রাজনৈতিক বিষয়ই উহাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। ধীর ভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম্ম নৈতিক প্রবন্ধ সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইত না। কেবল কোন বিশিষ্ট লোকের নিন্দা বাদ, কোন সামাজিক কাণ্ডের রহস্যবাদ ইহা লইয়া পত্র দুই খানি পূর্ণ করা হইত। শ্রীরামপুর হইতে খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণ যেসকল সাময়িক পত্রাদি প্রচার করিতেন তাহাও কেবল খ্রীষ্টীয়ভাব পরিপূর্ণ। সুতরাং একখানি উপযুক্ত সংবাদপত্রের সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার "সোমপ্রকাশ" সৃজনের কল্পনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়' (সোমপ্রকাশ, ১৫ ভাদ্র ১২৯৩, পৃ. ৬৮৮)।

১০. 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধ কী, সেটা বুঝতে হলে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্কটিও খেয়াল রাখা দরকার। আসলে দুজনের এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, এই দীর্ঘ সহমর্মিতা 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ককে বিশেষ একটি মাত্রা দিয়েছিল। এমন নয় যে এই বন্ধুত্ব ছিল রেশমের মতন মসৃণ ;—বাস্তবের কোন্ বন্ধুত্ব তেমন হয়? যেমন, বহুবিবাহ তুলে দেওয়ার জন্যে সরকারি আইন-জারিই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় কি না, এনিয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর পাতায় দুই বন্ধুর তর্ক বাধে ১৮৭১ সালে। এই তর্কের বছর তিনেক পরে, ১৮৭৪ সালে, বিদ্যাভূষণ তাঁর 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ' বইখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি আমাদের সাহিত্যে সহমর্মিতা আর বন্ধুত্বের এক দুর্লভ দলিল। সে হিশেবে এই উৎসর্গপত্রটি খুবই মনোযোগ্য। 'সোদরসমেষু' এই পাঠ দিয়ে শুরু। তারপর বয়ানটা এইরকম : 'ভ্রাতঃ / আমরা উভয়ে এক সময়ে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। দীর্ঘকাল একত্র

অবস্থাননিবন্ধন পরস্পরের প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতার অধিকতর বৃদ্ধি হয়। সেই কারণে আমি তোমার বিষয় যেরূপ জানি, বোধ হয় অনেকে সেরূপ জানেন না।··· আমার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তুমিই সে সমুদায়ের মূল।···' স্মরণীয় এই উৎসর্গলিপি শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'অভিন্ন হৃদয়স্য / শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ'। কথাটা লক্ষ করার মতন: 'অভিন্নহৃদয়'!

১১. বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ', ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১১৩.

১২. যেমন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমিদারি অত্যাচার প্রসঙ্গে লেখে: '...the remedy lies not in breaking the permanent settlement but in fostering sentiments which make every man of wealth and station think that he exists for the good of his inferior in rank.'

১৩. Nilmani Mukherjee, *A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times 1808-1888*, Calcutta, 1975, p. 237. Nares Chandra Sen-Gupta, ed., *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mookerji*, Introduction, Calcutta, 1910, p.F.

১৪. এখানে 'আমল' বলতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ সাংবাদিক হিশেবে হরিশের কাজকর্ম করার সময় বোঝাচ্ছি; কর্তৃত্ব নয়। রামগোপাল সান্যাল বলেছেন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হরিশের হাতে আসে ১৮৫৪ সালে। রামগোপাল সান্যাল, 'হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী', কলকাতা, ১৮৮৭, পুনর্মুদ্রণ, 'এক্ষণ', পৌষ-মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ১ দ্রষ্টব্য। আর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হরিশের কর্তৃত্বে আসে ১৮৫৬ সালে। *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mookerji*, p.E দ্রষ্টব্য। দুটো তারিখই ভুল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মালিক ছিলেন মধুসূদন রায়। পত্রিকার স্বত্ব কার্যতঃ হরিশের হাতে আসে ১৮৫৫ সালের পয়লা জুন। তার প্রমাণ ৭ জুন ১৮৫৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ মুদ্রিত এই বিজ্ঞপ্তি:

'The interest and responsibility of Baboo Mudhoo Soodun Roy of Calcutta as Proprietor and Manager of the *Hindoo Patriot* Newspaper were transferred on the 1st. Instant to Baboo Harran Chunder Mookerjea of Bhowanypore. The paper will now be printed at Bhowanypore Suttya-Gyan-Suncharini Press.'

হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন হরিশের দাদা।

১৫. 'হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী', 'এক্ষণ', পৌষ-মাঘ. ১৩৭৭, পৃ. ১৪।

১৬. যেমন, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে : 'The Zeminder ...as absolute proprietor of the soil, which he is in so many words declared by the Law of the Settlement to be.'
আবার, ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৯ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলে : 'In the permanent settlement the impost was formally recognised as a tax, the soil being declared in so many words the sole property of Zemindar'.

১৭. গোলাম মুরশিদ-সম্পাদিত, 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৪।

১৮. 'বেসরকারি সমাজ' এই পারিভাষিক একটু ব্যাপক। কারণ চুলচেরা বিশ্লেষণে সিভিল সোসাইটি বা পৌর সমাজও বেসরকারি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তবে, কৌমের তুলনায় পৌর সমাজের সঙ্গে সরকারি সমাজের ঐক্য ঢের বেশি। বিশেষতঃ আমাদের দেশে তো সরকারি সমাজের সঙ্গে পৌর সমাজের গাঁটছড়া আঁটো করে বাঁধা। আর, এদেশে ঐ দুই এলাকার মধ্যে কোনও আবশ্যিক দ্বন্দ্বও নেই। তাই এ প্রবন্ধে 'বেসরকারি সমাজ' এই পরিভাষাটিকে ঈষৎ সংকীর্ণ অর্থে নিয়ে একে কৌমের প্রতিশব্দ হিশেবে ব্যবহার করলুম। পৌর সমাজ এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones,* Calcutta, 1977.

১৯. 'বিদ্যাসাগর চরিত—স্বরচিত', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সাহিত্য', পৃ. ৪৭০।

২০. 'সাহিত্য', বৈশাখ ১২৯৯, পৃ. ৩-১০।

২১. Lucien Goldmann, *The Hidden God,* tr. by Philip Thody, London, 1964, p. 68.

২২. 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সাহিত্য', পৃ ৪১১। 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৮৮৪) একটি কমেডি অফ এরর দেখেছি! বইখানি লর্ড রিপনকে উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। উৎসর্গপত্রে তিনি ভুল করে লেখেন : 'This Bengali translation of Shakespeare's *Tempest*...'!

২৩. দীনবন্ধু মিত্র, 'নীলদর্পণ', প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫১, পৃ. ২১।
সেকালের আরেকজন মস্ত নাট্যকার, যিনি মুখের ভাষার বোলচাল চমৎকার রপ্ত করেছিলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ—'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কাছে কৃতজ্ঞতা জানান এইভাবে :

'মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়—মন্দ, মহাশয়ের "বেতাল" পাঠে বুঝিলাম' ('সীতার বনবাস' নাটকের উৎসর্গপত্র, ১৮৮২)। দীনবন্ধু আর গিরিশ ঘোষের মতন সংলাপ-লিখিয়ে কেন এইভাবে 'বেতাল'-এর নাম করছেন, এইটেও ভাববার কথা বৈকি।

২৪. ইন্দ্রমিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫০৬।

২৫. স্বপন বসু, 'সমকালে বিদ্যাসাগর', পৃ. ৩১-৩২। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে 'সিটিজেন'-এর ফাইল খুবই জীর্ণ হয়ে এসেছে ; কত দিন আর ব্যবহার্য থাকবে, সংশয়ের বিষয়। তাই ২৪ মার্চ ১৮৫৫ তারিখের 'সিটিজেন' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলছি। সম্পাদকের সমীপে বি. জি. কে. জেড. এই নামের আড়ালে এক ব্যক্তি চিঠিতে লিখছেন :

'...no one has troubled himself to bring to the notice of the public the ideas entertained on the subject [Hindu Widow Remarriage] by the generality of the Hindus both males and females. ... Having received a few pamphlets on the remarriage of Hindu widows, published by Pundit Issur Bydasagur, through the kindness of a friend, I have caused them to be distributed among the inhabitants of certain villages and watched with deep interest what remarks fell from their mouths.

'A married woman whose opinion was asked on the subject of widow remarriage by one of her relatives in the presence of her husband, observed that it is much better than those heinous crimes which widows secretly commit and thus bring disgrace and dishonour on themselves and their families.

'Having taken a few of the pamphlets, a boy went to his own village to distribute them among his people, when a knot of women both old and young came, and stood round and begged of him to read to them some portions from one of those little books. Upon his reading one, a young widow of about 15 or 16 years of age instantly remarked that if a man can have the privilege of marrying again why is it that a woman should be deprived of the same right on the demise of her husband ? At the same time another widow observed that all this while the *Shastras* were kept concealed, and are now beginning to be brought to light. Upon this an old widow, who cannot

reasonably expect to taste the sweets of conjugal felicity again, condemned the book as irreligious and heretical. In company with these some other widows thinking remarriage an impracticable affair, were heard to say that if any how the institution of *ekadosi* be abolished, it would confer an inestimable boon on their class. Such are the opinions of the Hindu female world in Bengal.

Yours truly

B. G. K. Z.'

Calcutta March 21, 1855.

২৬. F. Saussure, *Course in General Linguistics*, ed. by Charles Bally and Albert Sechehaye, tr. by Wade Baskin, New york, 1959, p. 14.

২৭. V. N. Volosinov, *Marxism and the Philosophy of Language*, tr. by Ladislav Matejka and I. R. Titunik, New York and London, 1973.

২৮. Roland Barthes, *Elements of Semiology*, tr. by Annette Lavers and Colin Smith, London, 1969, pp. 15-16.

২৯. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব : দ্বিতীয় পুস্তক', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ১৮৫।

৩০. 'ব্রজবিলাস', দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ৫৩১-৫৩২।

৩১. 'The paragraph is something like a *vitiated dialogue worked into the body of a monologic utterance*'. Volosinov, *Marxism and the Philosophy of Language*, p. 111.

৩২. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনাসমগ্র', কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০।

৩৩. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', পৃ. ১০-১৩।

৩৪. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', অষ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৮, পৃ. ৭৩-১৩০।

৩৫. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', অষ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৮, পৃ. ৭৩-৭৪।

৩৬. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রুতি-স্মৃতি', প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৩৩৪, পৃ. ৯২।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', দশম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩।

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্রপূজা', কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৮।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্রপূজা', পৃ. ১৫-১৬।

৪০. টমাস রীড আর ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট-এর এই বইগুলি সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে আছে :

1. Thomas Reid, *The Works of Thomas Reid* ; now fully collected with selections from his unpublished letters. Preface, notes and supplementary dissertations by Sir William Hamilton, 6th edition, Edinburgh, 1863. 2 vols.

2. Dugald Stewart, *Dissertation*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1854.

3. Dugald Stewart, *Elements of the Philosophy of the Human Mind*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1854, 3 vols.

4. Dugald Stewart, *Lectures* on *Political Economy*, William Hamilton, ed., London, 1855, 2 vols.

5. Dugald Stewart, *Philosophical Essays*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1855.

6. Dugald Stewart, *The Philosophy of the Active and Moral Powers of Man*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1855, 2 vols.

7. Dugald Stewart, *Outlines of Moral Philosophy*, London, 1870.

8. Dugald Stewart, *Translations of the Passages in Foreign Languages Contained in the Collected Works*, Edinburgh, 1860. Supplementary Volume of Collected Works.

৪১. Elliot Walter Madge, *Henry Derozio*, Subir Ray Choudhuri, ed., Calcutta, 1982, p. 44.

৪২. পুলকেশ দে সরকার, 'পাঠক বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৪-৮।

৪৩. Thomas Reid, *The Works of Thomas Reid*, William Hamilton, ed., vol. I, Edinburgh, 1863, p. 12.

৪৪. 'রত্নপরীক্ষা', উপসংহার, 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ৬৬২-৬৬৪।

৪৫. Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, ed. and tr. by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, New York, 1973, pp. 321—334.

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস - সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ২৮১-২৮৯।

৪৭. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [প্রথম পুস্তক], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৪।

৪৮. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [প্রথম পুস্তক], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ১৯৬।

৪৯. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', [প্রথম পুস্তক], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৫০।

৫০. 'যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা [ইংরেজ জাতি] রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই ; সর্ব্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।' 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', [প্রথম পুস্তক], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৫৩।

৫১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৪।

৫২. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', 'নবোদয়', প্রথম বর্ষ, ১৩৬২, পৃ. ৭৭। ইন্দ্রমিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২০-তে উদ্ধৃত।

৫৩. আমি, ইচ্ছে করেই, টমাস জেমস-এর পাঠ (১৮৪৮) ব্যবহার না ক'রে ঈসপের এই আরও সাম্প্রতিক অনুবাদটি ব্যবহার করলুম :

Lloyd W. Daly, *Aesop without Morals*, New York, 1961, pp. 111-112.

এ লেখার প্রথম পাঠ বেরোয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে।

M/s. DAS PRINTERS

123/1, ACHARYA P. C. ROAD

CALCUTTA-700 006

Phone : 350-4312, 350-8843

Leading House of Quality Letter Press
& Off-Set Printing

□

With best compliments from :

V. I. P. SNACKS

85/D Ultadanga Main Road

Calcutta-700 067

Phone : 34-1344

□

উত্তর ২৪ পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনভবন, বারাসাত

[North 24 PARGANAS, F.R.D.A.]

★ মাছের অধিক ফলনের জন্য—

★ সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য—

★ আকর্ষণীয় সরকারী অনুদানের জন্য—

★ সঠিক মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণের জন্য—

যোগাযোগ করুন উপরের ঠিকানায় অথবা নিকটস্থ ব্লক অফিসে।

শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য

চেয়ারম্যান FRDA এবং

সভাধিপতি, উঃ ২৪ পরগণা

জেলাপরিষদ, বারাসাত।

শ্রীসঞ্জয় মিত্র

জেলা সমাহর্তা

উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত।

শ্রীরমেন্দ্রভূষণ দে

মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক

উঃ ২৪ পরগণা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনভবন, বারাসাত।

□

□

Space donated by :

A

Well

Wisher

□

With best compliments of :

The Peerless General Finance
& Investment Co. Ltd.

Regd. Office :

'PEERLESS BHAVAN'

3, Esplanade East, Calcutta-700 069

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

□

□

এপার বাংলার ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধন

দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা

সম্পাদনা শামসুর রাহমান □ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা পূর্ণেন্দু পত্রী

[এপার বাংলা ওপার বাংলার ২০৪ জন কবির ভালবাসার কবিতা নিয়ে অনবদ্য এক প্রাণবন্ত সংকলন। প্রতিটি কবিতাই পাঠকের মনে এনে দেবে এক নৈসর্গিক আনন্দ। ৫০·০০]

দুই বাংলার ভালবাসার গল্প

সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ হাসান আজিজুল হক

নির্বাহী সম্পাদক জয়দেব ঘোষ

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা পূর্ণেন্দু পত্রী

[দুই বাংলার ১২৪ জন প্রখ্যাত লেখক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য সংকলন। এত বিপুল সংখ্যক লেখক নিয়ে ভালবাসার গল্পের কোন সংকলন ইতিপূর্বে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়নি।

দুখণ্ডে ২২৫·০০]

দুই বাংলার ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা লীলা মজুমদার □ এখলাসউদ্দিন আহ্‌মদ

নির্বাহী সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা পূর্ণেন্দু পত্রী

[দুই বাংলার ১০০ জন শিশু সাহিত্যিকের গল্প নিয়ে একটি অনন্য সংকলন। দুদেশ মিলে এ ধরনের সংকলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

১২৫·০০]

মডেল পাবলিশিং হাউস

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা : ৭০০ ০৭৩

দূরভাষ : ৩১-৫১৩০

□

থি য়ে টা র ক র স্ট্রাগল আ্য ড ভে ঞ্চা র
আ্য ও সা ক সে স

স্যাস

দশম বর্ষ সংখ্যা

প্রকাশিত হচ্ছে ২৫ আগস্ট, ১৯৯৩

লিখছেন : শঙ্খ ঘোষ, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, বিষ্ণু বসু, কুমার রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, শিশির কুমার দাশ, শাঁওলি মিত্র, দেবাশিস মজুমদার, ইন্দ্রাশিস লাহিড়ি, রমাপ্রসাদ বণিক, সুরজিৎ ঘোষ ও অন্যান্যরা।

প্রচ্ছদ : রঘুনাথ গোস্বামী।

যোগাযোগ : সত্য ভাদুড়ি □ ৪০ দুর্গাপুর রোড, ঘোলা,
২৪ পরগণা (উত্তর)

যোগসূত্রকে শুভেচ্ছা

জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক
জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক
জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক জয়ন্ত বসাক

□

বহুজন বঙ্গে

গাঙ্গেয় সমভূমির এই দেশ অনেকের
সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে বাঙালি দিব্যি
কাটিয়ে দিল শতকের পর শতক।
গোলাভরা ধানের দিন শেষ, টান
পড়েছে তার প্রবাদ-প্রতিম আবেগেও।
তবু সে বেঁচে আছে ফিনিক্স পাখির
মতো বারবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে। তার
সেই বাঁচা-কাহিনীই বিধৃত 'বহুজন
বঙ্গে' তথ্যচিত্রটিতে।

পরিচালনা □ তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত,
স্বাতী দাশগুপ্ত।
ক্যামেরা : অসিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদনা : নীলোৎপল মজুমদার
সঙ্গে আছেন : জয়দীপ, রণবীর,
চয়ন, রাঘব
এবং
রেজওয়ানা চৌধুরি বন্যা।

যোগাযোগ □
রঞ্জনা
আনন্দলোক জি/২ ভি আই পি রোড
কলকাতা : ৭০০০৫৪
ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-৩৫০৪৭৯৪, ৯১-৩৩৪৯৪১

□

□

With best compliments of :

APSARA TRAVELS

Office :
Champadali, Jessore Road
Barasat, North 24 Pgs.
West Bengal

Available Luxury Bus / Taxi IN ANY OCCASION

□

M/s. Surachana Construction

4/A, Raja Rajendra Lal Mitra Road
Calcutta-700 035

□

☐

ক্যাম্পের সদ্য প্রকাশিত ৪টি বই :

সুখের পাথর ও অন্যান্য কবিতা—২০৲
দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

ওপেনটি বাইস্কোপ—৪০৲
শোভন সোমের লেখা ১৮ ও ১৯ শতকের
কলকাতা-সংস্কৃতির এক বিশদ সমাজচিত্র

আমি গাছ—১০৲
ছোটদের পরিবেশ সচেতন করতে
মৌসুমী ভৌমিকের ছড়ায় এবং
হাবিবুর রহমানের ছবিতে গাছের গল্পকথা

উনি এত উদাসীন কেন—২৫৲
সমকাল নিয়ে বাহারউদ্দিনের দীর্ঘ কবিতা

ক্যাম্প, ১৫ ডিহি ইন্টালী রোড
কলকাতা-১৪
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, বুক-মার্ক
একুশে, স্টাডি (যাদবপুর)

☐

স্বাগত চতুর্দশ বঙ্গাব্দ

গৌরবময় শতাব্দীর পথে

চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

৩৪বি, শ্যামবাজার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৫
দূরভাষ : ৩৩৬০২৫

১৪০০

☐

সাদা কালোর জগতে বিপ্লব
এত কম দামে (মাত্র ১৭০০ টাকা)
এত ভাল টিভি দিতে পারে শুধু—

একতা টি ভি

ফ্যাক্টরি :
৬ আদিবর্ত্ম, নবগ্রাম
কোন্নগর, হুগলি।

Declaration No. : 47/93 □ July-Sept. 1993 □ Rs. 15

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

কুন্তল রায় কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি, ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।